সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে

অমর মিত্র


সতত তোমার কথা
ভাবি এ বিরলে
অমর মিত্র

সতত তোমার কথা

ভাবি এ বিরলে

সতত তোমার কথা
ভাবি এ বিরলে

অমর মিত্র

আ

Satata Tomar Kotha Vabi E Birole
By AMAR MITRA
Published by ATMAJAA PUBLISHERS
ওয়েব :www.atmajaa.com
ইমেইল :info@atmajaa.com

ISBN : 978-93-87885-36-1

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রকাশক
অরুণাভ চট্টোপাধ্যায়
আত্মজা পাবলিশার্স
বসন্ত কুসুম, আড়িয়াদহ, কোলকাতা -৫৭

মুদ্রণ
আত্মজা মিডিয়া ভেঞ্চার্স প্রাঃ লিঃ
৮/১, বি.এল.ঘোষ রোড, কল - ৫৭

উৎসর্গ

শ্রীমতি মনোলীনা চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
পরম প্রীতিভাজনেষু

সূচি

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে

পার্টিশন আমি দেখিনি। ভাঙা বাংলায় আমার জন্ম। কিন্তু পার্টিশন আমাকে দগ্ধ করে। দেশভাগের যে বেদনা তা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করি। সেই অধিকারেই আমি পূর্ববঙ্গের কথা বারবার বলি। যেতে চাই। গিয়ে বিস্ময়ের ঘোরে থাকি। সেই বিস্ময়ের কথাই বলি একটু। আমরা পারটিশনের সময় খুলনা জেলার সাতক্ষীরে মহকুমার মানুষ। সাতক্ষীরে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট শহরের লাগোয়া। বসিরহাট গেলে আমি সাতক্ষীরের গন্ধ পাই। ইছামতী দেখলে আমি কপোতাক্ষ, বেতনা দুই নদীর স্রোতের শব্দ শুনতে পাই। মা আমাকে এইটুকু ভালবাসা দিয়ে গেছেন হারিয়ে যাওয়া গ্রাম আর নদীর জন্য। সতত আমি ফেলে আসা গ্রাম আর নদীকে স্মরণ করি। ভাবি।

সতত কার কথা ভাবি? কপোতাক্ষর কথা। তার তীরে কবি শ্রীমধুসূদন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মধুসূদনের মা জাহ্নবী দেবীর জন্ম। আমার মাতৃকুলও কপোতাক্ষর কুল। পিতৃকুল বেতনা নদীর কুল। আমি ২০০০ সালে আমাদের ফেলে আসা ছোট্ট শহর সাতক্ষীরে হয়ে ধূলিহর গ্রামে গিয়েছিলাম। আধঘন্টার জন্য। কিছুই দেখা হয়নি। শুধুই অশ্রুপাত হয়েছিল। তারপর আর যাওয়ার কথা ভাবিইনি। এক সন্ধ্যায় এক বন্ধু যখন সাহিত্য সভায় বললেন, তাঁর একটা গ্রাম আছে, তাঁর একটা নদী আছে তাই নিয়ে তিনি লেখেন। শুনতে শুনতে আমি নিজের নিঃস্বতা অনুভব করেছিলাম। আমার তো নেই। আমার গ্রাম আমার নদী ওপারে ফেলে এসেছি আমি। গুগুল সার্চ করে আমাদের গ্রাম দেখলাম একদিন। ছবিও। ফেসবুকে সাতক্ষীরের ক'জন বন্ধু হলো কোন অজানতে। এরপর একদিন ফেসবুকের ইনবক্সে সাতক্ষীরের বন্ধু তুহিন ম্যানগ্রোভ বলল, দাদা আসুন না কেন নিজেদের ফেলে যাওয়া গ্রামে। তুহিন বারবার ডাকতে লাগল, দাদা আসেন, সাতক্ষীরে আসেন, সাতক্ষীরে আপনার জন্য বসে আছে। এই তুহিন একদিন বিকেলে আমাকে ফেসবুকে মেসেজ দিল, দাদা আপনার বাবার নাম, ঠাকুদ্দার নাম? আমি জানাতে সে বলল, ধুরোলে (ধূলিহরে) আপনাদের ভিটেয় দাঁড়িয়ে আছি। সমস্ত গা শিহরিত হয়ে উঠল। আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটেয় দাঁড়িয়ে তুহিন ডাক দিচ্ছে। এ কি সত্য হতে পারে? সত্তর বছর আগে যা হারিয়ে গেছে তাকে পাই কীভাবে? দু'দিন বাদে এক সন্ধেয় অস্ট্রেলিয়াবাসী সাতক্ষীরের কন্যা ফিরদৌস জান্নাত নজৌলা বারবার বলতে লাগল, দাদা আপনার জন্মভূমি দেখে আসুন। চেনা মানুষ খুঁজে পাবেন ঠিক। তাই সাতক্ষীরে যাওয়া। আর উস্কে দিয়েছিল তরুণ সাংবাদিক বন্ধু অনমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক আবেদ খান মশায়। সম্ভ্রান্ত খান পরিবারের বাড়ি সাতক্ষীরে। আমি যবন হরিদাসের জন্মভিটে কেড়াগাছি, ধূলিহর যেতে চাই শুনে ঢাকা থেকেই আবেদ খান মশায় যাদের যাদের বলার, বলে দিয়েছিলেন। আমাকে বারবার তাড়িত করছিলেন। আবেদ খান তো বলছিলেনই, বলছিলেন সাতক্ষীরের সাংসদ রবিভাই, উপজেলা কলারোয়া অঞ্চলের সাংসদ লুতফুল্লা ভাই। ফোনে ডাকছিল কবি মন্ময় মনির। ফোনে ডাকছিল তুহিন, শুভ্র আমেদ, আসুন আসুন। এস এস। ভোররাতে, ঘুমের ঘোরে তাদের ডাক শুনছিলাম। মধ্যরাতে আধো চেনা কারোর ডাক শুনছিলাম আচমকা ঘুম ভাঙা অন্ধকারে। এস এস। আয় আয়। তাঁরা আর কেউ নন, আমার পিতৃকুল মাতৃকুলের হারানো মানুষ, ধূলিহরের চন্ডীচরণ মিত্র, লক্ষীনারায়ন মিত্র, অন্নদাচরণ, হেমনলিনী। বাঁকা ভবানীপুরের প্রমাতামহ কৈলাশ বসু, মাতামহ ধীরেন্দ্রনাথ বসু ... হারানো নদ কপোতাক্ষ, নদী বেতনা। নদীঘাট সুপুরিঘাটা, বড়দল। যুগীপোতার বিল জমি। রাজশাহী হয়ে ঢাকা গিয়েছিলাম আগের মাসে। ঢাকা থেকে ফিরে আট দিনের মাথায় সাতক্ষীরে ভায়া বসিরহাট। এত কাছে! বাউন্ডারি কমিশনের, র‍্যাডক্লিফ সায়েব মানচিত্রে দাগিয়ে গোটা খুলনা জেলাকেই ভারতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনদিন বাদে ১৮-ই আগস্ট খুলনা ওপারে চলে যায়। সাতক্ষীরে তখন খুলনা জেলার একটি মহকুমা। এখন জেলা। থাক ওসব কথা। আমি যেন আমার আর জন্মের ডাক

শুনতে পাচ্ছিলাম। যাঁদের দেখিনি সেই প্রপিতামহ চন্ডীচরণ মিত্র, মাতামহ ধীরেন্দ্রনাথ বোস ডাক দিচ্ছিলেন। সব নিয়ে বসে আছি। আয়, একবার আয়। তোরে তো দেখিনি আয়। আয় রানি, ঠাকুরদাসের খবর নিয়ে আয়। শিবু, কেষ্টর খবর নিয়ে আয়। রানি আমার মা রাধারানি, শিবু কেষ্ট আমার দুই মামা। মধ্যরাতের সেই ডাকই আমাকে নিয়ে গেল। না গিয়ে পারিনি তাই গেছি। বসিরহাট থেকে এপারে ঘোজাডাঙা,ওপারে ভোমরা সীমান্ত, সঙ্গে তরুণ লেখক অরিন্দম বসু। স্থল-সীমান্ত দিয়ে সীমান্ত না পার হলে সীমান্তের মহিমা ধরা যায় না। এপারের কাস্টমস, সীমান্ত প্রহরীর ছাড়পত্র নিয়ে ট্রলি ব্যাগ টেনে টেনে বাংলাদেশে ঢুকে গেলাম। ওপারে তুহিন, শুভ্র, মন্ময়রা দাঁড়িয়ে। চন্ডীচরণ, অন্নদা মিত্তির হেমনলিনী আর ধীরেন বসুরা দাঁড়িয়ে। যাঁরা এপারে প্রয়াত হয়েছেন, বাবারা তিনভাই, বড় মামা, মামি, আমার মা রাধারানি সকলেই এপারে প্রয়াণের পর ওপারে ফিরে গেছেন, আমি দেখতে পাচ্ছি তাঁদের। হ্যাঁ, স্পষ্ট। অনুভব করতে পারছিলাম যেন। ওপারে গিয়েও এপারের মোবাইল সিম চালু থাকে প্রায় ২ কিলোমিটার অবধি। তারপর তা মুছে দেয় র‍্যাডক্লিফের ভূত। ফোনে গ্রামীন ফোনের সিম ভরে নিলেই সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, হাতিয়া, ময়নাদ্বীপ, ব্রাহ্মনবাড়িয়ার তিতাসের কুল, গোয়ালন্দ, ঈশ্বরদি, আরিচাঘাট, পোড়াবাড়ি, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিং জুড়ে যায়। ঢাকার ভূতের গলি থেকে ময়মনসিঙের ফুলবাড়িয়া গ্রামের শেফালী খাতুনের বাড়ি চলে যাওয়া যায় পড়ন্ত বেলায় নারিকেল গাছের ছায়ার অভিমুখ দেখে দেখে (শহীদুল জহিরের গল্প 'কোথায় পাব তারে')। এবারের সাতক্ষীরে ভ্রমণ সকল অলীকতার অবসান হয়তো। কিংবা নতুন অলীকতার জন্ম। সাতক্ষীরে, ধুরোল, বাঁকা, আমাদী, রাঢ়ুলী কাঠপাড়া, পাটকেলঘাটা সবই আমার কাছে ছিল হারিয়ে যাওয়া ভূখণ্ড। সীমান্তের ওপারে যা আছে তার একবিন্দুও আমার নয়। গ্রাম, নদী, নদীঘাট, কিছুই আমাদের নয়। সেখানে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। বন্ধু সুজন আছে বটে, রক্তের কেউ নেই। নেই নেই কেউ নেই ওদেশে। ক'দিন আগে ঢাকাতেও তাই বলেছি গাজিপুর উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশভাগ নিয়ে বলতে গিয়ে। ঢাকার খামখেয়ালীর সভায় তাই বলেছি। কনকর্ড মার্কেটে তরুণ লেখকদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে তাই বলেছি। কিন্তু সীমান্ত পার হয়ে সাতক্ষীরের দিকে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল কেউ যেন আছে কোথাও! ঘ্রাণ আসছে। গায়ের গন্ধে স্বজন চেনা যায়। ছোটবেলায় মায়ের গায়ের গন্ধ চিনতাম, ঠাকুমার চিনতাম। তাঁদের মাথার চুলে ঘন নারকেল তেলের গন্ধ এখনো ভুলিনি। তা যেন বাতাসে ভেসে আছে ভোমরা সাতক্ষীরের পথে। কেউ যেন আছে। যার ডাকে মধ্যরাতে ঘুম ভেঙেছিল, সে আছে। কিন্তু এ তো আমার কল্পনা। ইচ্ছা পূরণের কথা মাত্র। তা হয় নাকি? হয় না। সাতক্ষীরে কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠানে আলাপ হয়েছিল তৃপ্তিমোহন মল্লিকের সঙ্গে। তিনি পঁচাত্তর। থাকেন সাতক্ষীরের নিকটবর্তী গ্রাম নাটানা, আশাশুনি। আশাশুনির নাম কত শোনা। দেখে মনে হলো চেনা মানুষ। গান লেখেন। গানে সুর করেন। কত পরিবার চলে গেছে ইন্ডিয়ায়। তিনি যাননি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তারাপদ মিত্র কে হন? চিনতেন আমার ছোটকাকাকে।

হ্যাঁ, সাতক্ষীরের কবিতা পরিষদের অনুষ্ঠানের মধ্য থেকেই আমাকে তুলে নিয়েছেন প্রবীন শিক্ষক আনিসুর রহিম। ফিরদৌস জান্নাত নজৌলার মামা। ভাগ্নী খবর দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া থেকে। তাঁরা আসলে বর্ধমানের লোক। ১৯৪৫-এ তাঁর বাবা চাকরিতে বদলি হয়ে সাতক্ষীরে আসেন। আর ফিরে যাননি। তিনি আমাকে প্রাণনাথ ইন্সটিটিউশনে নিয়ে গেলেন। বাবার ইস্কুল। ১৫০ বছর হয়ে গেছে। জমিদার প্রাণনাথ চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠা করা বিদ্যালয়। দুপুরে বৃষ্টির ভিতরেই আমাকে তিনি দেখালেন প্রাণসায়র। লম্বা সায়র। এই সায়রের ধারে হেমচন্দ্র ঘোষের বাড়ি ছিল। তিনি আমার ঠাকুমার ভাই। খুঁজলাম। পাত্তা করতে পারিনি। সে আমলের কাউকে যদি পাওয়া যেত! কোনো চিহ্ন পড়ে নেই। কাল স্রোতে ভেসে গেছে সব। অথচ কত লোকের সঙ্গে দেখা হলো যাঁদের আত্মীয় স্বজন এপারে, ধান্যকুড়িয়া, হাবড়া, সোলাদানা, টাকি। যাতায়াত আছে। তাঁরা কেউ বলতে পারলেন না হেমচন্দ্রের বাড়িটি কোথায় ছিল। কতকালের কথা এসব, আর কি খুঁজে পাওয়া যায়?

আমাদের ভিটেমাটি আর আত্মজনের খোঁজে যে যাত্রা, তার সঙ্গী তৃপ্তিমোহন। তুহিন ও শুভ্র আছে। অরিন্দম আছে। আছে কুমিল্লার পুত্র তরুণ কবি পিয়াস মজিদ আর তার বন্ধু বাবু। এই যাত্রা ছিল সেই মধ্যরাতের ডাক। আগের দুদিন ছিল অকাল বর্ষণে বিমর্ষ। আমরা ভোমরা সীমান্তে মেঘ মাথায় নিয়ে ঢুকেছিলাম। তারপর থেকে দুদিন বর্ষণে কেটেছে। ধূলিহর বা ধুরোল যাত্রা শুরু উজ্জ্বল দিনে। তৃপ্তিমোহনকে যখন বলেছি, ব্রহ্মরাজপুরে আমার মাসির বাড়ির কথা। না তারা কেউ থাকে না। প্রকাশ চলে গেছে ১৯৯১-এ। বি.এন.পি-র শাসনকালে। তাহলে পশুপতি ঘোষ আপনার? মেসো মশায়। তৃপ্তিমোহন খুব চেনেন। কাকে না চেনেন? মাসতুতো ভাই প্রকাশ ঘোষকে ভালই চিনতেন। সে কেন চলে গেল দেশ ছেড়ে? জমিজমা পড়ে আছে এখানে সব। তৃপ্তিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, প্রকাশ খুব কষ্ট করেছে ওপারে গিয়ে, শুনেছি তাই।

হ্যাঁ তাই। সে ২০০১ না ০২ সালে দেশত্যাগ করে সুজন-বন্ধুদের না জানিয়ে। উপায় ছিল না। সেই সময়ের গভীরে ভয়ানক সাম্প্রদায়িকতা ছিল। ওদেশ ছেড়েছিল তখন অনেক হিন্দু।

তারাপদ মিত্রকে চিনতেন? আমি জিজ্ঞেস করেছি তৃপ্তিমোহনকে।

খুব চিনতাম। তৃপ্তিমোহন জিজ্ঞেস করলেন, তারা ডাক্তার কে হতেন আপনার?

তিনি আমার কাকা। চিকিৎসক ছিলেন। বিমর্ষ হলেন তৃপ্তিমোহন তিনি বেঁচে নেই শুনে। বেঁচে থাকলে নব্বই পেরিয়ে যেতেন ঠিক। সাতক্ষীরে পোস্ট অফিসের মোড় থেকে রাস্তা বাঁ দিকে ঘুরে গেছে ধূলিহরের পথে। পাকা রাস্তা। ২০০০ সাল আর ২০১৬-য় অনেক তফাৎ। পথের দুপাশে দোকানপাট। ইস্কুল। কলেজ। ট্রেনিং সেন্টার। সাতক্ষীরে চলল অনেকটা। তারপর সবুজ বনানী দুপাশে। ব্রহ্মরাজপুর ধূলিহর গায়ে গায়ে। ধূলিহরের ভিতরেই বুঝি ব্রহ্মরাজপুর ঢুকে আছে। পশুপতি ঘোষের বাড়ি জমিদারের অট্টালিকা। রাস্তা থেকে দেখা যায়। কেউ নেই। সব রেখে প্রকাশ ওপারে গিয়ে শ'মিলে কাজ নিয়েছিল। আমি তাকে গিয়ে যেন বলি একবার ঘুরে যেতে। তৃপ্তি মোহন, লেখক খায়রুল বাশার, সাংসদ লুৎফুল্লা মুস্তাফা সকলে আমাকে বলেছেন কদিন ধরে। সব ফেলে দিয়ে যে চলে গেছে, তার সব মায়া চলে গেছে যে তা বলতে পারি না। কিন্তু আর ফিরবে না সে। আমাকে প্রকাশ বলেছে, আর ফেরা যায় না।

ব্রহ্মরাজপুর বাজার বেশ বড়। জমজমাট। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। খাড়া হাতে অন্নদাচরণ। তৃপ্তিমোহন আমাকে সব দেখাবেনই। ঐ যে কাল- ভৈরবের মন্দির। টিনের চালা দেখলাম দূর থেকে। আমি বললাম সুপুরিঘাটা যাব। সুপুরিঘাটায় নৌকো থেকে যে নবদম্পতি নেমেছিল বিবাহের পর, তাঁরা আমার জনক জননী। মায়ের বাপের বাড়ি ছিল কপোতাক্ষ তীরে বাঁকা ভবানীপুর। সুপুরিঘাটার বেতনা নদী গিয়ে পড়েছে নদ কপোতাক্ষয়। মায়ের কাছে শোনা কথাই আমি বলছি। সুপুরিঘাটার আগে আমাদের বাস্তুভিটে। মাটির বাড়ি। এই অঞ্চলে পশুপতি ঘোষ ব্যতীত পাকা বাড়ি ছিল কোথায়? আগের বার, সেই ২০০০-এ সিদ্দিক ছিল না। মহম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক মোড়ল। ১৯৬২ সালে সিদ্দিকের বাবা শুকুর আলি মসলন্দপুর থেকে এখানে আসেন। তাঁরা অন্নদাবাবুদের ভিটেয় আছেন। তবে সেই ভিটের কিছুটা আছে, সবটা নেই মনে হয়। আবছা যা মনে আছে তার কিছু আছে, দুটি পুকুর ছোট ডোবার চেয়ে একটু বড়। আমি কী বলব? ভিটের আর কী দেখার আছে? মাটির বাড়ি ভেঙে নতুন করে করা যায়। আমি সিদ্দিকের পরিবার দেখছিলাম। সিদ্দিকের কিছুই মনে নেই মসলন্দপুরের কথা। বাড়ির বাতাপি লেবু কেটে দিল। সিদ্দিকের বিবিকে আমার ছোটকাকির মতো মনে হচ্ছিল। তেমনি স্মিত হাসি, মাথায় ঘোমটা। আগেরবার বলেছিলেন, ভাত খেয়ে যান, আপনাদের ভিটেয় আছি, জমির ধান পাই, খেয়ে বাঁচি...মনে আছে সব। আমি ফোনে ধরলাম আমার মেজদা উদয়নকে। আমি ধুরোলে বাবুদা...। আমাদের জন্মভিটেয়। তাই। ফোনের ওপারে মেজদা কাঁদছেন। সিদ্দিক বলছিলেন, তাঁরা ভালো আছেন, সবই মাটির গুণ। সিদ্দিকের ৫৬-৫৭। অনেক সময় বসেছিলাম উঠনে। হাতনের পৈঠায়। এইখানে জন্মেছিল বড়দা মনোজ, মেজদা উদয়ন, বোন অপর্ণা। অকাল প্রয়াত দিদি ডিলডিল, সবার বড় ভাই সায়েব। মা ছিলেন সর্বংসহা। রাধারানীর চোখে জল আসে।

তিনি যে আমার ভিতরে আছেন। পাশের বাড়ি আব্দুল জলিলের। শীর্ণকায় বৃদ্ধ। তিনি আমাদের আর এক শরিকের বাড়ি নিয়েছেন। বাবার জেঠতুতো ভাইদের বাড়ি। আব্দুল জলিল আমাকে বললেন, বেলেঘাটায় গিয়ে সাতদিন ছিলেন সন্তোষ মিত্রর বাড়ি। সেখেনেই দলিল হয় বিনিময়ের। কতকালের কথা সব। তিনি অনেক প্রবীণ। আমাকে নানাজনের নাম বলতে লাগলেন। তাঁরা সব তাঁদের প্রতিবেশী ছিলেন। ইন্ডিয়ায় চলে গেছেন। এই গ্রামেরই মানুষ সকলে। কেউ নেই। হরি মাস্টার ছিল অনেকদিন। তারপর চলে গেল কবে যেন। তর্জনী তুলে দেখিয়ে দিলেন দূরের একটা ভিটে। সিদ্দিকও পড়েছে হরি মাস্টারের কাছে। জলিল বললেন, কালি সেন, দোল মাস্টারকে আমি চিনি কি না? নাম শোনা, আমি চিনব কী করে? যিনি সকলকে চিনতেন, পূর্ববঙ্গ ধারণ করে রেখেছিলেন নিজের ভিতরে, আমার মা রাধারানির কাছেই তো সব জানা আমার।

জলিল জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কালী সেন, বিশ্বেশ্বর সেনরা কি বেঁচে আছেন? রামকৃষ্ণ ধরের "ফেমিলি" কেমন আছে? কত সব নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। শুনতে শুনতে রাধারানির চোখে জল। রাধারানি কাঁদছেন। আব্দুল জলিল এসে এঁদের পেয়েছিলেন প্রতিবেশী হিশেবে। তারপর সেই সব প্রতিবেশীরা একে একে গ্রাম ছেড়ে ইন্ডিয়ায় চলে গেছে। জলিলের খুব মনে পড়ে? আমার সেই সব জেঠাদের 'ফেমিলি' কেমন আছে? সুশীল মিত্তির, স্মরজিৎ মিত্তির, সন্তোষ মিত্তিরদের ছেলে মেয়েরা? কথা যেন ফুরোয় না জলিলের। হাঁ করে শুনছে সিদ্দিক। কেউ নেই। গ্রাম শূন্য করে চলে গেছে সবাই। আমরা চললাম সুপুরিঘাটার দিকে। বেতনার সেই ঘাটে নববধূ রাধারানি নেমেছিলেন প্রথম। ঘাটেই হিন্দু মুসলমান নারীরা, এজার শানা মোজার শানার মা দিদিরাও উলুধ্বনি দিয়েছিল। হেমনলিনীর ছেলে হাজুর বউ আসছে। হাজরা ঠাকুরের কৃপায় ছোটবেলায় বেঁচে গিয়েছিল অশোক। তাই তার নাম হাজু। সব জানে রাধারানি। মনে পড়ে যেতে রাধারানির চোখে জল। আমার পিঠে তুহিনের হাত। আমার হাত ধরেছে শুভ্র। এখন আর নদীঘাট নেই। পাকা ব্রিজ হয়ে গেছে। আমরা রওনা হলাম আমার মাতুলালয় বাঁকা ভবানীপুরের উদ্দেশে। আগে কপোতাক্ষতীরের সেইসব গ্রাম, বাঁকা, রাঢুলি কাটিপাড়া, পাইকগাছা, কপিলমুনি, আমাদী থেকে নদীপথই ছিল পথ। স্টিমার-লঞ্চ ধরে বেরতে হতো গ্রামের বাইরে। এখন রাস্তায় রাস্তায় জুড়ে গেছে সব। পথের বাঁধা নদীর এপার ওপার সেতুতে সেতুতে জুড়েছে। মাঝে গাড়ি থামল বুধাহাটা বাজারে। চা খাওয়া হলো। বুধাহাটার নাম কত শুনেছি মায়ের কাছে। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আমি বুধাহাটা থেকে ফোনে ধরেছি ছোটমামাকে। মামা আমি বাঁকা যাচ্ছি। সে কী আবেগ শিবপ্রসাদ বসুর। কত কথা। তারপর বললেন, কেন যাচ্ছিস? কিছুই নেই। কেউ নেই। আবার রওনা হলাম। গাড়ি ছুটেছে চমৎকার রাস্তা দিয়ে। দুপাশে বিল জমি। মাছের ঘেরি। জল আর জল। আবার কোথাও বিস্তীর্ণ ক্ষেতে ধান পেকেছে। খেজুর গাছ কাটা হয়েছে। কলসি এখনো ঝোলেনি। রাধারানি চলেছে তার বাপের বাড়ি। বিষাদে ভরা মুখ। চশমার কাচের আড়ালে চোখ ছলছল। কার কাছে যাবে সে? আমি মাতুলালয় দেখিনি। মায়ের কাছেই যা শোনা সেই হারানো নদী হারানো গ্রামের গল্প। স্টিমারের ভোঁ বহুদিন থেমেছে। আমরা ঘন্টা দেড় বাদে বুঝি পৌছেছি বাঁকা বাজারে। কেন এলাম মা? মাতুলালয় শূন্য। কালী সেন বিশ্বশ্বর সেনদের মতো সবাই চলে গেছে ইন্ডিয়া। পড়ে আছে ভিটা কিন্তু অন্য মানুষ। পিয়াস মজিদ জিজ্ঞেস করলেন আমাকে, কেউ আছে মামাবাড়িতে?

মাথা নেড়েছি। কে থাকবে? আমার মামারা মাসিরা সব ইন্ডিয়ায় গিয়ে খুব কষ্ট করে বেঁচেছে। দাঁড়িয়েছে। আবার এখনো দাঁড়াতে চাইছে। খুঁজছি সেই বোস বাড়ি। অবিনাশ বোস। জমিদার ছিলেন। মামাদের বড় শরিক। আমি কোনোদিন আসিনি এই গাঁয়ে, বাড়িটা দেখিয়ে দেবেন ভাই। অবিনাশ বোসকে কে না চেনে। তিনপুরুষ আগের মানুষ। তাঁদের দান ছিল গ্রামে। বিরাজ সাগরের জল যে এখনো খায় গ্রামের মানুষ। ওই পুকুরে মাছ নেই। শুধু তৃষ্ণার জল। এসব বলতে বলতে দোকানি মুকুল বললেন, রাতুল বোস তো থাকে এখানে। কে রাতুল বোস? আমাদের গাড়িতে কামাল হোসেন নামের যুবক উঠেছে বাড়ি দেখিয়ে দিতে। প্রাচীন হয়ে আসা দুতলা দুটি দালান সমুখে। ডানদিকে। বাঁয়ে কপোতাক্ষ আল বেঁধে মাছের ঘেরি। নদীকে এইভাবে হত্যা করা হয়েছে আমাদের দেশেও। ইছামতির এই হাল হয়েছে অনেক জায়গায়। আমি অবাক

হয়ে দেখছি। সেই নদী? প্রমত্ত নদী। ভোরে প্রথম ইস্টিমার। আমার যে সব জানা। শুভ্র বলল, ড্রেজিং করে কপোতাক্ষকে আবার বাঁচানো হচ্ছে। কাজ চলছে। মাইকেলের নদী যে কপোতাক্ষ। প্রথম বাড়ি রেখে দ্বিতীয় বাড়ির বারান্দায় উঠেছি। দেওয়ালের প্লাস্টার খসা। জানালার খড়খড়ির সবুজ রঙ মলিন হয়ে গেছে। জানালায় এক প্রবীণার মুখ। আমি তাঁকে চিনি না। রাতুল হলো পিন্টু বোসের ছেলে। পিন্টু মামা মন্টু মামাদের দেখেছি ছোটবেলায়। মায়ের জ্যাঠতুতো ভাই। তাঁদের বাড়ি এপারে ছিল আমহারস্ট স্ট্রিট-ফকিরচাঁদ মিত্র স্ট্রিটে। মস্ত অট্টালিকা সেখানেও। কিন্তু তাঁরা তো ওপারেই আছেন। এপারে কী করে থাকবেন? কিন্তু আছেন। তাঁদের একজন আছেন এখানে? সত্যি! কেউ আছে? রাধারানি এই দ্যাখো পিন্টুমামার বউ, আমার মামি জানালায় দাঁড়িয়ে। উনি কি আমাকে চিনবেন। দুচোখে বিস্ময় আর চাপা ভয়ও। আমি বারান্দায় উঠতে উঠতে বলছি, মামি আমি রানিদির ছেলে, রানিদি গো, রাধারানি, বেলগেছিয়ার রানিদি। রানিদি! আমার বাবা অশোক মিত্র!

মনোজ মিত্তির আপনার বড় ভাই? রানিদিরে আমি দেখিনি কোনোদিন, বলতে বলতে তিনি জানালা থেকে সরে বাইরে এলেন। মোবাইলে ডাকতে লাগলেন রাতুলকে। সে বাজারেই আছে। রাধারানি বললেন, আমিও তোমারে দেখিনি বউ, তোমারে দেখতি এতদূর আসা। কেউ নেই ভেবে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ভোমরা সীমান্ত থেকে তা যে এইভাবে নাড়ু, চন্দ্রপুলি, তক্তি, সন্দেশ, দধিতে পুণ্য হবে কে জানত? রাতুল এল। লুঙ্গি আর শার্ট পরিহিত রাতুল আমাকে দেখাল আমার মামার বাড়ি। পেছনদিকে। শহর আলী গাজির পুত্ররা কিনেছিল অন্য দুই শরিকের অংশ। অবিনাশ বোসের অংশ, বড় অংশ পড়ে ছিল। রাতুল ওদেশে ফিরে গেছে ইন্ডিয়ায় এসে কিছু না করতে পেরে। নিজের দেশ তো। নিজের গ্রাম। রাধারানি বললেন, আমিও থাকি রাতুল?

থাকো পিসি থাকো, গাঙ আছে কিন্তু ইস্টিমার নেই, গাঙ মজি গেছে, তবু থাক, বস পিসি বস।

রাধারানি নিজের বাপের বাড়ি ফিরলেন। বাড়ির পিছনে সেই পুকুর। কী টলটলে জল! ঘাটে বসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন রাধারানি। আমি ছোটমামা শিব- প্রসাদকে ফোন করেছি সেখান থেকে। গলা জড়িয়ে গেছে ইন্ডিয়ার এবং বাংলাদেশের। কথা আটকে গেছে দুজনেরই। দূরে কপোতাক্ষ। গতিহারা। ম্লান মুখ। মাকে সেই শীর্ণ কপোতাক্ষ ফিরিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এসেছি।

স্বাধীনতার জন্ম

আমাদের উত্তর পুবে করদ রাজ্য কোচবিহার ছিল ব্রিটিশ ভারতের বাইরে। কোচবিহার রাজ্য ছিল স্বাধীন রাজ্য, যদিও সামরিক ক্ষমতায় ব্রিটিশ ভারতের মুখাপেক্ষী। ভাল টাকা রাজস্ব দিতে হতো ব্রিটিশ সরকারকে। কোচবিহারের মহারাজার ১১১ গ্রাম ছিল ব্রিটিশ ভারত, রংপুর জেলার ভিতর, আর ব্রিটিশ ভারতের, রংপুর কালেক্টরের ৫১টি গ্রাম ছিল কোচবিহার রাজ্যের সীমানার ভিতরে। র‍্যাডক্লিফ সায়েবের বাউন্ডারি কমিশন এই নিয়ে মাথা ঘামায়নি ১৯৪৭-এ। কোচবিহার ভারতের অনুকূলে মত দেয় ১৯৪৯-এ এর সেপ্টেম্বরে, আর ১৯৫০-এর ১লা জানুয়ারি থেকে কোচবিহার ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়, পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা। আইনত কোচবিহারের সমস্ত ভূসম্পত্তি ভারত হয়ে যায় সেই দিন থেকে। সেই থেকেই মনুষ্যত্বের অপমান পোক্ত হয়ে বসে এপার ওপারে। দেশের ভিতরে বিদেশ এই স্বত্তের জন্ম হলো। রংপুর পাকিস্তানে গেল, তাই এপারে কোচবিহার রাজ্যের সীমানার ভিতরে থাকা রংপুর কালেক্টরের ৫৩ মৌজা পাকিস্তান হলো। কোচবিহার ভারত হলো, তাই ওপারে কোচবিহার রাজার ১১১টি মৌজা ভারত হলো। এক দেশের ভিতরে আর এক দেশ। আসলে এই ছিটমহলবাসীর সত্যিকারের কোনো দেশই ছিল না। গত ১লা আগস্ট ২০১৫ ভারতের ভিতরের ৫১টি গ্রাম, বাংলাদেশের ভিতরে ১১১টি গ্রাম সত্যিকারের দেশ পেল। আর দুটি ছিটমহল,ভারতের ভিতরের দুটি গ্রাম, মেখলিগঞ্জ মহকুমার অঙ্গারপোতা, দহগ্রাম ১৯৯২-এ করিডোরে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেই করিডোর তিনবিঘা যেমন ছিল তেমনই আছে। ১৯৭৪ সালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সদ্যজাত রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান চুক্তি করেছিলেন ছিটগুলির বাস্তব সম্মত বিনিময়ের। সেই চুক্তি এতকাল বাদে বাস্তবায়িত হলো। ৩১শে জুলাই মধ্যরাতে, রাত বারোটায়। আমি সেই বিরল মুহূর্তের সাক্ষী হলাম।

আমার জন্ম ১৯৪৭-এর পর। আমি ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইটের কথা শুনেছি, দেখিনি। ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে দিল্লির লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলেছিলেন জওহরলাল নেহরু। আমার যৌবনকালে বাংলাদেশের জন্ম দেখে- ছিলাম। পাকিস্তান ভেঙে জন্ম হয়েছিল নতুন রাষ্ট্রের। সেও ছিল মুক্তি সংগ্রাম। স্বাধীনতার যুদ্ধ। বাংলাদেশ আমার পিতৃপুরুষের দেশ, তাই বাংলাদেশের জন্ম আমাকে উদ্বেলিত করেছিল সত্য। কিন্তু সে দেশ তো আমার দেশ নয়। আমার দেশ এই ভারত। ভারতের ভিতরে একট অংশ, সর্বমোট ৭০০০ একরের মতো টুকরো টুকরো ভূখণ্ড স্বাধীনতা পেল এই ২০১৫'র ৩১শে জুলাই মধ্যরাতে। সেই মহৎ ঘটনার দিন আমি মধ্য মশালডাঙা ছিটমহলে উপস্থিত ছিলাম। স্বাধীনতা কেমন, তা পরাধীন না থাকলে অনুভব করা যায় না। পরাধীনতা মানে মানে রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তির নাগরিকত্বর কোনো দাম নেই। রাষ্ট্র সেই ব্যক্তিকে ঘৃণার চোখে দ্যাখে। রাষ্ট্র তাকে ভিনদেশি বলে দাগিয়ে দিয়ে জেলখানায় ভরে দেয় কিংবা ঠেলে দেয় সীমান্তের ওপারে অচেনা বাংলাদেশে, পুশব্যাক যার আইনি নাম। ছিটমহলের বাসিন্দাদের সেই আতঙ্ক সেই ঘৃণাই সহ্য করতে হয়েছে এতকাল। সে কেমন ঘৃণা কেমন আতঙ্ক? মশালডাঙায় যে স্বাধীনতা উৎসব হলো ৩১শে জুলাই বিকেল থেকে, সেই উৎসবে সেই সব দিনগুলির কিছু কিছু ঘটনার কোলাজ প্রদর্শিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মধ্য দিয়ে। বলব তার কথা।

৩০শে জুলাই দুপুরে তিস্তা-তোরসা এক্সপ্রেস ট্রেনে রওনা দিয়েছিলাম আমি ও আমার তরুণ বন্ধু জয়জিৎ কোচবিহারের উদ্দেশে। কোচবিহার থেকে দিনহাটা। দিনহাটা একটি সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর। এই মহকুমার ভিতরের ৫১টি ছিটের ১৯টি রয়েছে। আমি এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি এখানে ছিটমহলের কৌতুহলেই। এক রাষ্ট্রের ভিতরে আর এক রাষ্ট্র কী ভাবে থাকে সেই কৌতুহলেই আসা বার বার। আসলে আরো স্পষ্ট করে বলতে হলে, এক রাষ্ট্রের ভিতরের কিছু মানুষ ভিনদেশি বলে পরিচিত হলে কী হয়

তাদের, তা জেনে নিতেই বার বার আসা। স্বাধীনতা হলো সেই কিম্ভুত অবস্থার অবসান। সকালে দিনহাটা পৌঁছে ছিটমহল বিনিময় সমিতির দীপ্তিমান সেনগুপ্তকে ফোন করতে সে বলল, বিকেলে বের হতে হবে দাদা, ফিরতে রাত একটা হবে। আজ জাতীয় পতাকা তোলা হবে মশালডাঙায়। মশালডাঙাতেই কেন্দ্রীয় ভাবে স্বাধীনতা উদযাপন করা হচ্ছে। তা যে হচ্ছে সে আমি জানতাম, আমার ফেসবুকে মশালডাঙার জয়নাল আবেদিন মেসেজ করেছিল মশালডাঙাতে আসতে। উঠেছি মহকুমা শাসকের বাংলো অনন্যায়। পুরোন বন্ধু দমদমের শীতল বসু সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ঘটনাচক্রে এবারই তা জানলাম। আগেও ছিলাম যখন, জানতাম না শীতল বসু সেখানে আছেন। অনন্যায় তরুণ সাংবাদিক অনমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অনুপ চন্দের সঙ্গে দেখা। অনমিত্র ছিটমহলের এপার ওপার জানেন। বাংলাদেশ জানেন। আমি যাঁদের চিনি তাঁদের চেনেন। সকালটা গেল ছিটমহল চর্চায়। কেন ওপারের মানুষ এপারে আসছে না। কেন এপারের মানুষ ওপারে যাচ্ছে না। ওপার থেকে যদিও হাজার জনের মতো আসছে এপারে, এপার থেকে একটি মানুষও ওপারে যাচ্ছে না। অভিযোগ উঠেছে ওপারের মানুষকে নাকি আসতে দেওয়া হচ্ছে না। কেন আসতে দেওয়া হবে না তা অবোধ্য। মানুষ চলে আসবে, জমি পড়ে থাকবে, তাহলে না আসতে দেওয়ার কারণ? এমনিতেই জমি দখলের জন্য মানুষকে জমি থেকে উৎখাত করাই যখন স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহলে এই সুযোগে তো একটু ভয় দেখিয়েই বহু সংখ্যালঘুকে আইন সম্মত উপায়েই ওপার থেকে এপারে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। তা হতে দেননি ওদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ। আর মানুষও চায়নি ছিন্নমূল হতে। যে সমাজ আর আত্মীয়স্বজন নিয়ে বসবাস করছে তারা এতকাল ধরে তা ত্যাগ করে অজানা দেশ ভারতে আসতে চায়নি। ঠিক ওই কারণেই এপারের মানুষ, যাঁদের বড় অংশ সংখ্যালঘু তাঁরা কেউ এদেশ ছেড়ে না গিয়ে আগের নাগরিকতা ত্যাগ করে ভারতীয় হয়ে গেছেন। এই স্বাধীনতায় ছিটমহলের মানুষকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল কে কোন দেশের নাগরিক হবে তা জানাতে। প্রথমে ১লা জুলাই থেকে ১৬-ই জুলাই পর্যন্ত, পরে তা ৩১শে জুলাই অবধি বর্ধিত হয়েছিল। এই রক্তপাতহীন স্বাধীনতা, ছিট বিনিময় হয়েছে অহিংস আন্দোলনে। মানুষের নীরব প্রতিবাদে। হ্যাঁ, এই পতাকা তো এই প্রথম ওঠেনি। এপারের বাংলাদেশি ছিটমহল মশালডাঙা বা অন্য ছিটমহলে ভারতের পতাকা উঠেছে এর আগেও। গত ২৬শে জানুয়ারি, আগের বছর ১৫-ই আগস্ট। এইসব ছিটের মানুষ বিনিময় চুক্তি অনুসারে ভারত হতে চাইছে যে তা জানাতেই ওই পতাকা উত্তোলন। আর গত ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে, যেদিন ছিল বাংলা দেশের বিজয় দিবস, সেদিন বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ১১১টি ছিটমহলে ছিটের মানুষ বাংলাদেশের পতাকা তুলেছিল ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবর রহমান স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ছিট বিনিময়ের দাবিতে। স্লোগান দিয়েছিল, "ইন্দিরা মুজিব চুক্তি, ছিটবাসীর মুক্তি"। আমি সেদিন তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার (সাবেক রংপুর জেলার মহকুমা, এখন জেলা) ভুরুঙ্গামারী থানা সংলগ্ন দাশিয়ারছড়া মৌজায়। দেখেছিলাম,'আমাদের একটি দেশ চাই' এই আর্তিই ফুটে বের হচ্ছে সেই বাংলা দেশের ভিতরে ভারতের সেই গ্রামের মানুষের চোখে মুখে। স্ট্যাটাসে তখন সেই মস্ত গ্রাম বাংলাদেশের ভিতরে ভারত। তার থানা দিনহাটা।

ছিটমহল মশালডাঙা অনেক বড় মৌজা। ১৯টি জরিপের নকশা বা মৌজা মানচিত্রে বিভাজিত এই প্রাচীন গ্রাম। মধ্য মশালডাঙাতেই ৩১শে জুলাই মধ্যরাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ভারতের পতাকা উঠেছিল। স্বাধীনতার পতাকা। কেন্দ্রীয়ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ছিটমহল বিনিময় সমিতি। এপারে মধ্য মশালডাঙা, ওপারে দাশিয়ারছড়া। দুপুরে এলেন আমার ওপারের বন্ধু, তরুণ আইনজীবী আব্রাহাম লিঙ্কন। যিনি বি.এস. এফ'এর গুলিতে কাঁটাতারে আটকে থাকা বালিকা ফেলানি হত্যা মামলায় বাংলা দেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। আব্রাহাম লিঙ্কন কুড়িগ্রাম শহরে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের একটি মিউজিয়ম করেছেন। সেই মিউজিয়মে অমূল্য সব নথিপত্র আছে। আমি দেখেছিলাম গত ডিসেম্বরে। আমরা মশালডাঙার স্বাধীনতা বরণ উৎসব দেখতে রওনা হলাম বিকেলে। তখনো সূর্য ডোবেনি। উত্তরবঙ্গে তখন বৃষ্টি নেই, কিন্তু আকাশে মেঘ আসায় আবহাওয়া শীতল। আমাদের জন্য গাড়ি এনেছিল মশালডাঙার তরুণ আনোয়ার। আমরা চললাম সীমান্তের

দিকে। দিনহাটা চৌমাথা ছাড়িয়ে বলরামপুর রোড ধরে গাড়ি ছুটল। বলরামপুরের সন্তানই মহৎ দুই ভাওয়াইয়া গায়ক আব্বাস উদ্দিন আহমদ ও প্যারীমোহন রায়। আব্বাসউদ্দীন আহমদ ১৯৪৭ এর স্বাধীনতা, দেশভাগের পর চলে গিয়েছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানে। আল্লা মেঘ দে পানি দে..., আমাদের জন্যও তো তিনি ডেকেছেন তাঁর ঈশ্বরকে। ভাবতে ভাবতে আমার ভিতরে যেন অভিমান জেগে ওঠে। আব্বাসউদ্দীন আহমদ এখন আর পাকিস্তানের নন, বাংলাদেশের নন, আমাদের সকলের। ছিটের একটি মানুষও দেশত্যাগ করছে না। এ আমাদের গৌরব। নানা অসাম্যের ভিতরে আমরা এইটুকু বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি ছিটের মানুষের। আব্বাসউদ্দীন ১৯৫৯-সালের ৩০শে ডিসেম্বর প্রয়াত হন। তখনো পাকিস্তান ভাঙেনি, কিন্তু সেই রাষ্ট্রের মোহ ভেঙেছিল ওদেশের মানুষের। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা, দেশভাগই ছিটমহলের মানুষের জীবনে পরাধীনতা এনেছিল। বলরামপুর রোড ধরে গিয়ে বাসন্তীর হাট, তারপর বুড়ির হাট থেকে ডানদিকে ঘুরে নাজিরহাটের দিকে গাড়ি চলল। দুপাশে রোয়া ধানের মাঠ। সূর্যাস্ত হচ্ছে। ছিটমহলের শেষ সূর্যাস্ত। নাজিরহাট বন্দর পার হয়ে হসপিটাল মোড়, তা পেরিয়ে এগোতেই ওই দেখা যায় মানুষের মুখ। গাড়ির চালক আনোয়ার দেখাতে লাগল ঐ যে বাঁশবন, ঐ বন অবধি বাংলাদেশ, তারপর ঐ বাড়িটি ইন্ডিয়া, কাল থেকে সব ইন্ডিয়া, আমিও ইন্ডিয়ান, ভাবতেই কেমন লাগছে। এবার সে গাড়ি চালানোর লাইসেন্সের আবেদন করতে পারবে। প্রথমে এইটাই মনে হচ্ছে। স্বাধীনতার কাছে বড় কিছু আকাঙ্ক্ষা নয়। ছোট ছোট আশা নিয়েই তাদের জীবনের অলীক রাষ্ট্র বদল করে তারা ভারত হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি পৌছল মশালডাঙার দুয়ারে। মস্ত তোরণে সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আব্দুল কালামের মুখ। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি জ্বলজ্বল করছে তোরণে...” স্বপ্ন সেটা নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে দ্যাখো, স্বপ্ন সেটাই যেটা তোমাকে ঘুমোতে দেয় না।” তোরণে গেরুয়া শাদা আর সবুজ রঙের বেলুন অগণিত। পিচ রাস্তার গায়েই দেড়শো মিটার দূরে মশালডাঙার বসতির আরম্ভ। এই একশো মিটার পথের দুপাশ বেলুনে রঙীন শিকলিতে সাজানো। পথে শাদা চট বিছানো যদি বর্ষায় কর্দমাক্ত হয়ে যায়। আমরা সকলে মিশে গেলাম অসংখ্য আনন্দময় মুখের সঙ্গে। বাড়িগুলি সব টিনের। সমুখে অনেকটা প্রশস্ত জায়গা। খেলার মাঠের মতো তার আয়তন। সেখানে মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। এসেছে এই দেশের বহু টেলিভিশন চ্যানেল। হিন্দি, ইংরিজি, বাংলা... সকলে উপযুক্ত লোক খুঁজে তাঁদের আনন্দের অভিব্যক্তিকে ধরে রাখছেন। পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গায়। শহরের মানুষ, গঞ্জের মানুষ, গ্রামের মানুষ জেনে যাচ্ছে স্বাধীন দেশের ভিতরে আর এক স্বাধীনতার জন্ম হচ্ছে। এই গ্রামে গত ৬৮ বছরে কিছুই হয়নি। না জল, না আলো, না ইস্কুল, না স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আজ জেনারেটরে আলো জ্বলেছে। ঝলমল করছে সব। একটু ভেতরের দিকে গেলাম। মশালডাঙার ভিতরে সাড়ে ছ’বিঘা একটি অংশ আছে, সেই সাড়ে ছ’বিঘা জমি ভারত। অদ্ভুত। জমি আর গ্রাম আর মানুষের জীবন নিয়ে যেন জুয়া খেলা হয়েছিল দূর কোনো অতীতে। মহাভারতের সেই পাশাখেলা যেন ঘটেছিল এই সব গ্রাম নিয়ে। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। অন্ধকারে সোনার থালার মতো চাঁদ উঠছে সকলের অজান্তে। চাঁদের আলোর ভিতরে পতাকা উঠবে, সব কিছু প্রস্তুত। আব্রাহাম লিঙ্কন ও আমি সেই পতাকা দণ্ডের নিচে দাঁড়িয়ে কিছু বললাম। সূচনা কথা। আবেগে কী আর বলব? জীবন ধন্য হলো। স্বাধীনতার জন্ম তো আমি আগে দেখিনি এই স্বাধীন ভারতের ভিতর। এখন আমি যেন তাকে ছুঁয়ে দেখতে পারছি। সে আসছে পায়ে পায়ে। অবগুণ্ঠনবতী অবগুণ্ঠন খুলছে। যে স্বাধীনতা জন্ম নেবে কয়েকঘন্টা বাদে তা যেন প্রকৃত মুক্তির স্বাদ নিয়ে আসে মানুষের কাছে। মূল মঞ্চের একদিকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আব্দুল কালামের ছবি আর সেই সেই স্বপ্ন দেখার বাণী। অন্যদিকে এই আন্দোলনে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই প্রয়াত নেতা দীপক সেনগুপ্ত। এই মঞ্চে এক অভিনব, অসামান্য অনুষ্ঠান করা হলো তারপর। যে লাঞ্ছনা, অপমান সয়েছে ছিটমহলবাসী এত বছর ধরে, সেই সমস্ত ঘটনায় জড়িত কিছু কিছু মানুষ মঞ্চে এলেন। তাঁদের অপমানের কথা স্মরণ করা হলো। সপুত্র আসমা বিবি আর তাঁর স্বামী এলেন। তাঁদের এই সন্তান জন্মের জন্য দিনহাটা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়েছিল। আসমা বিবি

ভারতের ভিতরে বাংলাদেশি ছিটের বাসিন্দা হিসেবেই হাসপাতালে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। স্বামীর নাম ও ঠিকানা লুকোতে অস্বীকার করেছিলেন। শেষ অবধি হাসপাতালেই জন্ম হয় তাঁর সন্তানের। কত কথা শোনা গেল। কে ভিনদেশি অনুপ্রবেশকারী হয়ে ধরা পড়ে বাংলাদেশে চালান হয়ে গিয়েছিল। পুশব্যাক। কারা ছিট থেকে বেরিয়ে জেল খেটে বাড়ি ফিরেছিল। কত অসম্মান। ছিটের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে যায়। ছিটের মানুষ নামহীন গোত্রহীন যেন। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছিল। রাত দশটার পর জাভেদ শামিম নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখান হলো ছিটমহল নিয়ে। তার ভিতরে ১০৫ বছরের আজগার আলির কথা শোনা গেল। সন্ধেয় সেই পিতৃপুরুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। তিনি এই দিনটির জন্য বেঁচে আছেন। কী হাসি সেই একশো বছরের প্রাচীন মুখখানিতে! রাত বারোটার দিকে ঘড়ির কাঁটা হাঁটছে। ফানুস উড়ল আকাশে। একটু আগে ঝিরঝির করে বৃষ্টির কণা ঝরেছিল। আকাশের আনন্দাশ্রু। বাজি পুড়তে আরম্ভ করেছে। বাচ্চা কোলে মায়েরা, শাশুড়ি ননদ নিয়ে আসছেন তো আসছেন। আকাশে রঙিন আলোর ফুলঝুরি। ফানুশ উড়ে যাচ্ছে চাঁদের দিকে। চাঁদ তখন মাথায় মাথায়। পতাকা উঠল চাঁদের দিকে। এত উল্লাসের ভিতর স্বাধীন দেশের সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির জন্য এক মিনিট নীরবতা। তা শেষ হলে জাতীয় সঙ্গীত। পতাকা উড়ে তা রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে অর্ধনমিত হলো। হে স্বাধীনতা তোমাকে আমি স্পর্শ করলাম হয় তো। মাথা ছোঁয়ালাম তোমার মাটিতে।

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা - (শামসুর রাহমান)

হে স্বাধীনতা তুমি

আমরা চলেছি স্বাধীন ভারতের পতাকা তুলতে অনেকটা দূরে। ধরলা নদী পেরিয়ে বাঁশুয়া খামার সেই মৌজার নাম। কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার গীতালদহ সীমান্তে। ওদিকে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলা। আর আছে ঠিক সীমান্তে ওপারে সেই মোগলহাট। ধরলা নদীর ওপারে মোগলহাটের কথা আমি অনেক শুনেছি। ঐ হাট বসিয়েছিল এক মোগল ফৌজদার। মোগল ফৌজদার কোচবিহার জয় করতে আসছিল রংপুর থেকে। ধরলা নদীর ধারে, ওপারে তাঁবু ফেলে কদিন বিশ্রাম। খোঁজ খবর আসছে স্বাধীন রাজ্য কোচবিহার থেকে। রাজার দত্তক পুত্র দীননারায়ণ সিংহাসনের লোভে মোগল ফৌজদারকে ডেকে এনেছিল এই রাজ্যে। একটি বছর কোচবিহার ছিল মোগলের অধীন। ফৌজদার সিংহাসনে বসিয়েছিল দীননারায়ণকে। এ হলো অষ্টাদশ শতকের তিরিশের দশকের কথা। এক বছর পর কোচবিহারের রাজা ভুটানের রাজার সাহায্যে আবার জয় করে নেন নিজ রাজ্য। এ হলো ইতিহাসের কথা। কিছু সত্য। কিছু কল্পনা। হয়তো অনেক সত্যই হারিয়ে গেছে, কিন্তু কিছু কিছু চিহ্ন নিয়ে সেই সময় টিকে আছে। মোগলহাট সেই চিহ্ন। আমরা মোগলহাটে যেতে পারব না, সেই হাট বাংলাদেশ। বাংলাদেশ আমার দেশ নয়। কিন্তু আমার পিতৃপুরুষের দেশ। স্বজন বন্ধুদের দেশ। ভারত আমার দেশ। আমার ও আমার সন্তানদের দেশ। আমরা চলেছি এক নতুন ভূখন্ডকে স্বাধীন ভারতের অংশ ঘোষণা করতে। গত রাতে ঠিক বারোটার সময় আকাশে ছিল পরিপূর্ণ চাঁদ, মেঘের ভিতর থেকে তা মুখ বাড়িয়েছিল মধ্য মশালডাঙা মৌজায় স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন দেখতে। রাত বারোটার সেই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান ছিল ছিটমহল বিনিময় সমিতির। অনেক ফানুস উড়েছিল, অনেক আলোর ঝলকানি দেখেছিলাম, দেখেছিলাম কত উল্লসিত মুখ, ছিটমহলের বাসিন্দারা পেল নিজ দেশ নিজ দেশের ভিতরেই। গ্রামগুলির অদ্ভুত এক অলীক এক পরিচয় ছিল, দেশের ভিতরে বিদেশ। ভারতের ভিতরে বাংলাদেশ। তারা আজ ১লা আগস্ট থেকে হয়ে গেল ভারতের ভিতরে ভারত। গত ৬ই জুন ২০১৫ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় বসে যে স্থলসীমা চুক্তি করেছেন, তাতেই এই ঘোষণা ছিল। প্রশাসন ১লা আগস্ট সকাল নটায় ভারতের একান্ন ছিটমহলেই ভারতের পতাকা উত্তোলন করে সেই স্বাধীনতায় শিলমোহর দেবেন। আমরা, আমি, তরুণ বন্ধু সাংবাদিক অনমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রশাসনের সঙ্গী হলাম। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শীতল বসু বললেন, ৫১ ছিটের ভিতরে দিনহাটা মহকুমায় আছে ১৯টি ছিট-মৌজা।

ছিটমহল বিনিময় সম্পূর্ণতা পাবে সেখানে প্রশাসন ভারতের পতাকা উত্তোলন করলে। প্রশাসনিক স্বীকৃতি ছিল না বলেই তো ছিটমহলের একান্ন গ্রাম ছিল রাষ্ট্রহীন। আর রাষ্ট্রহীন হওয়ার যে ভয়ানক অপমান, লাঞ্ছনা ছিটমহলের মানুষ ১৯৪৭ থেকে এই ২০১৫ পযর্ন্ত ভোগ করেছে তা অবর্ণনীয়। আসলে সে ছিল বন্দী দশা। ভারতের ভিতরের ভূখণ্ড, কিন্তু তা আগে পাকিস্তান পরে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহলগুলির যোগাযোগ নেই বছর তিরিশ আগে কাঁটাতারে সীমান্ত ঘিরে ফেলার পর থেকে। যদিও ধরলার ওপারে কাঁটাতার নেই। তাই বাঁশুয়া খামার মৌজাটি স্থলভূমিতে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যদিও সেই বাংলাদেশে যেতে হলেও ভারতীয় গ্রাম দড়িবশ ও ঝালি ধরলা পার হতে হতো। এক দেশের ভিতর দিয়ে আর এক দেশে। শুনলাম সবর্ত্র এবার কাঁটাতার বসে যাবে। স্থলসীমা চুক্তির জন্যই অপেক্ষা করছিল প্রশাসন। ছিটমহলবাসীর বন্দীদশা এমনই ছিল, গ্রাম থেকে বেরিয়ে ভারতীয় ভূখন্ডে পা রাখলেই পুলিশ কিংবা সীমান্তরক্ষীদের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে বাংলাদেশে পুশব্যাক, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সবুদ ছিল না। আবার বাংলাদেশেও তারা অবাঞ্ছিত। আইনত বাংলাদেশী হলেও কোনো পরিচয়পত্র নেই। ভারতের ভিতরে বাস।

সেই নেই রাজ্যের বাসিন্দারা এতদিনে পায়ের তলায় মাটি পেল। সেই মাটি এক দেশ পাবে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রাষ্ট্রের পতাকা তুললে।

১লা আগস্ট সকালে দিনহাটা থেকে রঙপুর রোড ধরে রওনা হলাম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনে। স্বাধীনতা উদযাপনে। আমি তো ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা দেখিনি। স্বাধীন দেশে জন্মেছি। স্বাধীন দেশে বড় হয়েছি। পরাধীনতা, বন্দীদশা ইত্যাদির সঙ্গে আমার কেন, আমরা যারা যাচ্ছি গীতালদহর দিকে বাঁশুয়া খামারের পথে, তাদের কোনো পরিচয় হয়নি এতটা জীবনে। আমিই বোধ হয় সিনিয়র ছিলাম সেই যাত্রা পথের সঙ্গীদের ভিতর। আমিও জানি না রাষ্ট্রহীনতা এক ব্যক্তি মানুষের জীবনে কতটা অভিশাপ হয়ে আসতে পারে। ছিটবাসী আপনি আপনার সন্তানটিকে পালস পোলিও খাওয়াবেন। সন্তানের মা সন্তান কোলে পালস পোলিও শিবিরে গেল। স্বামীর নাম, ঠিকানা? ছিটমহল হলে মাকে সন্তান নিয়ে ফিরে আসতে হবে। অগত্যা মূল ভূখন্ডের কোনো ব্যক্তির নাম ঠিকানা, স্বামীর নাম আর ঠিকানা হলো সেই মায়ের। সন্তানের পিতৃপরিচয় বদল করে তবে না পালস পোলিও খাওয়ানো। কত লজ্জা আর অসম্মান। ইস্কুলে ভর্তি হতে হলেও সেই পিতৃপরিচয় বদলীকরণ। ছিটমহল তো বিদেশ। মানুষের মৌলিক অধিকার ছিটমহলবাসীর ছিল না। আপনার ১৬-১৭ বছরের কন্যাকে যদি তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয় মাস্তান, কার কাছে যাবেন অভিযোগ নিয়ে? ছিটমহল যে বিদেশ, সেখানকার মানুষের অভিযোগ ভারতীয় থানা নেবে কেন? অথচ গ্রামগুলি ভারতের ভিতরেই। কত যে অপমান আর লাঞ্ছনা, তার ফিরিস্তি দিলে কাহিনি অনেক বড় হয়ে যাবে। বন্দীর যে অধিকার থাকে তাও ছিল না তাদের। আজ ১লা আগস্ট, আজ সমস্ত লাঞ্ছনার অবসান। আজ তাই আর পুরোন ক্ষতের কথা নাই বা তোলা হলো। গতকাল রাত বারোটার পর থেকে ছিটমহলের পরিচয় বদল হয়ে গেছে। কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরের ৫১টি ছিটে ভারতের পতাকা উড়বে আজ।

রংপুর থেকে কোচবিহার আসার প্রাচীন পথ ছিল এইটা। শুনেছি দেশ ভাগের আগে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে আসার যে রেলপথ ছিল, শিয়ালদহ থেকে রাণাঘাট হয়ে পোড়াদহ, পাকশি জংশন হয়ে হার্ডিঞ্জ ব্রিজে পদ্মা পার হয়ে নাটোর ঈশ্বরদি সান্তাহার জংশন হয়ে এইদিকে, তার একটা শাখা লালমনিরহাট হয়ে গীতালদহ দিয়ে কোচবিহারে ঢুকত। সেই লাইনের পরিত্যক্ত রেলব্রিজ আছে গীতালদহে ধরলা নদীর উপর। আমরা রংপুর রোড ধরে অনেকটা পথ গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গ্রামের পথ ধরে ধরলা নদীর দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শীতল বসু বললেন, গন্তব্য কাশেমের ঘাট। সেখানে বি.এস.এফ আমাদের জন্য স্পিড বোট রেখেছে নদী পার হয়ে বাঁশুয়া খামার ছিটে যাওয়ার জন্য। ধরলা বাংলাদেশে যে নদীর নাম, যে বিস্তৃত নদীর কূলে আমরা পৌছলাম, সেই নদীই আমাদের কোচবিহারের অন্যত্র শিঙ্গিমারি নদী। শিঙ্গিমারি নদীকে আমি পেয়েছিলাম বাতৃগাছি পার হয়ে বাংলাদেশি ছিটে ঘেরা ভারতীয় ভূখন্ড মদনাগুড়ির গায়ে। এই শিঙ্গিমারি আরো উত্তরে মাথাভাঙার দিকে মানসাই নদী। মানসাই নদীর নামই আরো উত্তরে পাহাড়ের কোলে জলঢাকা। এক নদীর নাম ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন। কত বড় এই নদী। ভরা শ্রাবণে তার ওকূল দেখা যায় না। মাঝে চরও পড়েছে। কাশেমের ঘাট নামটিও প্রায় তিনশো বছর আগের ইতিহাসকে ছুঁয়ে আছে। ছিটমহলের উৎপত্তি তার সঙ্গে হয়তো জড়িত। মোগল ফৌজদার কাশেম আলি কোচবিহারের রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের কাছে যুদ্ধে পরাজয়ের পর এই ঘাট থেকে ধরলা নদী পার হয়ে রঙপুরের পথে পালিয়েছিল। সন ১৭৩৮। মোগলরা এক বছর কোচবিহার দখলে রেখেছিল। আর তখন মোগল সৈন্যরা যে গ্রামগুলিতে বসত করেছিল, সেই গ্রামই এখন ভারতের ভিতরে বাংলাদেশ, কেন না মোগল সৈন্যরা কোচবিহার রাজ্যে বাস করে মোগল ফৌজদার অর্থাৎ বাংলার নবাবের প্রতি আনুগত্য রেখেছিল। তাদের খাজনা জমা পড়ত রঙপুরে। খাজনা যিনি পাবেন, তাঁরই অধীনতায় গিয়েছিল মৌজাগুলি।

কাশেমের ঘাটে বি,এস,এফের চৌকি। নদী পেরিয়ে কেউ এলে পরিচয় পত্র দেখাতে হয় এখানে কেন না বিস্তীর্ণ সীমান্ত কাঁটাতারহীন অরক্ষিত। নদী পেরিয়ে ওপারেও একটি চৌকি আছে। ঘাট থেকে বি,এস,এফের স্পিড বোটে উঠে আমরা চললাম ওপারে। একটিতে আমরা, আর একটিতে দৃপ্ত সীমান্ত প্রহরীরা। আমাদের

সঙ্গেও দুজন আছেন। নদীর ভিতর থেকেই পুরোনো রেলব্রিজ দেখা গেল। বন্যায় ওই রেলব্রিজ নষ্ট হয়েছে। আর ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্রিজটি সাক্ষী হয়ে আছে অবিভক্ত বাংলার। বাতাস হচ্ছে। জল খলখল করছে। আমার মনে পড়ছে গত ডিসেম্বরে এই নদী পেরিয়েছিলাম বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ি ঘাটে। গন্তব্য ছিল বাংলাদেশের ভিতরে ভারতীয় ছিট দাশিয়ারছড়া। হয়তো এই নদীপথে সেই ফুলবাড়ি ঘাট বেশি দূর নয়। দেশভাগ, সীমান্ত সমস্তটা কত আলোকবর্ষ দূরত্ব যে করে দিয়েছে এ ঘাট থেকে ও ঘাটে, তা মেপে দেখার উপায় নেই। ওপারে ঘাটও সেই কাশেমের ঘাট। ঘাটে উঠে হাঁটাপথ এক কিলোমিটারের মতো। অনেকটা চর। মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা চলছেই। বালি উড়ছে দমকা বাতাসে।

চর ভেঙে আমরা বাঁশুয়া খামারের পথে। আমাদের পথ দেখাচ্ছেন বি.এস.এফ কমান্ডার। মস্ত তার চেহারা। হরিয়ানা থেকে এসেছেন। আমার ঝোলাটি নিতে চাইলেন। দিলাম না। কিন্তু ভাল লাগল। পাটক্ষেতের ভিতর দিয়ে পথ। তারপর আবার জমির আল। উঁচু জমি তাই আমন চাষ এইটুকু পথে নেই। শুধুই পাট। আর সব্জি। আমরা মিনিট পনের হেঁটে পৌঁছে গেলাম ছিটে। যেতে যেতে শুনলাম দূরে কোথাও উলুধ্বনি। বিয়ে না হলে কেন তা হবে এই সকালে। হয়তো গায়ে হলুদের সুস্নিগ্ধ বাতাস বয়ে আনছে ওই মঙ্গলস্বর। স্বাধীনতা পাচ্ছে একটি গ্রাম, পাশের গ্রামে বিয়ে। মঙ্গলধ্বনি। এই মঙ্গলধ্বনি কিন্তু স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলনের জন্যও। সমস্ত কিছু শুভ হতে যাচ্ছে।

এই ছিট খুব ছোট। আয়তন ২৪ একর ৫৪ শতক। সবুজ মাঠের ভিতর পতাকা তোলার প্রস্তুতি সারা। এখানে আট ঘর মানুষ। বাকিটা জমি। কুটির টিনের। ঘেরা আছে সুপুরিবনের সারি দিয়ে। পাশের মৌজা দড়িবশ ও ঝাল্লি ধরলার মানুষ এসে ভীড় করেছেন মাঠে। তাঁদের কারো কারো জমি আছে এখানে। ছিটের জমি, দখল আছে কিন্তু বেচতে হলে সেই লালমনিরহাট। রেজিস্ট্রি করার উপায় নেই। ছিট অপবাদ ঘুচলে সব হবে। চাষীবাসি মানুষের সবই তো জমি। বেচাও হয় বিপদে পড়লে, টাকার দরকার হলে, অসুখবিসুখে বা মেয়ের বিয়ে দিতে হলে। আবার কেনাও হয় হাতে টাকা এলে। টাকা আসে চাষবাস ভাল হলে। কেনা বেচা চলতেই থাকে। সেই কেনা বেচায় ছিটমহল ছিল না। তবে টাকা নিয়ে দু-পাঁচ বছরের চাষের স্বত্ব ছেড়ে দেওয়া হতো। সেই সব প্রথার অবসান হবে। নদীর ওপার, মূল ভূখণ্ড থেকে ইস্কুলের ছেলেমেয়েদের আনা হয়েছে প্যারেডের জন্য। সকলের শাদা পোশাক। শাদা পোশাকে স্পোর্টস ইন্সট্রাক্টর। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পতাকা তুলে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই বাঁশুয়া খামার তা ঘোষণা করবেন। তিনি মাইক্রোফোনে বললেন সমস্ত কথা। দিনটি পুণ্য। স্বাধীনতার চেয়ে বড় অর্জন আর কিছু হয়না। মুক্ত হচ্ছে ছিটমহল আর তার বাসিন্দারা। প্যারেড শুরু হলো। আমি, বন্ধু তরুণ সাংবাদিক অনমিত্র অবাক হয়ে দেখছি আর সব মানুষের মুখ। তাঁরা অভিভূত। ৬৮ বছরের গ্লানি পতাকা উঠে গেলে কেটে যাবে। ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার এমনই স্নেহ আর ভালবাসা। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পতাকা তুলতে লাগলেন। পতাকা উঠল। বাতাসে পতপত করে উড়ছে। পতাকার উড়ানে যেন মুক্ত মানুষের, মুক্ত মাটির উল্লাস। সকলে ঘিরে দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইছে। কী এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। গরিব মানুষ তারা। তাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তারা গলা মিলিয়েছে জাতীয় সঙ্গীতে। এরপর প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে আব্দুল কালামের মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে পতাকা অর্ধনমিত করা হলো। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নানা জনকে আহ্বান করলেন তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য। অনেকেই বললেন। ছিটের বাসিন্দা এক গৃহবধূ বললেন অন্তরের কথা। এতদিন প্রতিবেশির তাচ্ছিল্য পেয়েছেন শুধু। হয় তো ঘৃণাও করত তারা। আজ তা থেকে মুক্ত হতে পেরেই তিনি আনন্দিত। ছিটের মানুষ সেই অপবাদ ঘুচবে যে এ জীবনে তা কল্পনাও করেননি। ভেবেছিলেন ছিটেই মাটি নিতে হবে তাঁর শ্বশুর, দাদা শ্বশুরের মতো। ছিটের মাটি কি আসল মাটি? সেই মাটিতে কি মানুষ শান্তিতে ঘুমোতে পারে? কিন্তু এখন দেশের মাটিতে ঘুমোনোর অধিকারও অর্জন হলো যেন। খুব ভালো লাগছে তাঁর। আনন্দাশ্রু আঁচলে সামলালেন। এখন কোমর বেঁধে বাঁচতে হবে। বাঁচার অধিকার আদায় করতে হবে। হাঁটতে পারেন না, শরীর পেছন দিকে বেঁকে গেছে। কোনো রকমে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসেছিলেন এক মধ্য

বয়সী। বেঁচে থাকার কষ্টের ছায়া তাঁর দেহ জুড়ে। তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। স্বাধীনতার এত দাম যে তা আগে দেখিনি।

আসছি ফিরে। আবার নদীঘাট। কাশেমের ঘাট। পিছনে ফিরে তাকালাম। পাট ক্ষেতের আড়ালে চলে গেছে গ্রাম আর মানুষ। হয় তো আর কখনোই আসা হবে না এখানে। কিন্তু মনে থাকবে সেই হাসিমুখখানি। তাঁর হাতে মিষ্টান্নের প্যাকেট দিয়েছিলাম আমি। তিনি নিলেন। কথা বলতে পারেন না মনে হয়। দেহ কাঁপছে। আমার দেশের নাগরিক হলেন তিনি আজ থেকে। তাঁর মুখে হাসি ফোটানোই এখন প্রশাসনের বড় কাজ। পতাকার মর্যাদা তাতেই রক্ষিত হয়। স্বাধীনতা হোক আকাশের মতো। রৌদ্র ছায়া তুমি স্বাধীনতা। মুছে দিও সব অপমান, সমস্ত লাঞ্ছনা।

স্বাধীনতা তুমি,
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা,
খুকির অমন তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসি বটের ঝিলমিল পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

-শামসুর রহমান

কালো বরফ, জাতির জীবনের কালো দিনের কথা

মাহমুদুল হক ততো পরিচিত নন এদেশে। তিনি বাংলাদেশের লেখক। এখন বেঁচে নেই। তিনিও হাসান আজিজুল হকের মতো এপারের মানুষ, পারটিশনের পর তাঁদের পরিবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন। এই বই সেই দেশভাগের বিষ-বেদনা ধারণ করে আছে নীলকণ্ঠের মতো।

আসলে আমরা চলে এসেছিলাম, ওঁরা চলে গিয়েছিলেন। আমরা মানে আমার বাবা কাকারা, আমার দাদা, এঁরা ছেড়ে এসেছিলেন এজাহার শানা, মোজাহার শানা, কুলছুম, ময়রম...কাল ভৈরব, চণ্ডী মণ্ডপ, বাগান পুকুর, প্রতিবেশীজন। ওঁরা ছেড়ে গিয়েছিলেন বারাসত, হাতিপুকুর, শেঠপুকুর, কাজীপাড়া, ছবিদি, টুকু, কেনারামকাকা, নির্মলকাকা...। জাতির ভবিতব্য যা ছিল তাই ঘটেছিল। আর সেই মিলিত শোক এত বছরেও কাটেনি। মিলিয়ে যায়নি। তাই এখনো দেশ বিভাগ নিয়ে কথা হয়। লেখক তাঁর শোকের কথা রেখে যান তাঁর রচনায়। আমার মা ২০০৪-এ চলে গেছেন, ১৯৪৭ থেকে এতটি বছর দুঃখ নিয়ে বেঁচেছেন। তিনি সেই কপোতাক্ষ, বড়দলের স্টিমারঘাটা, ধুরোল সাতক্ষীরে আর বাঁকা-ভবানীপুর গ্রামের কথা বলেই গেছেন। তাঁর কাছে শুনে শুনে আমি চিনেছিলাম আমাদের ফেলে আসা মাটি আর দেশ। মা রাধারানির বেদনাকেই উত্তরাধিকার সূত্রে ধারণ করেছি আমি। সদ্য ঘুরে এসেছি মায়ের বাপের বাড়ি, আমার মাতৃকুলের দেশ, সেই গ্রাম, মজে যাওয়া কপোতাক্ষ নদ, টের পেয়েছি কীভাবে আমরা ধারণ করি সমস্ত বেদনার ভার। দেশ ভাগের সময়কাল যত দীর্ঘ হচ্ছে, দেশ ভাগের কথা ততো উঠে আসছে এই কালের লেখকদের লেখায়।

কালো বরফ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তখন পূর্ব পাকিস্তান নেই। যে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তারা, সেই পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ওপারের বাঙালি নিজের দেশ পেয়েছে কুড়ি বছরের উপর, কিন্তু তখনো বুঝি যায়নি পুরাতন শোক, তাই তাঁকে সেই শোকের কথা লিখে যেতে হয় অত বছর পরে। 'কালো বরফ' হল সেই শোকগাথা যা ক্রমাগত পাঠই হয়ে যাবে। আমি বছর দশ আগে প্রথম পড়ি, আবার পড়ি এখন। আমি সেই প্রথম পাঠকে ভুলিনি, দ্বিতীয় এই পাঠও আমার কাছে নতুন হয়ে এসেছে। আমি এখনো শুনতে পাচ্ছি রাত গভীরে ঘাটের পর ঘাট পার হয়ে গেছে স্টিমার, দেশ জুড়ে বিদায়ঘাট, তারপাশা, ভাগ্যকুল, ষাটনল, লৌহজং-তোদের আমি মারব, তারপাশা তোকে আমি মারব, ভাগ্যকুল তোকে আমি মারব, নদী তোকে আমি মারব...। আবার তো এও শুনেছি তারপাশা, ভাগ্যকুল, গোয়ালন্দ, ধুরোল, সাতক্ষীরে, কপোতাক্ষ, তোদের জন্য আমি কাঁদব। কাঁদব। সেই ক্রন্দনধ্বনি এখনো শোনা যায়। আমি 'কালো বরফ' পড়তে পড়তে আবার শুনতে পেয়েছি সেই কান্না। রাত দুপুরে আব্দুল খালেক কাঁদছে একা অন্ধকারে। তার বউ রেখা টের পেয়েও তাকে কাঁদতে দেয়। আসলে দেশভাগ তো নয়, মানুষের অন্তরটাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হৃদয় জোড়া লাগে না। লাগেনি এতবছরেও। 'কালো বরফ' সেই কাহিনি যেমন, তেমনই দুই নিরূপায় মানুষের কাহিনিও। আব্দুল খালেক ও রেখা। রেখার মা বাবা ছিল না, মামার বাড়ি লাথি-ঝেঁটা খেয়ে মানুষ। সে আব্দুল খালেকের সংসারে এসে শুধুই অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। স্বামী স্বাভাবিক নয়, রোজগেরে নয় তেমন। তার কলেজ অ্যাফিলিয়েশন পায়নি। কলেজ থাকবে না সেটি আলুর গুদাম হয়ে যাবে, তার ঠিক নেই। মন মরা হয়ে থাকে সব সময়। আব্দুল খালেক — পোকার কিছু একটা হয়েছে, কী হয়েছে তা রেখা জানে না। আন্দাজও করতে পারে না যে তার স্বামী ছেড়ে আসা শৈশব আর গ্রামের শোক ধারণ করে আছে এত বছর ধরে। সে এদিক থেকে ওদিকে যায়নি, কিন্তু সে ছিল নিরালম্ব এক মানবী। সেই ছোটবেলা থেকেই। সেই নিরালম্বতা তাকে ভীত করে। উদাসীন আর সতত অন্যমনস্ক স্বামীকে দেখে তার ভয় হয়, সে কি অন্য কোনো নারীর প্রেমে পড়েছে ? সে বাজার থেকে ডেকে আনে নরহরি ডাক্তারকে। ডাক্তারের চেম্বারে বসে সে সময় কাটায়,

ডাক্তার জানতে পারে হয় তো। তার কাছে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তার স্বামীর, সে বুঝতে পারে না, সন্দেহ হয় তার...।

আসলে শিকড় তো অনেক গহীনে। সেখানে প্রবেশ করবে কী করে রেখা? সে ছিল নিরূপায় নিরালম্ব এক মানবী, খালেকও কি তাই নয়? খালেক-পোকার রক্তে যে শৈশব রয়েছে তাকে সে এড়াতে পারে না। তাকে সে ভোলেনি। টিপু ভাইজান, মনি ভাইজান, ছবিদি, ইস্কুল, পা ভাঙ্গা শালিক... কী অপূর্ব এক শৈশব এঁকেছেন মাহমুদুল হক। সেই শৈশবই খেয়েছে তার প্রাণমন। সেই ফেলে আসা গ্রাম, মানুষজন। ১৯৪৭-এর কথা তা। তখন বালকের বয়স আট হবে বড় জোর। ক্লাস টু। তার দাদা টিপু কলেজে ভর্তি হয়েছে। মনি ভাইজান ক্লাস নাইন হবে কি? সেই বালকের অমল শৈশবই এই উপন্যাসের আধার। এই উপন্যাসের প্রাণ। ছোট ছোট এমন অনুষঙ্গে ভরে আছে এই উপন্যাস যে পড়তে পড়তে বুক মুচড়ে যায়। দেখতে পাই আমার জন্মের আগের পৃথিবী। এই উপন্যাস তো আমাকে জাতিস্মর করে তোলে। দেখতে পাই সেই সময়কে। সেই যে বালক, পোকা যার ডাক নাম, মানে যে নামে তাকে ডাকত তার আব্বার বন্ধু, গ্রাম সম্পর্কে কাকা কেনারাম, যে কাকার হাত ধরে সে হাতি পুকুর চেনে, শেঠ পুকুর চেনে, সেই যে ছবিদি, পুঁটি নামের আলতা পায়ের মেয়েটি, যে অদ্ভুত সব কথা বলত, মাছের কথা, পাখির কথা, গাছের কথা বুঝতে পারত, গাছের গোড়ায় জল ঢেলে বলত, 'গাছভাই গাছভাই, এই দ্যাখো আমি তোমার গোড়ায় এক ঘটি জল দিলাম, আমার যেন খুব ভাল বর হয়, নইলে কিন্তু খুব খারাপ হবে, একটা ডালপালাও তোমার আস্ত থাকবে না।'

তিনি এঁকেছেন ৪৭-এর আগের যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা সত্তা যেন ছিলই না। হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ের অভিন্নতাই ছিল সেই অপূর্ব শৈশবের যাদু। আর তা ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকে পাকিস্তানের জন্ম হতে থাকায়। সেই ইতিহাস আমাদের জানা। অনেক রাজনৈতিক কচকচি আছে। সেই কুৎসিত রাজনীতির ভিতরে প্রবেশ করেননি লেখক। তিনি একটি সাধারণ পরিবার সাধারণ মানুষের কথা বলেছেন। অতি সাধারণ হয়েছে সেই পোকা, আব্দুল খালেক। গ্রাম ছেড়ে পরিবারটি যখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে, পাকিস্তানের দিকে রওনা হচ্ছে, তখন মণি ভাইজান ট্রাকে না উঠে দৌড় লাগায় পোকাকে নিয়ে। কোথায় গেল তারা, ছবিদের বাড়ি। ছবি পোকার দিদি রানিবুবুর বন্ধু। হা হা করে ওঠে বুক। হায় রে কে জানত মণি ভাইজান ভালবাসত যে মেয়েটিকে, তাকে এই জীবনের মতো, সমস্ত জীবনের মতো ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ছবি তুই আমারে কিছু দে? কী দেবে ছবি মনিকে। মাথার লাল ফিতে খুলে দিল, চুলের কাঁটা, ক্লিপ—তাই নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মনি ভাইজান পোকাকে নিয়ে ফিরল পাকিস্তানের উদ্দেশে যাত্রা করা সেই ট্রাকের কাছে। মনি ভাইজান তার দুঃখকে ভোলেনি। সেই যে পদ্মার ভিতরে অন্ধকারে দূর অনিশ্চিত—পাকিস্তান যাত্রা, তারপাশা, ভাগ্যকুল, গোয়ালন্দ—ঘাটে ঘাটে দাঁড়ানো, বিদায় ঘাটে ঘাটে দাঁড়ানো, মণির হাতে লাল ফিতে, চুলের কাঁটা, ক্লিপ—লুকোন কান্নায় মুচড়ে যাচ্ছে সে। মণি পরে কটি ঘুমের বড়ি খেয়ে মরেছিল। টিপু আছে সৌদি আরবে। রানি বুবুর সুখের সংসার। খালেক মানে সেই পোকা, সত্যিকারের পোকার মতো বেঁচে আছে। হিন্দুস্তান পাকিস্তান, সেই দেশভাগ নিরূপায় সাধারণ মানুষের জীবনকে যে ভাবে নষ্ট করেছিল, এই উপন্যাস সেই কথা উচ্চারণ করেছে। একেবারে সাধারণ মানুষের কথা, না কোনো রাজনৈতিক কার্যকারণ সূত্র, তত্ত্ব এখানে নেই, আছে শুধু সাধারণ মানুষের জীবনের বেদনার কথা, যে কথার খোঁজ রাখেননি আমাদের দেশ নায়করা। এই উপন্যাসে আছে সরল জীবন জটিল হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত। আছে ক্রমে সঞ্চারিত ভয়ের বৃত্তান্ত। হ্যাঁ, মাহমুদুল হকের উপন্যাস পড়ে আমার মনে জেগে উঠছে রাজনৈতিক সেই সিদ্ধান্তের প্রতি চরম ঘৃণা। আসলে সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবেন না কখনো। এখনো না। আমাদের এত বছরের স্বাধীনতা হলো উচ্ছেদের সত্তর বছর। ভিটে হারানোর সত্তর বছর।

এই উপন্যাসের সময় সেই ১৯৪৭-এর শৈশব আর হয়তো গত শতাব্দীর ৮০-র দশক। স্বাধীনতা এসেছে, বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে, কিন্তু সমাজের অসুখটা তো যায়নি। নরহরি ডাক্তারের হতাশা থেকে তা ধরা যায়।

মালাউন—বলে তার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে বাজারে তারই প্রতিবেশী। আব্দুল খালেকের কলেজ উঠেই যাবে। তার মনের ভিতরে সেই শৈশব পাহাড় হয়ে থাকে। সেই যে মাধুরী-মাধু নামের বিধবা বউটির হাতে অসুস্থ হয়ে পড়া স্যাকরা নগেন নিয়েছিল আশ্রয়, সামান্য সেই স্যাকরার প্রেম হয়েছিল ঘুটে কুড়ুনি কাঠ কুড়ুনি মাধুর সঙ্গে। স্যাকরার ছিল ক্ষয় রোগ। স্যাকরা ভালবেসেছিল তাকে। স্যাকরাকেও ভালবেসেছিল সে। কী অপূর্ব সেই প্রেম দেখেছিল বালক। স্যাকরার অন্তিম অবস্থা আর তাকে বাঁচিয়ে তোলার অদম্য ইচ্ছা, মণি ভাইজানের হাত ধরে সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কিছু করতে পারলাম না, ইচ্ছে ছিল! আমি কি কিছু চেয়েছি! বুক ফেটে যায়, ও বাবা গো।' মণি ভাইজানের ছিল নরম প্রাণ। সে বাড়ি থেকে পাঁচ টাকা চুরি করে এনে মাধুরীর হাতে দিয়েছিল নগেন স্যাকরাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সেই মাধু, মাধুরীকে ভোলেনি পোকা—আব্দুল খালেক। সেই প্রেমের কথাও ভোলেনি। সে আর রেখা বেরিয়েছিল একটি নৌকো নিয়ে। হয় তো যে জীবন ফড়িঙের দোয়েলের তার সাথে দেখা হবে, সেই আশায়। তাদের প্রেম যেন ফুরিয়ে যাচ্ছিল। শৈশবে সব হারানোর বেদনা তাকে অধিকার করে ফেলেছিল। "সেসব কত কথা। ইচ্ছে করলেও এখন আর মনে পড়ে না। কতো কথা, কতো চার ভাঁজ করা ছবি, তেশিরা কাচ, লালকুঁচ, কতো সকাল–দুপুর-বিকেল বোকার মতো হারিয়ে ফেলেছে পোকা! কখনো মনে হয়নি, একদিন সব কিছুর আবার খোঁজ পড়বে নতুন করে। বড় অবহেলা ছিল পোকার, বড় অবহেলা। অযত্ন আর হেলাফেলায় কতো কিছুই যে সে হারিয়ে ফেলেছে!...।" কী অপূর্ব এক নদীপথে স্বামী স্ত্রীর যাত্রায় এই উপন্যাস তার অন্তিমে পৌঁছয়। বিল, গাঙ, সেই পদ্মার ঘোলা জলের কাছে পৌঁছন। এক জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে তারা বনের ভিতরে নেমে যায়...। মিলিত হয় ভালবাসায়। গলায় হাত দিয়েও হাত সরিয়ে নিয়ে এসেছিল পোকা। তারপর নদীতে সাঁতের কেটে দুজনে ফিরে আসে নৌকোয়। মৃত মণি ভাইজানের কথা শুনতে চায় রেখা—পোকার প্রেমের মাধুরী। রেখার প্রতি আব্দুল খালেকের প্রেম কতটা নিবিড়, সেই নিরূপায় প্রেমিক-প্রেমিকা, স্যাকরা আর মাধুর যেমন ছিল, তেমনি হয়ে ওঠে অতি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে। পোকা, আব্দুল খালেক ডাকে তাকে মাধুরী নামে। ফিরে আসে সেই নিবার্সনের শৈশব। ভাগ্যকুল, তোকে আমি মারব, তারপাশা, তোকে আমি মারব, নদী, তোকে আমি মারব। মারবে, সেই ভাগ্যকুল, তারপাশাই তো তাকে এই জীবনব্যপী নিবার্সনে এনেছে যেন। এই উপন্যাস অনন্ত এক অশ্রুপাতের। যে অশ্রুপাত আমি আমার ছোটবেলা থেকে দেখেছি আমার মায়ের ভিতরে। যে অশ্রুপাত থামেনি। থামবে বলে মনে হয় না। জন্ম-জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে যাবে। যাবেই।

উপন্যাসটি দেশভাগের বেদনা, দেশভাগে সবর্স্ব হারানো মানুষের হৃদয় বৃত্তান্ত। নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে বা মানুষের ঘরবাড়ি (অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়), কিংবা কেয়াপাতার নৌকা (প্রফুল্ল রায়) উপন্যাসের মতো বৃহৎ নয়। অতি ক্ষীণকায়, কিন্তু অনুভবে সমগোত্রীয়। লিখনে আলাদা। অতি আধুনিক এক লিখন শৈলী এর পরতে পরতে। বইটিকে আমি ঘুরে ঘুরে পড়ি। আবার পড়লাম।

‘৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৫ বছর

২০১৭ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ৭৫ বছর যেমন স্বাধীনতার ৭০ বছর। স্বাধীনতার ৭০ বছর যেমন, দেশভাগেরও সত্তর বছর। এই ২০১৭ আবার রুশ বিপ্লবেরও ১০০ বছর। সত্তর, পঁচাত্তর, একশো... বাঙালি জীবনে এই ২০১৭ যেন উদ্‌যাপনের বছর। রুশ বিপ্লবের একশো বছরও উদযাপনের নিশ্চয়। আমি তো রাদুগা, প্রগতি ইত্যাদি প্রকাশনের অনূদিত রুশ সাহিত্যে বাল্যকাল থেকে পড়েছি। পড়েই সাহিত্যকে ভালবাসতে শিখেছি। লিখতেও শিখেছি কিছুটা। আন্তন চেখভ, রবীন্দ্রনাথ আমাকে ছোটগল্প লেখার প্রথম পাঠ দিয়েছেন। তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, তারাশঙ্কর বিভূতি, মানিক, সতীনাথ আমাকে উপন্যাসের পাঠ দিয়েছেন। রুশ বিপ্লবের একটা মানে আমার কাছে সস্তায় বিশ্বের সেরা রুশ সাহিত্য এসে পৌছন। বিপ্লব হয়েছিল বলেই নিজের দেশের চিরায়ত সাহিত্য অনুবাদ করে প্রায় বিনামূল্যে তারা দেশে দেশে বিতরণ করেছিল। এই মহত্তকে ভোলা যায় না। সাহিত্যের কোনো দেশ, কোনো ভাষা নেই। সাহিত্য বিশ্বজনীন। গোগোলের ওভারকোট কিংবা চেখভের কেরানির মৃত্যু আমার এই শহরের গল্পও। যাই হোক আমি বলব ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কথা। যার প্রথম পাঠ এক সিনেমায়, সিনেমার নাম ‘৪২। এর পরের পাঠ সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস জাগরী এবং ঢোঁড়াই চরিত মানসে। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সতীনাথকে আকৃষ্ট করেছিল এবং গান্ধিবাদী আন্দোলনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রথমবারের জন্য কারারুদ্ধ হন। ‘৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় বন্দী সতীনাথ জেল ভেঙে পালানোর চেষ্টা করেন। এর ফলে তাঁকে ভগলপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হয়। এই কারাবাসই ‘জাগরী’ উপন্যাসের প্রস্তুতিকাল। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদকের প্রত্যাখ্যানের পর ‘জাগরী’ প্রকাশিত হয় সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকে।

১৯৪২ সালের ১৪-ই জুলাই ওয়ারধায় কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির অধিবেশনে পাশ হলো প্রস্তাব, শাসক ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আর সমঝোতা নয়, ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব হিন্দু মুসলমান কারোরই মনে ধরেনি, এবার পূর্ণ স্বরাজ চাই। ইংরেজ ভারত ছাড়ো। অহিংসার কাছে হিংসার পরাজয় ঘটবে, গান্ধীজীর আশা ছিল তাই।

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ছিলেন ব্রিটিশ উপ-প্রধানমন্ত্রী। তাঁকে ব্রিটিশ সরকার বিলেত থেকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্রমাগত বিপর্যস্ত ব্রিটিশ সিংহর জন্য ভারতীয় জনগণের সমর্থন এবং সহযোগিতা অর্জন সম্ভব করার জন্য। ব্রিটিশ সেনা বাহিনিতে শতকরা ৬৫ ভাগ ভারতীয় সৈন্য, তাদের সমর্থন পেতে কংগ্রেসের সমর্থন চাই। এই ইতিহাস আমাদের জানা। তবুও স্মরণ করতে দ্বিধা নেই। এই স্মরণ আমাদের পিতৃপুরুষের তর্পণ। অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী নারী পুরুষ যারা আত্ম-বলিদান দিয়েছে শুধু, পেয়েছে নির্মম দেশভাগ আর উদ্বাস্তুজীবন, অসৎ কালো বাজারিদের উল্লাস, তাদের উদ্দেশে উচ্চারণ করা ভুলি নাই, ভুলি নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিল দান, তাহাদের কথা ভুলি নাই।

৯-ই আগস্ট, গান্ধীজী ডাক দিয়েছেন ইংরেজ ভারত ছাড়ো। সমস্ত ভারত, আসমুদ্র হিমাচল ভারত জেগে উঠেছে। খণ্ডিত ভারত নয়, সম্পূর্ণ ভারত। গান্ধার দেশের সীমান্ত থেকে মণিপুর, নাগাল্যান্ড পর্যন্ত ভারত। ভারত মহাসাগর থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভারত। আমরা ওপার বাংলার মানুষ। স্বাধীনতা মানে পিতৃপুরুষের দেশ ছেড়ে এই দেশে, বসিরহাট এবং কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া। ছোট ফ্ল্যাট, যা আসলে ছিল দাদুর দস্তানার মতো (বাল্যকালের রুশ বইটিকে স্মরণ করুন), তার ভিতরেই দেশ, স্বাধীনতার কথা বাবার কাছে শোনা ভোরের বেলায়। সেই সময়ে এক পনেরই আগস্ট সকালে দেখেছিলাম ‘৪২ নামের একটি সিনেমা, আর দেখেছিলাম ‘ভুলি নাই’। তখন ১৫-ই আগস্ট কলকাতার সিনেমা হলে মর্নিং শো হতো, সকাল দশটা

থেকে বেলা বারোটা এইসব চলচ্চিত্র। স্বাধীনতা দিবস মানে তখন ব্রেক ড্যান্স নয়। ভুলি নাই ছিল মনোজ বসুর লেখা। সেই ছবি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে। মনে আছে সে-ই '৪২। হেমেন গুপ্ত পরিচালিত '৪২ ছবির কোনো কোনো দৃশ্য আলাদা করে স্পষ্ট মনে আছে এখনো। দেশি পুলিশ সায়েবের চাবুক পড়ছে নেটিভ মানুষের উপর। স্তম্ভিত বালকের চোখে জল। সিনেমার প্রধান চরিত্রকে, নায়ককে চাবুক মারার সেই দৃশ্য এখনো মনে গেঁথে আছে। ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে প্রথম জানা ভোরবেলায় বাবার মুখে কিছু কিছু গল্প শুনে, আর সেই বছর দশ-এগারয় বিয়াল্লিশ সিনেমা দেখে। এই ছবিটি ১৯৫১-য় মুক্তি পেয়েছিল। অভিনয় করেছিলেন প্রদীপকুমার, বিকাশ রায়, শম্ভু মিত্র, মঞ্জু দে, নির্মল ঘোষ...। আমি অতি সম্প্রতি দুটি ছবি দেখেছি, বাংলাদেশের নায়ক রজ্জাক মারা যাওয়ার পর জহির রায়হানের জীবন থেকে নেয়া, সেই ১৯৭১-৭২ এর পর আবার। আর দেখলাম '৪২। ১৯৫১ সালে যে ছবি নির্মাণ করেছিলেন হেমেন গুপ্ত, তা এক কথায় অসামান্য। দেখতে বসে এখনো চোখ ফেরাতে পারি না। এই ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য, পরিচালনা, সব ছিল তাঁর। ছবি আরম্ভ হয়, বল বল বল সবে শত বীনা বেণু রবে, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে...এই গানের সুরে। এখনো সেই সুরে দৃপ্ত হয়ে উঠি। হ্যাঁ এই বয়সেও। কিন্তু তার পরেই বুঝি তা তো হয়নি। এই উপমহাদেশ কি ভাল আছে সেই করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র ৭৫ বছর পরে। এক কামারের চরিত্র এঁকেছিলেন হেমেন গুপ্ত। তার বিধবা মেয়ে ময়নাকে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় আত্মগোপনকারী কংগ্রেসীদের আস্তানা খুঁজে বের করার জন্য। জেরায় ময়না ভাঙে না। নিষ্ঠুর পুলিশ অফিসার ছিলেন বিকাশ রায়। ময়নাকে সিপাই ব্যারাকে পাঠিয়ে দেয় পুলিশ কর্তা। ব্যারাক হলো জমিদার বাড়ি। ইঙ্গিতে ধরা যায় কে স্বাধীনতার পক্ষে, কে বিপক্ষে। এই ছবিতে গ্রামের একজন চতুর আড়তদার আছে। পুলিশের চর। সে-এক অসামান্য চরিত্র চিত্রণ। '৪২ ছবিতে প্রতিবাদী ময়নাকে ছিঁড়ে খায় সিপাইরা। তারপর লাশ ফেলে দেয় জলাশয়ে। '৪২ দেখতে দেখতে আমার ১৯৭০-৭২ মনে পড়ে। '৪২ দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ে সেই ৭১-এ সীমান্তের ওপারে মুক্তিযুদ্ধের কথা, পাকিস্তানি সেনার নারী ধর্ষণ আর অত্যাচারের কথা। বাংলাদেশের চিত্র পরিচালক তানভির মোকাম্মেল-এর একটি ছবি, 'রাবেয়া'র কথা। কিন্তু ১৯৫১-র ছবি '৪২-এ আরো এমন কিছু আছে যা আমি কোথাও পাইনি। ১৯৭১-এ মেয়েরা অনেক আলোকিত, চেতনায় উজ্জীবিত, তারা বিপ্লবে বিদ্রোহে এগিয়ে যেতে পারে। আর এই ২০১৭-য় ছত্তিশগড়ের সোনি সোরির কথা আমাদের অজানা নয়। ১৯৪২-এর আন্দোলনে ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, তমলুকে জাতীয় সরকার গড়ে উঠেছিল, ভারত জেগেছিল। তমলুক থেকে পাঞ্জাব, তরঙ্গ উঠেছিল সারা ভারতে। শুনেছি কত অসামান্য প্রতিরোধের গল্প। কিন্তু সব ছাপিয়ে গেছে বিয়াল্লিশ ছবিতে দেখা সেই কামার। গান্ধীজী ডাক দিয়েছিলেন অহিংস আন্দোলনের। ইংরেজ সরকার তা একটু আমিষ করে দিচ্ছিলেন। অত্যাচার সীমাহীন হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ কংগ্রেস অফিস ধ্বংস করছিল। সত্যাগ্রহীদের জেলে পুরছিল। রাষ্ট্রদ্রোহী, বিদ্রোহীরা জেলে যে অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়, তার বিরাম ছিল না। অহিংস সত্যাগ্রহে মেয়েরা অংশগ্রহন করছিল। গান্ধীজী মেয়েদের বলেছিলেন, সঙ্গে একটা করে ছুরি রাখতে, পুলিশ অত্যাচার করার সুযোগ যেন না না পায়। বলা যায় কি, গান্ধীজী মেয়েদের সহিংস আত্মহননের পথ নিতে বলেছিলেনা। আসলে তা ছিল নিজের উপর হিংসা প্রয়োগই। অত্যাচারীর প্রতি নয়, নিজের প্রতি। এখন এই পথ পরিত্যাগ করেছে হয়তো বিপ্লবী কন্যারা। গান্ধীজীর এই অহিংস নীতির পক্ষে বিপক্ষে আমার কথা নয়। কথা সেই কামারকে নিয়ে। নিজের ধর্ষিতা কন্যা ময়নার হত্যাকান্ড তাকে পথ দেখিয়েছিল স্বাধীনতার। রাত জেগে কামারশালে বসে সে ছুরি বানাতে আরম্ভ করল। একটি বালক হাপর টানে সে হাতুড়ির ঘা দেয় তপ্ত লোহায়। লোহায় নয় সেই সব পুলিশ কর্তা আর সিপাই যারা তার মেয়েকে মেরেছে তাদের মাথায় যেন হাতুড়ি নামায়। কম বয়সে দেখা '৪২-এ বিকাশ রায়ের নিষ্ঠুরতার কথা মনে ছিল। কামারের হাতুড়ি নামানর কথা বুঝিনি তখন। এখন দেখতে গিয়ে বুঝি হেমেন গুপ্ত মহাশয় এক অসামান্য মুহূর্ত রচনা করেছিলেন সেই ১৯৫১-য়, যা ছিল প্রতিবাদের সর্বোত্তম প্রকাশ। এবং এই দৃশ্যই সহিংস ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অহিংস প্রতিবাদ হয়ে নেমেছিল যেন।

১৯৪২-এর আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলন। তার আগে যা হতো তা শুধু আলোচনাই। ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতায় কংগ্রেসের সার্বিক ঘোষণা ইংরেজ ভারত ছাড়ো। এমন স্পষ্ট কথা এর আগে কংগ্রেস বলেনি। তখন পাকিস্তান প্রস্তাব নেওয়া হয়ে গেছে দু বছর আগে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে। ১৯৪০-এর ২৪শে মার্চ সেই দিন। এ কথা সত্য ভারতীয় মুসলমান তার আত্মপরিচয় খুঁজছিল এই দেশে। কংগ্রেস তার নিজের পার্টি হয়নি সেভাবে। মহম্মদ আলি জিন্নাহ যিনি ছিলেন বিলেত প্রত্যাগত এক আধুনিক মানুষ, মোটেই ধর্মান্ধ নন, কিন্তু তিনি তাঁর দু-ঘন্টার বক্তৃতায় কংগ্রেস আর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতাদের তীব্র সমালোচনা করে মুসলমানের আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা দেশ দাবি করলেন। মুসলমান জনসাধারণের বৃহৎ অংশে পাকিস্তান প্রস্তাব উদ্দীপনা নিয়ে আসে। তারা উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে নিজ দেশ দাবী করে লাহোর প্রস্তাবে। পরে ১৯৪৬-এ পাকিস্তানের জন্য ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বাংলা এবং আসাম, পূবের বাংলা এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান চেয়েছিল মুসলিম লীগ। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গান্ধিজীর পিছনে স্বাভাবিক ভাবেই মুসলিম লিগ আসেনি। কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন। ১৯৪২-এর মার্চে ভারতে আসা ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়, কেন না এই মিশন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের অবসান অবধি অপেক্ষা করতে বলেছিল মিশন। তারপর নির্বাচিত সরকার শাসন করবে দেশ। মুসলিম লিগের আকাঙ্ক্ষিত দেশভাগ হবে কি হবে না তা ছিল অনুচ্চারিত, কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে যেন সায় ছিল। স্পষ্ট করে না বলায়, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ মানেনি ক্রিপসের প্রস্তাব।

ক্রিপসের মূলত কংগ্রেস ও মুসলিম লিগসহ অন্যান্য দলের নেতৃবর্গের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ‘৪২-এর ২৪শে মার্চ তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। স্বাধীনতাকামী দুই প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগকে তা অবহিত করেন।

(১) যুদ্ধের অবসানে ভারতকে কানাডার মতো অধিরাজ্যের মর্যাদা (Dominion Status) দেওয়া হবে, যা আসলে পূর্ণ স্বরাজ নয়। ব্রিটিশের অধীনেই এক দেশ হবে এই দেশ। মূল ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের কাছেই থাকবে।

(২) যুদ্ধ শেষে ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে এবং সেই সভাকে ভারতের নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

(৩) নতুন সংবিধান কোনো প্রদেশের পছন্দ না হলে সেই প্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী সংবিধান রচনা করতে পারবে। ভারতের যে-কোনো প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য ইচ্ছে করলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও থাকতে পারবে।

(৪) সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ-ব্যবস্থা বহাল রাখা।

(৫) প্রদেশগুলোর প্রাদেশিক আইনসভা সংবিধান সভার সদস্যদের নির্বাচন করবে, অন্যদিকে দেশীয় রাজ্যের রাজারা তাঁদের সদস্যদের মনোনীত করবেন।

(৬) নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার নিজের হাতে রাখবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ‘ভিটো’ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তা বাতিল করার অধিকার বড়লাটের থাকবে।

ক্রিপসের প্রস্তাবগুলো ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সহ ভারতের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলই ক্রিপস-এর প্রস্তাব একযোগে প্রত্যাখ্যান করে।

কংগ্রেস মনে করে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাবে পাকিস্তানের দাবিকে পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় অর্থাৎ ক্রিপস প্রস্তাবে দেশ বিভাগের পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকায় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। সবচেয়ে বড় কথা ভারতের প্রতিরক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দিতে ব্রিটিশ সরকার রাজি ছিল না ক্রিপস

প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারকে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার মতো সম-মর্যাদা ও ক্ষমতা দেওয়ার কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না।

মুসলিম লিগ ক্রিপস প্রস্তাবে সরাসরি দেশ বিভাগ মেনে না নেওয়ায় তা বর্জন করে। ক্রিপস সায়েবের প্রস্তাব প্রত্যখ্যান করে ১৯৪২এর ২৬শে এপ্রিল গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় ভারত ছাড়ো এই শিরোনামের প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চান। ১৪ জুলাই কংগ্রেসের প্রস্তাবে ৯-ই আগস্ট স্থির হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনার দিন। ৯-ই আগস্ট গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়ে যান ভোরে। ভারতবর্ষ জেগেছিল তারপর থেকে কত রাত, কত ভোর। মহাত্মা গান্ধীর পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, জে. বি. কৃপালনী সমেত বহু প্রথম সারির নেতা কারারুদ্ধ হন। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি সংগঠন রূপে ঘোষণা করে। সর্বত্র কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। হেমেন গুপ্ত মশায়ের বিয়াল্লিশ ছবিতে সেই সব সাধারণ মানুষের কথা আছে, তাদের আত্মত্যাগের কথা। প্রথম প্রথম এই আন্দোলন ছাত্র-শিক্ষক, যুবসম্প্রদায় ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ক্রমে তা দেশের শ্রমিক, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গণআন্দোলন হয়ে ওঠে। সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে দেশের আপামর জনসাধারণ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। দেশব্যাপী ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, মিছিল, মিটিং ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এ সবের প্রতি সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। নির্বিচার ধর-পাকড়, অত্যাচার শুরু হয়। ২৯শে সেপ্টেম্বর দিন নির্ধারিত হয়েছিল সার্বিক অসহযোগের। অবরোধের। অহিংস মিছিলের। রেললাইন ধ্বংস, স্কুল-কলেজ বর্জন, বিভিন্ন অফিস-আদালত দখল, ট্রেন ও টেলিফোন সংযোগ বিছিন্নকরণ, থানা, ডাকঘর, রেজিস্ট্রি অফিস, রেলস্টেশন দখল ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। '৪২ ছবিতে আছে সরকার সমস্ত রকম পরিবহন নিষিদ্ধ করছে। সাইকেল পর্যন্ত। যাতে আন্দোলনকারীরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল মহারাষ্ট্রের সাতারা, মেদিনী পুরের তমলুক, কাঁথি, দিনাজপুরের বালুরঘাট, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, আজমগড়, আসামের নওগাঁ, ওড়িশার তালচের, বালাশোর ইত্যাদি। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে সাতারার শ্রীনাথ লালা, নানা পাতিল, বালিয়ার চৈতু পাণ্ডে, সরযূ পাণ্ডে, তমলুকের মাতঙ্গিনী হাজরা, সুশীল ধাড়া, পাঞ্জাবের গৃহবধু ভোগেশ্বরী ফকোননি, আসামের স্কুলছাত্রী কনকলতা বড়ুয়া ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দীপশিখা হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়া অরুণা আসিফ আলি, সুচেতা কৃপালিনী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, রামমনোহর লোহিয়া, যোগেশ চ্যাটার্জি, উষা মেহেতা, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অজয় মুখার্জি এই আন্দোলনে নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

অবিভক্ত বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথি মহকুমায় এই আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা ছিল বেশি। তমলুকের মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন গান্ধিজীর অনুরাগিনী একজন গ্রাম্য বিধবা মহিলা। দেশ তাঁর কাছে ছিল জননী স্বরূপা। মহাত্মাজী ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিলে মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরার নেতৃত্বে হাজার হাজার মানুষ ১৯৪২-এর সেই অসহযোগের দিন, ২৯ শে সেপ্টেম্বর নানাদিক থেকে এসে তমলুক থানা ও আদালত অবরোধ করেন। '৪২ ছবিতে রূপকাশ্রয়ে এই দিনটির কথা আছে। ৭৩ বছর বয়স্কা কৃষকবধু মাতঙ্গিনী হাজরা তমলুক আদালত শীর্ষে ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা তুলতে গিয়ে ব্রিটিশের গুলিতে প্রাণ হারান। মাতঙ্গিনী হাজরার দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আদর্শ জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে। অজয় মুখার্জি, সুশীল কুমার ধাড়া ও সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে প্রশাসনের কেন্দ্র, মহকুমা অফিস দখল নেওয়া হয়। অজয় মুখার্জির উদ্যোগে ১৯৪২-এর ১৭ ডিসেম্বর তমলুক মহকুমায় 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' গঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সরকারি দমন নীতির প্রচন্ডতা ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে ভারত ছাড়ো আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসে। হেমেন গুপ্ত মহাশয়ের '৪২ ছবিতে মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মত্যাগের মতো বৃদ্ধা ঠাকুমার মৃত্যু আছে পুলিশের গুলিতে। পতাকা হাতে শিশু মৃত্যু আছে। আছে প্রধান চরিত্র, নায়কের স্ত্রী উন্মাদিনী ধর্ষিতা নারী বীনার চেতনা পুনরজ্জীবন। সে-ই পতাকা হাতে মিলিটারি ব্যারাকের ভিতরে যাত্রা

করে। তার পিছনেই জনতা। ধর্ষিতা নারীকে সমুখে দেখে ধর্ষক পুলিশ কর্তা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। ‘৪২ এক আশ্চর্য ছবি। অন্তিম দৃশ্যে, স্বাধীনতা এলে যখন জনতা জয়ধ্বনি করে, তার ভিতরে গান্ধী টুপি পরিহিত সেই আড়তদার দালাল-গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে। সে জয়ধ্বনি করছে গান্ধীজীর নামে। স্বাধীনতার পরে যা হয়েছিল তাই-ই দেখিয়েছেন পরিচালক। স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে সেই সব দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষই ক্ষমতার কাছাকাছি চলে যায় যে তা আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে। তারাই বেশি গান্ধীবাদী হয় এবং দরকারে দমন-পীড়ন হত্যা করে। কিন্তু আমাদের শেষ কথা, কিছুই ভুলি নাই। ১৯৪২- আমাদের স্মরণে আসুক আবার। ‘৪২-এর আন্দোলনে স্বাধীনতা এলে এই উপমহাদেশের চেহারা অন্য রকম হয়ে যেতে পারত।

একেই কি বলে সভ্যতা

ভালো আর মন্দ মানুষ নিয়েই তো সমাজ। নিজ দেশে ভালোমানুষ দেখেছি অনেক, কিন্তু সমাজটাকে দেশটাকে তাদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারলাম কই? আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে সেই কৈশোর থেকে কত অভিযোগ শুনেছি। অভিযোগ তো মিথ্যে ছিল না, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধ থেকে পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধ চলছে অবিরত, সেখানে আমেরিকার ভূমিকা ছিল এবং রয়েছে প্রধান। যুদ্ধ আর অস্ত্র ব্যবসা তার অর্থনীতিতে এমন ভূমিকা নিয়েছে যে তা বন্ধ করা সম্ভবই নয় যেন। খোলাবাজারে অস্ত্র বেচা-কেনা হয় সে দেশে, ইস্কুলে গিয়ে রাইফেল হাতে অপরিণত মনস্ক কিশোর তার সহপাঠীদের মেরে ফেলে এই সত্যকে লুকোনো কঠিন। এই অস্ত্র ব্যবসা, যুদ্ধ থেকে সরে আসতে গিয়েই প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির নিহত হওয়া। তা নিয়ে ছবি হয় ওই দেশে (জে.এফ.কে), সেই ছবিতে দেখি হত্যাকাণ্ডে প্রধান অভিযুক্ত এক অস্ত্র ব্যবসায়ী, এফ.বি.আই. এবং সি.আই.এ। এদের সঙ্গে অভিযুক্ত কেনেডি নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যিনি প্রেসিডেন্টের চেয়ারে গিয়ে বসেন, সেই লিন্ডন বি জনসনও। আমাদের দেশে এমন ছবি হতে পারে না। হলে সরকার এবং রাজনৈতিক দল তা একযোগে বন্ধ করে দিত। আমি আমার কথা বলি, তুমি তোমার কথায় তা খণ্ডন করো, তা হবে না, তোমার কথা পছন্দ না হলে তোমাকে, তোমার পরিবারকে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করব, দরকারে মেরেও দেব, যুক্তির বদলে বাহুবল আমাদের সম্বল। এক মাস কুড়ি দিন ধরে আমেরিকার নানা শহরে ঘুরেছি, উত্তরের মিশিগান থেকে পুবের শার্লট সিটি, আটলাণ্টা, পশ্চিমের লস এঞ্জেলস, সান দিয়েগো, থেকে পুবের নিউ ইয়র্ক সিটি, ওয়াশিংটন...। গিয়েছিলাম মিশিগান-- অ্যান আরবর শহরে প্রবাসের বাঙালিদের এক সাহিত্যোৎসব কথামালায়। কথামালা তিনদিন। তারপর দেশটাকে ঘুরে দেখা। কলম্বাস ১৪৯২-এ পা দিয়েছিলেন আটলান্টিক পার হয়ে যে ভূখণ্ডে তার বয়স কত, ৫০০ পেরিয়ে আর ২৬ বছর হয়েছে মাত্র। এই ভারত দেশটির সভ্যতা কত হাজার বছরের। তুলনাই হয় না। সে তো এক নতুন দেশ। যারা তার এখনকার অধিবাসী তারা এসেছে সাগর পেরিয়ে, আর যারা ছিল সেই পাহাড় আর জঙ্গল অধ্যুষিত তিন দিক সাগরে ঘেরা সেই প্রাচীন ভূখন্ডে, সেই সব মানুষ, উপজাতি রেড ইন্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন। কিন্তু নানা দেশের মানুষ, ইওরোপীয়, এশীয়, আফ্রিকার মানুষ, শ্বেতাঙ্গ, বাদামি চামড়ার মানুষ আর একদা শ্বেতাঙ্গদের দাস হয়ে আসা কালো মানুষে গড়া এই মস্ত দেশটি এমন আশ্চর্য সভ্যতার পত্তন করল কীভাবে তা দেখে বিস্ময় আর যায় না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আর সমাজকে যতটুকু আন্দাজ করা যায় ৫০ দিনে তার কথাই বলি। আমরা যখন হাজার হাজার বছরের সভ্যতা ত্যাগ করে ক্রমশ নানা অন্ধতার বিবরে প্রবেশ করছি, তখন দেখে এলাম মাত্র ৫০০ বছর পার করে আসা এক দেশ কীভাবে এক সভ্য সমাজ গড়ে তুলেছে সেই দেশে। এমন এক জীবনযাত্রার অভ্যাস গড়ে তুলেছে তা আমাদের ভাবনার অতীত। ছোট ছোট অভিজ্ঞতা এখন আমার কাছে মস্ত হয়ে উঠেছে। সেই কথাই বলি।

যাচ্ছিলাম উত্তর ক্যারোলাইনার শার্লট নগর থেকে ওয়াশিংটন হয়ে লস এঞ্জেলস। ছোটখাটো মানুষ, সামান্য ভারী ব্যাগটি এরোপ্লেনের সিটের মাথায় কেবিনে তুলতে একটু ডিঙি মারতে হয়, তাতেও খুব সুবিধে হয় না। যা হোক হয়ে যায় কোনো রকমে। আমার পাশে শ্বেতাঙ্গ স্বামী এবং বাদামি চামড়ার স্ত্রী, তাঁদের একজনের বয়স ৮০-র কাছে, অন্যজন ৭৫-হবেন। বৃদ্ধ সহযাত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক্যান আই হেল্প ইউ? তিনি তো আমার চেয়ে অন্তত বছর ১৫-র বড়। কী বলব। ততক্ষণে আমি নিজেই পেরেছি। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি কোথা থেকে আসছি, বলতে তিনি যে কলকাতা দ্যাখেননি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। বয়স হয়ে গেছে, কিন্তু ঘরে বসে কী করবেন, শীত

চলে গেছে, এখন বসন্ত, সামার এসে গেল বলে, বেরিয়ে পড়েছেন দুজনে। আমি ওয়াশিংটন থেকে লস এঞ্জেলস যাব, দুই উড়ানের সময়ের তফাৎ ৪৫ মিনিট, এক উড়ান থেকে নেমে আর এক উড়ান ধরতে হবে অন্য গেটে, কোথায় তা? জিজ্ঞেস করলাম এক তরুণকে। সে আমায় চমৎকার বুঝিয়ে দিল বোর্ডিং পাশ দেখে। তারপর হনহন করে ছুটতে লাগল প্রায়। তারও যেতে হবে অন্য এক উড়ান ধরতে। আমার জন্য কয়েক মিনিট সময় ব্যয় করল তবুও। আমি হাঁটলাম আমার পথে। মানুষগুলি এমন হলো কী করে? মধ্যবয়সিনী এক মহিলা স্বতোপ্রণোদিত হয়ে আমার ব্যাগ উড়ানের কেবিন থেকে নামিয়েও দেন। এমন অভ্যাস আমাদের নেই। মুম্বই বিমান বন্দরে সিকিউরিটিকে জিজ্ঞেস করলে সে কথা না বলে লাঠি দিয়ে দিক নির্দেশ করে। মুখ গম্ভীর করে থাকেন ভারতীয় সহযাত্রীরা। একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে পারেন, বা না পারেন। ওই দেশে মুখ গম্ভীর মানুষ কম দেখেছি। বিরক্তি প্রকাশ করা মানুষ কম দেখেছি। চেনা হোক, অচেনা হোক, মুখে হাসি, আপনার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে চলে যাবেন। এইটা অভ্যাস। এই অভ্যাসের সঙ্গে আরো অনেক অভ্যাস দেখেছি যা বিস্মিত করেছে। রেস্তোরাঁর মহিলা কর্মচারী আপনার জন্য খাদ্য নিয়ে এসে আপনার বান্ধবীর সঙ্গে সেলফি তুলে তার গালে চুমা দিতে পারে। সে কোন দেশ থেকে এসেছে, তার খোঁজ নেয়। সেই দেশটি কেমন তা জানতে চেষ্টা করে। বলে একবার সে তাজমহল দেখতে যাবে। তার যা মর্যাদা আপনারও সেই মর্যাদা। আমরা তো বাজারের সব্জিওয়ালা, দোকান কর্মচারী, রেস্তোরাঁর কর্মচারী, সকলকে তুইতোকারি করতে অভ্যস্ত। আর বাস কণ্ডাকটরকে তুইতোকারি করা এবং তাকে রাস্তায় ধরে পিটাবার বাসনা প্রকাশ আমাদের মনের ভিতরে সুপ্ত। বাস কেন ধীরে চলছে? মনে পড়ে আমার এক সহযাত্রী মোবাইল ফোনে তাঁর পুত্রকে নানা রকম সহবতের কথা বুঝিয়ে জল শেষ হয়ে যাওয়া প্লাস্টিক বোতলটি বাসের জানালা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিলেন। কোনোরকম বিকার নেই। অথচ ওই দেশটির চার বছরের শিশুও জানে চকোলেটের ফয়েলটি ট্রাসের জন্য রাখা বিনে ফেলতে হবে। সেই অভ্যাস বাড়ি থেকেই করে দেওয়া হয়। বাড়িতেও সে কাগজের টুকরোটি ট্রাস লেখা বিনে ফেলবে। এই অভ্যাসে শহর-জনপদে কুটোটিও পড়ে থাকতে দেখা যায় না। হাসপাতালের ভিতরে বা বাইরে মাইক অহরহ চলে আমার শহরে। রাজনৈতিক বক্তৃতা হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। লাউড স্পিকারের আওয়াজ কত ডেসিবেল তা মাপার উপায় নেই। বিধি নিষেধ ভাঙাতেই আমাদের ক্ষমতার সংস্কৃতি, ওদেশটি যেন শব্দহীন। হাইওয়ে হোক, শহরের ভিতরে হোক, অ্যাম্বুলেন্স ব্যতীত হর্ন বাজেই না গাড়ির। গাড়ির পর গাড়ি ছুটছে, হর্ন নেই। যে যার লেন ধরে ছুটছে ঘন্টায় ৬৫-৭০ মাইল গতিবেগে। কিছু পথ অন্তর হাইওয়ে পুলিশের গাড়ি। গতিবেগ বাড়ালেই ধরা পড়ে যাবে। পুলিশকে মান্য করা এঁদের অভ্যাস। পুলিশও তার পদ মর্যাদা রাখে মনে হয়। নীরবতার অভ্যাস কাফে-রেস্তোরাঁর ভিতরেও। পরস্পরে কথা হচ্ছে, কিন্তু সেই কথা অন্যকে শুনিয়ে নয়। রেস্তোরাঁ বা স্টোরে জিনিশ কিনছে অনেকজনে। কিন্তু আওয়াজ নেই। অভ্যাস। জিনিশের দাম দেবেন। যিনি কাউন্টারে তার সঙ্গে পরের ব্যক্তি আপনার তফাৎ পাঁচ-সাত হাত। তাতে কাজ হচ্ছে সুষ্ঠু ভাবে। কেউ কাউকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে না। পেছন থেকে আগে এসে দাঁড়াচ্ছে না। আপনি যখন কথা বলছেন বুক স্টোরের কর্মচারী মহিলার সঙ্গে আপনার কথার মাঝে আর একজন কথা বলছে না তার প্রয়োজন নিয়ে। আপনারটা শেষ হলে তাঁর কথা শুরু হবে। দেখুন ভেবে, আপনি পাড়ার দোকানে কিছুর খোঁজ করছেন, আপনার পরে আসা ব্যক্তির তর সইছে না, সে ক্রমাগত প্রশ্ন করে আপনার আগে তার প্রয়োজন মেটাতে চাইছে। এতে আপনার কাজ হচ্ছে না, তাঁরও না। সপরিবারে আপনি গেছেন সায়েন্স সিটিতে, বাচ্চাদের ডায়নোসর দেখাবেন, আপনি লাইনে আছেন টিকিটের জন্য, এক মহিলা কাউন্টারের মুখে এসে হাত বাড়ালেন টিকিটের জন্য। মহিলা বলে আগে নেবেন। তাঁর স্বামী কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে। চতুর স্বামী তার স্ত্রীকে পাঠিয়ে লাইনে না দাঁড়িয়ে আগে নেবেন। আমাদের অভ্যাস এমন, ওঁদের অভ্যাস পরপর নেবেন। অপেক্ষা করে নেবেন। শার্লট সিটিতে শার্লট সিম্ফনি অর্কেস্ট্রার অনুষ্ঠান দেখতে গেছি। মোজার্ট, বেটোফেন, চাইকোভস্কি বাজবে তার সঙ্গে ওয়াল্ট ডিজনির অ্যানিমেশন ফিল্ম। সঙ্গে চার বছরে শিশু দৌহিত্রী। তার জন্য

টিকিট কেনা হয়েছে। সিট দুই সারিতে, সামনে পিছনে দুটি করে। সামনের সারিতে কন্যা চকোরি আর দৌহিত্রী ঝিলমিল। পেছনে আমরা বাকি দুই, আমি ও মৈনাক। সামনের সারিতে বসা বৃদ্ধ বৃদ্ধা বুঝতে পেরেছেন আমরা এক পরিবার, কিন্তু আলাদা হয়ে গেছি। বৃদ্ধ ঘুরে পিছনে তাকিয়ে আমাদের প্রস্তাব দিলেন, আমরা দুজন তাঁদের সঙ্গে জায়গা বিনিময় করব কি না। করা হলো, তাঁরা হাসতে হাসতে পিছনের সারিতে চলে এলেন। অবাক হতে বাঁকি ছিল। শো আরম্ভের আগে হলের কর্মচারী কৃষ্ণাঙ্গিনী মেয়েটি এসে জিজ্ঞেস করল শিশু ঝিলমিলের জন্য বিশেষ সিট লাগবে কি না। সে সিটের উপর সিট চাপিয়ে দিয়ে গেল। ঝিলমিলের সুবিধে হলো। নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠান দেখল। আমরা ছেলেবেলায় বড়দের সিটে বসে থিয়েটার হোক সিনেমা হোক, কিছুটা দেখতাম, বাকিটা দেখতাম না। সামনের সারির দর্শকের মাথা সব আড়াল করে দিত। এই হলো সভ্যতা। সভ্যতা মানুষের অভ্যাস বদল করে দেয়। নিউ ইয়র্কে কুইন্স লাইব্রেরি দেখে অবাক। সারাদেশে অসংখ্য এমন লাইব্রেরি। অনেক ভাষার বই নিয়ে চুপচাপ হয়ে থাকা লাইব্রেরি। বাংলা বইও আছে তার ভিতরে। আছে ডিজিটাল বুক, আছে অডিও এবং ভিডিও বিভাগ। আছে শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। তাদের বই, তাদের কম্পিউটার। মায়েরা নিয়ে এসেছেন সন্তান। শিশুটি রঙ চিনছে, অক্ষর চিনছে, বই চিনছে। কুইনস লাইব্রেরি দেখে আমাদের শহরের অনেক লাইব্রেরির কথা মনে পড়ল। একটুও মেলে না। দুরবস্থার শেষ নেই। কত সব দুষ্প্রাপ্য বই অনাদরে অবহেলায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে স্বল্প আলোর নিচে। হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে পরপর নিষ্ক্রমণ এগজিট। এগজিট আপনাকে নিয়ে যাবে রেস্তোরাঁ, গ্যাস ষ্টেশন (পেট্রল পাম্প)-এর এলাকায়। সেখানে আপনার প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাবেন। সমস্ত গ্যাস ষ্টেশন, সমস্ত রেস্তোরাঁ, লাইব্রেরি, মিউজিয়ম, সমস্ত চেন স্টোর (যেমন ওয়ালমারট, পটেল ব্রাদার্স, ওল্ড নেভি…)-এ ব্যবস্থা আছে পরিচ্ছন্ন টয়লেটের। কত পরিচ্ছন্ন, না আমাদের বাড়ির টয়লেটও বোধ হয় অত পরিচ্ছন্ন নয়। ফ্রি টয়লেট। আপনি সেই দোকানে কিছু কিনলেন বা না কিনলেন, টয়লেট ব্যবহার করতে পারেন। সভ্যতা। হাইওয়ে ধরে যেতে যেতে দেখবেন রেস্ট এরিয়ার বোর্ড। এগজিট দিয়ে হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে দেখলাম সবুজ ঘাসে মোড়া উদ্যান। সেখানে ছোট ছোট ছায়া। বসার জায়গা। টয়লেট। সামান্য কেনাকাটার ব্যবস্থা। খাদ্য পাওয়া যায়। আপনি খাদ্য কিনে বা না কিনে, নিজের সঙ্গে আনা খাদ্য নিয়ে আরামে বসে খেয়ে নিতে পারেন রেস্ট এরিয়াতে। এমন কি খাদ্য গরম করার ব্যবস্থাও আছে সেখানে। সবই আপনার সুবিধের জন্য। ফ্রি ব্যবস্থা। রেস্ট এরিয়া মনোরম। ওয়াশিংটন যাওয়ার পথে আধ ঘন্টা সেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। এসব ওদেশের সামাজিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা যে কোনো নাগরিকের মর্যাদা বাড়ায়। আমার জন্য দেশের সরকার ভাবে। সব সুবিধে মন্ত্রী-আমলার করায়ত্ত নয় এদেশের মতো। নাগরিক হিশেবে আমাদের মর্যাদা প্রায়শই ক্ষুণ্ণ যে হয় তা কি টের পাই না? ওদেশে খাদ্যের গুণাগুণে ঘাটতি দেখা গেলে কে. এফ. সি. নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। খাদ্যের দাম কম এবং তা ভেজাল রহিত। ভাগাড়ের মাংস, এই অভিযোগ এলে সেই ব্যবসায়ী কারাগারেই বাকি জীবন কাটাত। এই যে অনেক ভালোর কথা বললাম, তা করেছে নানা দেশের মানুষ ওই দেশে গিয়ে। হ্যাঁ, এইটা সত্য যে দেশটা আমাদের দেশের পাঁচগুণ, কিন্তু মানুষ কম। আমাদের মতো জন সংখ্যার ভারে জর্জরিত নয়।

মহালয়ার ভোর

সেদিন অমাবস্যা। পিতৃপক্ষ শেষ হচ্ছে। পরদিন থেকে দেবীপক্ষ আরম্ভ। আমার বাবা ভাদ্রমাসের পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষ শুরু হলে পিতৃতর্পণ আরম্ভ করতেন। অমাবস্যার দিনে, মহালয়ার দিনে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সেই তর্পণ শেষ হতো। মহালয়ার সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটি সম্পর্ক রয়েছে। দেশভাগের পর এপারে এসে আমাদের পরিবার যে প্রথম মৃত্যুকে দ্যাখে, তা এই অমাবস্যা কিংবা চতুর্দশী ও অমাবস্যার সন্ধিক্ষণে। সেই রাত্রি ফুরোলে আমরা জি.ই.সি. রেডিওতে শুনব বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ এবং মহিষাসুরমর্দিনী কথিকা। দুর্গাপুজো যেন ঐদিন আরম্ভ হয়ে যেত। মাতলরে ভুবন...। সেই চতুর্দশী ও অমাবস্যার সন্ধিক্ষণে, দিবাবসানের সময়, গোধুলী বেলায় আমাদের পিতামহ অন্নদাচরণের জীবনদীপ নিবার্পিত হয়। তখন আমি খুব ছোট, দশের মতো বয়স। আমরা সকলে ঘিরে বসেছিলাম পিতামহকে। তাঁর দশটি নাতি, দশটি নাতনি। সকলে ছিল না। কনিষ্ঠ পুত্র তখনো পূর্ব পাকিস্তানে। আমি দেখেছিলাম কীভাবে প্রাণবায়ু অনন্তে মিশে যায়। শ্বাস নিতে নিতে আর পারলেন না তিনি। তাঁকে রাত্রেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইছামতীর তীরে বসিরহাট শ্মশানে। ইছামতীর ওপারেই, ন'দশ মাইল গেলে সাতক্ষীরে শহরের লাগোয়া আমাদের গ্রাম ধূলিহর। খুব কাছেই সেই দেশ অন্যদেশ। বাবারা দাহ করে ফিরেছিলেন ভোরবেলায়। তখন রেডিও থেকে বীরেন ভদ্র মশায়ের মেঘমন্দ্র কণ্ঠধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছে ভোরের বাতাসে। পিতৃহারা দুই পুত্র এসে বসলেন বারান্দায়। অন্য পুত্রটি তখন অন্য দেশে, জানেও না মহাগুরু পতন হয়ে গেছে তার অজান্তে।

আজও মহালয়া এলে সেই মৃত্যুর কথা মনে পড়ে আমার। সেই ভোর। গুরুদশা, হাতে কঞ্চি ও কম্বলের আসন, দুই ভাই বসে আছে বারান্দায়। গ্রামের অনেক মানুষ জন বসে আছে হেথাহোথা। মহালয়া এলে একটু মন খারাপ হয় সত্য। বাবা কাকারা কেউ নেই এখন। তাঁদের তর্পণ করা হয় এইদিন। আমি ভোরে বিছানায় শুয়ে সেই গোধুলীবেলার কথা ভাবি। বাবার সঙ্গে আমি কয়েকবার গঙ্গায় গিয়েছি। শেষে বাবা আর গঙ্গায় যেতেন না, বাড়িতে করতেন পিতৃপুরুষ স্মরণ। নিজে চণ্ডীপাঠ করতেন। বাবার প্রয়াণ হয়েছিল ভাদ্র সংক্রান্তির দিনে। তারপর আমরা তিন ভাই একসঙ্গে তর্পণ করেছি বেশ কয়েক বছর। হ্যাঁ, বাড়িতে। গঙ্গায় সেদিন বড় কলরব, হৈ হৈ। বাড়ি অনেক শান্ত। একবার মহলয়ার আগের দিনে আমি ছিলাম সিউড়িতে এক সাহিত্যের এক অনুষ্ঠানে। লেখক রমানাথ রায়, জয়ন্ত দে, অরিন্দম বসু ছিলেন। পরদিন ভোরে আমরা চললাম ময়ুরাক্ষী ব্যারেজে। ময়ুরাক্ষীতে পিতৃতর্পণ করব। ব্যারেজে যা হয়, একদিকে জল টলটল করছে, অন্যদিকে ধুধু বালুচর। কী অপরিসীম শূন্যতা! সেই ভোরে সেখানে মানুষজনও বিশেষ ছিল না। হয়তো নদীর অন্য কোথাও হয় তর্পণ। নিঃঝুম প্রকৃতিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছিলাম প্রিয়জন না থাকার বেদনাটি। বাবার আগে তাঁর দুই ভাই চলে গিয়েছিলেন। সকলের কথা মনে পড়ছিল আমার। খা খা বালুচরে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্ত পিতৃকুল, মাতৃকুল যেন জল চাইছিলেন। ধোঁয়া ধোঁয়া তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। আমরা সকলেই ব্যারেজের জলের কাছে গিয়ে সেই জল হাতে ছুঁয়ে স্মরণ করেছিলাম পরলোকবাসী আত্মজনদের। প্রয়াত বান্ধব, অবান্ধবদের। চেনা অচেনাদের। আমাদের শাস্ত্র বলি দর্শন বলি তা কবি-কল্পনায় পরিপূর্ণ। বিশ্বাস এই যে মহালয়ার দিনে প্রয়াত সকল মানুষের জীবাত্মা মর্ত্যে আসে তৃষিত হয়ে। তাদের জলদান করতে হয়। শুধু আত্মজন নন তাঁরা, অনাত্মীয়, অচেনা, অবান্ধব, সন্তানহীন আত্মারা আসেন জল গ্রহন করতে। ময়ুরাক্ষী ব্যারেজের যেদিকে জল, সেইদিকে গভীরতা অনেক বেশি। বিপজ্জনকও। স্নান করা হয়নি। কিন্তু জল দিয়েছিলাম তাঁদের। তাঁরা তা নিয়েছিলেনও জানি। আমি ফিরে আসতে আসতে দেখেছিলাম ধূ ধূ বালুচরে দাঁড়িয়ে আছেন, পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী, প্রপিতামহ...।

মহালয়ার পরদিন থেকে শুক্লপক্ষের শুরু। আমাদের উৎসব শুরু হয়ে যায় মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনিতে। বাণীকুমার প্রযোজিত আকাশবানীর ওই অনুষ্ঠান পুজোর অঙ্গ হয়ে গেছে বুঝি এখন। ঐ কণ্ঠই যেন ঘোষণা করে শারদোৎসব সমাগত। কতকাল ধরে, সেই বাল্যকাল থেকে শুনছি, কিন্তু এখনো যেন নতুন হয়েই আসে তা বৎসরান্তে। সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে সেই গান, "বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো রে ভুবন" ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তারপর বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে মহিষাসুর মর্দিনী। ঘুম আর তন্দ্রার ভিতরে কানে আসে সেই অমৃতবাণী। হ্যাঁ, আকাশবাণীর এখানে জিত। টেলিভিশন কিছুই করতে পারেনি মহিষাসুরমর্দিনী সাজিয়ে গুজিয়ে দেখিয়ে। এখানে যে কল্পনা আছে, টেলিভিশনে তা নেই। মুক্তা ফলের মতো নীলাভ ঊষাকালে সেই কল্পনাকে আর কিছুই ছাপিয়ে যেতে পারে না।

মহালয়ার দিন থেকে আর মন থাকে না কাজে। আর তো কয়েকটা দিন। মহালয়ার আর এক স্মৃতি আছে, সেবার পিতামহের অসুখের চিকিৎসার জন্য বাবার হাত খালি। পুজোর জামা প্যান্ট হয়নি। কাঁদছি। বাবা আমার মামিমার হাতে দশটি টাকা দিয়ে বললেন, শ্যামবাজারে গিয়ে কিনে দাও যা হয়। ফুটপাথের হকারের কাছ থেকে দশ টাকায় জামা, প্যান্ট, অলিম্পিক হাওয়াই...। আহা কী আনন্দ। সেই আনন্দ টিকিয়ে রেখেছি এখনো। মহালয়ার দিনে সেই সন্ধ্যার কথাও মনে পড়ে খুব।

বিশ্বচরাচরের আনন্দ

সারা বছর কায়ক্লেশে বেঁচে থাকি, উৎসব নিয়ে আসে তা থেকে মুক্তি। বাঙালির জীবনে বারো মাসে তের পার্বণ। এর ভিতরেই বড় উৎসব হিন্দুর দুর্গোৎসব আর মুসলমানের ইদুল ফিতর, খুশির ইদ,আর ক্রিস্টানের বড়দিন। তিন মহোউৎসব বাদ দিয়ে ধর্মীয় এবং লোকপুরাণের সঙ্গে যুক্ত আরো কত যে উৎসব, টুসু, ভাদু, নবান্ন থেকে নানা ব্রত, শবেবরাত, পীর-ফকিরের উরস সব। সমস্ত উৎসবই আনন্দের, সমস্ত উৎসবই আত্মীয় বান্ধব, অবান্ধবে মিলনের। দুর্গোৎসবের পশ্চাতে শরতের চালচিত্র, ভয়ানক গ্রীষ্ম আর তিন মাস বর্ষার পর শরত কাল আশ্বিন মাস আসে আনন্দের ধ্বজা উড়িয়ে। ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা, আকাশ নীল বরণ, তার ভিতরে পুঞ্জপুঞ্জ শাদা মেঘের ভেলা, নদীর তীর খোলা মাঠের ধারে কাশবন, পুজো আসছে। প্রকৃতির ভিতরেও মুক্তির আনন্দ। যদি শহর থেকে দূরে যান, ঢাকের শব্দ ভেসে আসবে। শারদোৎসব জানান দেয় ঢাকিরা। কত দূর থেকে ভেসে আসে ঢ্যাম কুড়কুড় কুড়, ঢাকের শব্দ। আমাদের এই উৎসবের সঙ্গে প্রকৃতির যোগ। প্রকৃতিই আনন্দ নিয়ে আসে, উৎসবে তা পূর্ণতা পায়।

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ,
আমরা বেঁধেছি শেফালিমালা,
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এস গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে।

মানুষের জীবন প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতি এই জীবন-জন্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। শরত এলে তা স্পষ্ট হয়। মনের ভিতরে নীলাকাশ, কাশের বন আর শেফালি ফুল ছায়া ফেলে। আনন্দের দিন এসেছে বলে প্রস্তুত হই আমরা। আমাদের পুরাণ, যা কি না শাস্ত্র বলে মানা হয় তা কবি কল্পনায় পূর্ণ। সেই পূর্ণতার ছায়া এসে পড়ে দৈননন্দিনতায় ক্লিষ্ট মানুষের জীবনে। শারদোৎসব যতটা না ধর্মীয়, ততটাই হয়ে উঠেছে লোক জীবনের। অন্তত এখন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারি পাওয়া জমিদার গৃহে দুর্গা পুজো মহারানি ভিক্টোরিয়ার বন্দনা কি না সেই কূট তর্কে না গিয়ে বলি সদর-মফস্বল এখন দুর্গোৎসবকে জনমানসের উৎসব করে তুলেছে। এমন আনন্দের উৎসব আর নেই। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে দুর্গোৎসবে নিজেকে সামিল করতে চায়। দেবীর চালচিত্র, দেবীর সঙ্গে দুই পুত্র দুই কন্যা, আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যে যে প্রাণী জড়িত তারা তাঁদের বাহন। মহিষ, ইঁদুর, হাঁস, পেঁচা তো এই বঙ্গ জীবনের সাথী। আর ময়ূর তো বাঁকুড়া পুরুলিয়ার জঙ্গলে দেখা যায়। ছেলেবেলায় পেটমোটা হাতির মাথা বসান গণেশ ঠাকুর ছিল সবচেয়ে আনন্দের। অতবড় গণেশ ঠাকুর, তার চেলা ঐটুকুনি মুষিক। এর চেয়ে বড় আনন্দের আর কী আছে। বাল্যকালে মা দুর্গা, লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ - সকলকে প্রথমে প্রণাম। তারপর রক্তাক্ত নিহত মহিষাসুরকে প্রণাম, তারপর সিংহ হয়ে পেঁচা, হাস, ময়ূর এবং ইঁদুর ঠাকুরকে। বিশ্বাস হতো না মহিষাসুর সত্যি সত্যি নিহত হতো। তাহলে পরের বছর কী করে আসেন? মা যেমন আসেন তাঁর সন্তানাদি নিয়ে, তেমনি আসেন মহিষাসুরকে নিয়েও। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। আমাদের এপারের গ্রামের নাম দণ্ডীরহাট। সেই গ্রামে ছেলেবেলা কেটেছে। পুজোর আনন্দ শুরু হতো সেই রথযাত্রার দিনে কাঠামো কাটা শুরু হতে। বসু জমিদার বাড়ির চন্ডী মন্ডপে ঠাকুর তৈরি আরম্ভ হতো সেই রথযাত্রার দিন থেকে। আমাদের ইস্কুলের পাশেই সেই চণ্ডীমণ্ডপ। প্রতিদিন ইস্কুলের ছুটির ঘন্টা পড়ে গেলে দেখতে যেতাম আনন্দের জন্য। কাটামোয় খড় বাঁধা হচ্ছে, আনন্দ। মৃৎ শিল্পীরা বসে গল্প করছে, আনন্দ। কাঠামোয় মাটি পড়ছে, আনন্দ। খড়ের কাঠামোয় দেখতে পাচ্ছি মায়ের আদল, আনন্দ। বর্ষাকাল চলছে, তার ভিতরেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে মা দুগগার পরিবার। সমস্তটাই আনন্দ। মৃৎশিল্পীরা যদি একবার

বলেন, খোকা ওটা দাও, এটা ধরো, জীবন ধন্য, আনন্দ। আমাদের সহপাঠী রমানাথ পণ করেছিল ঠাকুর গড়ার শিল্পী হবে। সে একবার, তখন ক্লাস সিক্স, সরস্বতী ঠাকুর গড়েছিল। মূর্তি যা গড়ার গড়েছিল, কিন্তু মুখখানি তো পারেনি, কেন না ছাঁচ কোথায় পাবে? থ্যাবড়া মতো হয়েছিল, মোঙ্গলয়েড মুখ, তাও নয়, শ্রীহীন, কিন্তু "নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা", সেই মূর্তিতেই কত আনন্দ। রমানাথ পরে এই লাইনে আসেনি। ঠিকেদার হয়ে প্রভূত আয় করেছে। ঠাকুর না গড়ে পুজোর প্যান্ডেল বানিয়েছে কি না আমি জানি না। যাই হোক, খুড়তুতো ভাই বোন মিলে দশ দশ কুড়িজন। তার ভিতরে বড়জন অধ্যাপনা করেন রানিগঞ্জে। আমরা তিনজন, পবন, ডাকু ও আমি কাছাকাছি বয়সের। আমাদের তিনজনের জন্য একই থান কেটে জামা, একই রকম হাফ প্যান্ট। ইউনিফর্ম। পুজোর আনন্দ নতুন জামা কাপড়ে।

আশ্বিনের মাঝামাঝি, উঠিল বাজনা বাজি
পুজোর সময় এল কাছে
মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই
আনন্দে দুহাত তুলি নাচে।
পিতা বসি ছিল দ্বারে, দুজনে সুধালো তারে,
'কী পোশাক আনিয়াছ কিনে'?...।

আমরা ভাই বোনেরা পুজোর আনন্দে বিধুই। কিন্তু মধুর মতো ফুলকাটা সাটিনের জামার বায়না করতাম না কেউ। যা পেয়েছি নতুন তাই ভাল। একবার, তখন আমি কলকাতায়। পিতামহর খুব অসুখ। পুজোর আগে জলের মতো টাকা গেছে বাবার। পুজোয় কিছুই হয়নি। চোখে জল। শেষ অবধি ফুটপাথ থেকে জামা, প্যান্ট আর রবারের হাওয়াই চটি কিনে দেওয়া হলো ষষ্ঠীর দিনে। দাম সর্ব মোট দশ টাকা। আমি গিয়েছিলাম সঙ্গে, মনে আছে তাই। কিন্তু তাতেই কী আনন্দ! উপরের বালক রেয়নের প্যান্ট পরেছে, টেরিলিনের শার্ট পরেছে, আমার সস্তার জামা প্যান্টের আনন্দ ম্লান হয়নি তাতে। বাল্যকালে খুব পছন্দের ছিল রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতা। আশ্বিনের মাঝামাঝি...। শেষ কয়টি পংক্তি এখনো মনে আছে,

আয় বিধু, আয় বুকে, চুমো খাই চাঁদ মুখে
তোর সাজ সবচেয়ে ভালো।
দরিদ্র ছেলের দেহে দরিদ্র বাপের স্নেহে
ছিটের জামাটি করে আলো।

পুজো আসে অনেকদিন ধরে। এই আনন্দের কোনো তুলনা হয় না। একদিনের দুদিনের বা চারদিনের নয় এই উৎসব। সেই রথযাত্রা থেকে আরম্ভ হয়ে বিজয়া দশমীতে শেষ। আনন্দ কেমন, না ইস্কুল চলছে, হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা চলছে, কিন্তু তার ভিতরেই দেবী গড়ে উঠছেন। একটু একটু করে আনন্দের দিন এগিয়ে আসে। মনে পড়ে দুর্গোৎসব একটা সময় ছিল সার্বিক আনন্দের উৎসব। কেমন তা বুঝিয়ে বলি। পুজোর গান আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সেই গানের অপরূপ লিরিক লিখতেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল দত্তরা, সুর দিতেন, গাইতেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। গাইতেন লতা, সন্ধ্যা, আরতি, প্রতিমা, বনশ্রী সেনগুপ্তরা। পুজোর গানে পুজোর আনন্দ। সলিল চৌধুরীর সুরে হেমন্ত গাইলেন 'পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি...।' মুকুল দত্তর লিরিকে হেমন্ত সুর দিলেন ও গাইলেন, তারপর? তার আর পর নেই নেই কোনো ঠিকানা...। বুক ভরে যায় এখনো। পুজোর গানে ছিল পুজোর আনন্দ। পুজোর সিনেমা। উত্তম মাধবী অভিনীত প্রেমের ছবি শঙ্খবেলা। 'চৌরঙ্গী' মুক্তি পেল পুজোয়। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' পুজোয়। দল বেঁধে চলো যাই গানে গানে ভরা বাংলা সিনেমা দেখতে। উত্তম, সৌমিত্রর ছবি মুক্তি পেয়েছে। আর তখন রঙ্গমঞ্চেরই বা কত প্রতাপ। পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ যেমন, গ্রুপ থিয়েটার তেমন। সত্তর বা একাত্তর সালে রঙ্গনা থিয়েটার তৈরি হলো। পুজোর সময় নান্দীকার নিয়ে এল ভালো মানুষ, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, শের আফগান...। পুজোর আনন্দ

নাটক দেখে। সপরিবারে দেখতে গেছি গিরিশ মঞ্চে, 'মাধব মালঞ্চী কন্যে।' এখন ছুটি থাকে সরকারি রঙ্গমঞ্চ। সুতরাং নাটক বন্ধ। বেসরকারি মঞ্চ প্রায় শেষ। পুজোয় এত বিকিকিনি, হল বন্ধ রেখে নাটক বন্ধ রেখে নাটকের কি ভালো হলো? আনন্দটা যে মুছে গেল।

বাল্যকালে ফিরি। পুজো বার্ষিকীতে পুজোর আনন্দ। ছোটদের বার্ষিকী একটা পেতাম। তার ভিতরে মা দুগ্‌গা তার ছেলেমেয়েকে পড়ে শোনাতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যর লেখা। পরে সত্যজিৎ হয়েছিলেন প্রথম পাঠ্য, তখন কিশোরবেলা শেষ। সে কী আনন্দ পুজো বার্ষিকী পেয়ে। হ্যাঁ, দেব সাহিত্য কুটির ছিল এই বার্ষিকীতে অগ্রগণ্য। এই আনন্দ এখনো আছে। এখন ছোটদের কত ভালো ভালো পুজো বার্ষিকী। বড়দেরও। লিটল ম্যাগাজিনও। ভাল মন্দ দুরকম লেখা আগেও থাকত, এখনো থাকে। কিন্তু এইটা সত্য পুজো সংখ্যার আনন্দ কম নয়। সবই কৈলাস থেকে দেবীর নাইওরে আসার সঙ্গেই জড়িত। নাইওর পূর্ববঙ্গের রীতি। বিবাহিতা কন্যার বৎসরান্তে বাপের বাড়ি আসাই নাইওর। শচীন দেববর্মণের সেই গান স্মরণ করুন।

"কে যাস রে ভাটির গাঙ বাইয়া
আমার ভাইধনরে কইয়ো নাইওর নিত কইলা...।"

গাঙের ধারে দাঁড়িয়ে গ্রাম বধূটি (যে মা দুগগাই) ডাকছে বয়ে যাওয়া নৌকার মাঝিকে। মা দুগগা তো সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়িই আসেন। সঙ্গে অসুর ঠাকুর। দেবীর আগমন একেবারে আমাদের জীবনের নানা অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে। এ বড় আনন্দের। এ বড় সুখের। সারা বছর কত কষ্টে যায়, কত উদ্বেগে যায়, এই পুজোর কটা দিন আনন্দের দিন। আমাদের বাল্যকালে রেশন না তুলে উপায় ছিল না। লাইন দিতে হতো চাল, গম, চিনি কিনতে। পুজোর সপ্তাহে বরাদ্দ ডবল। তাতেই আনন্দ। চাল চিনি আক্রা। ১৯৬৫-৬৬-র কথা বলছি। খাদ্যের খুব অভাব হয়েছিল তখন। তবু পুজোয় ডবল চাল, চিনি, গম। সঙ্গে সুজি। তাতেই ভাল মন্দ রান্না করতেন সব সংসারের মা দুগ্‌গা। যার যেমন সাধ্য। সেই আনন্দ এখনো আছে। হত দরিদ্র ঘরেও ভাল মন্দ পাতে পরিবেশন করতে চান মা অন্নপূর্ণা। পুজোর আনন্দ এই। আরো আনন্দের ভিতরে পুজোয় সকলের হাতে কিছু অতিরিক্ত আসে। হ্যাঁ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান - সকলের হাতে। পোশাক শিল্প এই সময় ফুলে ফেঁপে ওঠে, বড় কোম্পানি, বড় পোশাকের মল থেকে হাওড়া হাট, হরি সা হাটের হকার নৈমুদ্দিন আর নেপেন মণ্ডলও বেচা-কেনা করে অনেক লাভ করে। সব কিছু কেনা-বেচা হয় পুজোর কত আগে থেকে। সবাই প্রস্তুত হয় তার জন্য। কয়েক দশক আগেও পাড়ার দর্জিদের খুব দাম ছিল। ছোট ছোট পুঁজির দর্জি, তিন মাস আগে থেকে অর্ডার ধরত। অষ্টমী এমন কী নবমীতেও জামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবী, ফ্রক ডেলিভারি দিত ছোট ছোট খদ্দেরকে। এখন তারা বিলুপ্ত প্রাণী। রেডিমেডের বাজার। তারা বড় বড় কারখানা করে নির্মাণ করছে বিপুল পরিমাণ পোশাক। সেখানে যারা সেলাই মেসিনের সামনে বসে আছে, তারা কর্মচারী। স্বাধীন ব্যবসায়ী নয়। পুজোর এই আনন্দ চলে গেছে। প্যাণ্ট বা শার্ট তৈরি করতে দিয়ে ট্রায়াল দেওয়াতেও সেই কিশোর কিংবা যুবকের আনন্দ ছিল, পুজোর আনন্দ নতুন জামায়। পুজোয় সবই নতুন। পুজো মানে নতুনের আনন্দ। পুজা বার্ষিকী প্রকাশের জন্য এই সময় ছাপাখানা, বাঁধাইখানায় খুব চাপ। এই সময় উপার্জন হয় অনেক। পুরনো পাওনা মেটাতে হয় প্রকাশককে। বাঁধাইখানার একটি বালককে দেখেছি কদিন আগে, বছর দশ। উদলা গা। বালকটি বই বাঁধাইখানার ভয়ানক গুমোটে সমস্তদিন মেসিনের চাকা ঘুরোচ্ছে বা ভাঁজ করা বইয়ের ফর্মা সাজাচ্ছে। সে পত্রিকার বান্ডিল কচি মাথায় বয়ে পত্রিকা অফিসে এল। কিছু পাবে। তিন বার এসে দশ টাকা তার অতিরিক্ত আয়। কী আনন্দময় হয়ে উঠল তার মুখখানি। সে তো মা অন্নপূর্ণার সন্তান। তার আনন্দে বিশ্বচরাচর হেসে উঠবে। পুজোর আনন্দ সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হোক। আর অতিরিক্ত বৈভব আর উল্লাস প্রদর্শন না করে দরিদ্র, নাচার মানুষকেও এই আনন্দের ভাগ দিন সদর মফস্বলের পুজো কমিটি।

জলের মতো স্বচ্ছ জলের মতো সরল নয় জল

জল আর জলপাই, খাসা জল, তোফা জল, মামাবাড়ি ঘুমড়ির জল, কলের জল, নদীর জল, ঝর্নার জল, পুকুরের জল, কুয়োর জল...। সুকুমার রায়ের অবাক জলপান নাটকে যে জলের লিস্টি আছে, বিষ্টির জল, ডাবের জল, নাকের জল, চোখের জল, জিভের জল, হুকোর জল... তালিকার শেষ নেই। জলের মতো স্বচ্ছ, জলের মতো সরল, সোজা কিন্তু নয় জল। জলই তো জীবন। জলের অভাব না হলে জীবনের এই চিহ্নটিকে বুঝবে কে? জলে না ডুবলে জলের অন্ধকার টের পাবে কে? বন্যায় না ভাসলে, জল যে কতখানি মৃত্যু বয়ে আনে তাই বা টের পাবে কে? এই খর রৌদ্রের দিনে, পুবের গাঁ থেকে পশ্চিমে হেঁটে এলে তেষ্টায় ছাতি ফাটবে যখন, জলের অপর নামটি মনে করাবে কে?

নদীর ধারে বাস, দুঃখ বারোমাস। নদী মানে জল। বছর বছর বন্যায় দুঃখের অন্ত থাকে না। ঝড়-বাদলায় জমির ধান-পান সব শেষ হয়ে যেত। হ্যাঁ, এখনো তা হয়, সুন্দরবনের নদী বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম ভেসে যায়, ফসলের জমি নষ্ট হয়ে যায় নোনা জলে। তো নদী আর জলের এই কথা আমি মায়ের কাছে শুনতাম। মায়ের বাপের বাড়ি জলের ধারে, কপোতাক্ষ নদের কুলে। সেই জলের ধার থেকে নির্বাসিত হলেন রাধারানি উত্তর কলকাতার টালার জলাধারের প্রায় কোলেই বলা যায়। ২৪ ঘন্টা জল। তার আগে যে বেলেঘাটায় থাকা হতো, সেই ১৯৫১-৫২-র সময়, সেখানে খুব জলের কষ্ট ছিল, জল নিয়ে কাড়াকাড়ি হতো। টালা-বেলগাছিয়ায় এসে সেই কষ্ট গেল। শতাব্দী প্রাচীন জলাধার, যেন একখন্ড গভীর কালো মেঘ ভেসে আছে পশ্চিমে। সেই মেঘ সব সময়ই জল দেয়। আমাদের উত্তর কলকাতায় এখন জলের তেমন অভাব ঘটে না। যদি বা ঘটে আমাদের এই মেঘপুঞ্জ ধারণ করা জলাধারের এলাকায় ঘটেই না। শোনা যায় টালার ভূগর্ভ-জলাধার উঁচু ট্যাঙ্ক নির্মাণের জমি পাইকপাড়ার রাজা দিয়েছিলেন কলকাতা পুরসভাকে বিনা মূল্যে। শর্ত ছিল এলাকার মানুষের জন্য ২৪ ঘন্টা জল। ২৪ ঘন্টা জল এখনো থাকে, কিন্তু তার সেই উচ্চ চাপ কমেছে। এখন এই জল বিধান নগরে যায়, নিউ টাউনে যাচ্ছে শীঘ্রই। কলকাতা বদলেছে অনেক। বহুতলের পেটের ভিতরে এখন অনেক মানুষ, সুতরাং জল চাই জল। আমাদের গৃহ পরিচারিকা রুকসানা মাসি বলছিলেন, এই গরমে তাঁদের বস্তিতে বেলা বারোটা অবধি জল থাকে তারপর জল আসে সেই রাত আটটায়। কত মানুষ বস্তিতে! জল নিয়ে চুলোচুলি হয় অবিরাম। বস্তিবাসির জল বারো ঘর এক উঠোন, কমন বাথরুমের মতো। মহল্লার মাঝে জলের কল। সেখানে ভোর থেকে কলসি, বালতির লাইন। কলকাতা থেকে ২০০ কি.মি. দূরে বাঁকুড়ার শালতোড়ায় এমন দৃশ্য এই গ্রীষ্মের দিনে কত দেখেছে টালা জলাধারের নিকট-বসতির এই ভাগ্যবান। তবে হ্যাঁ, রমজান মাসে কলকাতার পুরসভা রুকসানা মাসিদের মহল্লায় জল দেয় বারে বারে, তাও সত্য।

আমাদের এই শহর থেকে পঞ্চাশ কি.মি. গেলে সমুদ্রের মুখ, মোহনা। জলের অভাব নেই গঙ্গা থাকতে। নদীই তো নগর গড়ে তুলেছে বাণিজ্যতরী বয়ে এনে। কলকাতার জন্য উত্তর ২৪ পরগণার পলতায় যে জলের প্রকল্প আছে সেখানে দৈনিক ২৬০০ লক্ষ গ্যালন জল তুলে পরিশুদ্ধ করে পাইপ লাইনে টালায় পাঠানো হয়। আর কলকাতার নানা রাস্তায় কিছু গঙ্গাজলের লাইন আছে। অবিরাম ঘোলাটে জল পড়ে যায়। সেই অপরিশুদ্ধ জলে নগরের প্রান্তবাসীরা স্নান করেন। সারাদিন ভার বয়ে সন্ধে বেলায় সস্তার সাবান মেখে যে স্নান, তার সুখ কত তা সেই মানুষটির মুখের দেহাতি গান শুনলেই টের পাওয়া যায়।

সারাদিন জল। গ্রীষ্মে সেই জলে কিঞ্চিৎ ক্লোরিন মেশান হতো। গন্ধ পেতাম। বাল্যকালে শুনতাম কলিকাতার কলের জলে গাত্র বর্ণ উজ্জ্বল হয়। আমাদের একটা বাড়ি আছে বসিরহাটের লাগোয়া দন্ডীরহাটে। খুড়তুতো দিদিরা কলকাতার বেলগাছিয়ায় এসে টালার জলে উজ্জ্বল শ্যাম কিংবা গৌরী হয়ে

উঠত। ৫০-৫৫ বছর আগের কথা বলছি। তখন গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করার এত প্রসাধন সামগ্রী আসেনি বাঙালি জীবনে। তবে একটা কথা তো সত্য, গাঁয়ের পুকুরে দাপানো আর ঘাটলায় রোদের নিচে বসে গল্পগুজবে, দুপুরে আম কুড়িয়ে সেই কন্যা কীভাবে গৌরী হয়ে ওঠে? কলিকাতায় বদ্ধ ফ্ল্যাটে গায়ে রোদ না লাগিয়ে ফ্যাকাশে ইটচাপা ঘাসের মতো হয়ে যেতে তো বাধা নেই। অবশ্য এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে, কলিকাতার কলের জল অতি মধুর। কলিকাতার কলের জলে কাঁচা হলুদ মেশানো, হিমানী স্নো, সুরভিত অ্যান্টি সেপ্টিক ক্রিম জড়ানো ছিল সেই ৫০ বছর আগে। অঘ্রানে তার বিয়ে, ভাদ্র থেকে সে টালা-বেলগাছিয়ার বাসা বাড়িতে রয়েছে, কেন মেয়েটি ফর্শা হবে না সেই জল গায়ে মেখে? আমার এই শহর গঙ্গার পূর্বকুলে। আমাদের সব নদীই গঙ্গা। গঙ্গার জল ব্যতীত কোনো পুজোপাঠ, পুণ্যকর্ম সম্পন্ন হয় না। মায়ের দরকার হতো গঙ্গাজল। একটি পেতলের ঘটিতে তা ভরা থাকত। সেই জল নিয়ে আসত কে, না বিহারের মধুবনি জেলা থেকে কলকাতায় কাঁসার বাসন ফেরি করা এক ব্যক্তি। সে থাকত গঙ্গার কাছে। পনের দিন অন্তর গঙ্গাজলের কলসি মাথায় নিয়ে আসত বাসনের সঙ্গে। মা একা নন, পাড়ার অনেক বাড়িতেই গঙ্গাজল পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তার। মা চলে গেলেন, তারপরও সে আসত। গঙ্গাজল আর দরকার হয় না, সে দশটি টাকা নিয়ে যেত জলের জন্য মা তাকে যা দিতেন। অনেকদিন সেই লোকটি আর আসে না। কী হলো তার? তার নির্মল জলের মতো হাসি আর কথায় তো অন্তরের তৃষ্ণা মিটত। গঙ্গা থেকে দূরে সরে গেছি আমরা। আর কলিকাতার কলের জলে গৌরী হতে বাসাবাড়িতে গাঁয়ের মেয়েটি আর আসে না। বিজ্ঞাপিত প্রসাধন সামগ্রী পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত গ্রাম দেশেও, স্নান আর পানীয় জল না থাক, কসমেটিক্স আছে। আর আছে জলের বোতল।

হ্যাঁ, টালা-বেলগাছিয়ায় এত সুখের ভিতরে বিপদ ছিল অন্য। বর্ষায় ইন্দ্র বিশ্বাস রোড একটি বেসিন। এই অঞ্চলে জল সরত না দিনের পর দিন। অতি বৃষ্টিতে জল ঢুকে পড়ত একতলার ফ্ল্যাটের ভিতর। মনে আছে সন্ধে থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হলো, ক্রমশ তার বেগ বাড়তে লাগল, মাঝরাতে মা ডেকে তুললেন, জল ঢুকছে। মা শাঁখ বাজাতে আরম্ভ করলেন। এই রীতি নদীর ধারের মানুষের বহুদিনের অভ্যাস। মধ্য রাতে বানের সাড়া পেলে গ্রাম জাগিয়ে তোলা। শাঁখ বাজিয়ে সতর্ক করে দেওয়া নদীর ধারের মানুষকে। এখন সেই ভয় গেছে। জল আর জমেও না সেই রাস্তায়, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে জল ঢোকে না। বস্তিবাসীকে উদ্ধার করে ইস্কুলবাড়িতে নিয়ে যেতে হয় না। খোদ কলকাতা শহরে যে কত বন্যা দেখেছি। সন তারিখ স্পষ্ট মনে আছে, ১৯৮৫ সালের ৫ এবং ৬-ই মে, আচমকা বৃষ্টি নামল, ৪৮ ঘন্টা এক নাগাড়ে। জল ঢুকল ঘরের ভিতর। জলের সঙ্গে ব্যাঙ, আরো কত কিছু...। তখন অতি বৃষ্টিতে উত্তর শহরতলীর বাঙ্গুর, লেকটাউনের একতলা বাড়ির অর্ধেকের বেশি জমা জলে ডুবে থাকত। কলকাতা শহরের ঠনঠনে কালীবাড়ির সমুখের বিধান সরণি, রামমোহন সরণি জমা জলের জন্য কুখ্যাতি পেয়েছিল কম না। রামমোহন সরণিতে নৌকোও নেমেছে কতবার। এখন সেই চিত্র বদলেছে। ১৯৭৮-এ বন্যার্ত হয়েই কবি নীরেন্দ্রনাথের কবিতা 'হ্যালো দমদম'।

আমার হাতের মধ্যে টেলিফোন;
আমার পায়ের কাছে খেলা করছে
সূর্যমণি মাছেরা।
পিচ-বাঁধানো সড়কের উপর দিয়ে
নৌকো চালিয়ে আমি
পৃথিবীর তিন-ভাগ জল থেকে এক-ভাগ ডাঙায় যাব।
সেই নৌকোর জন্যে আমি বসে আছি;
আর, পাঁচ মিনিট পরপর
ডায়াল ঘুরিয়ে চিৎকার করছি:

হ্যালো দমদম…হ্যালো দমদম…হ্যালো…
… … …
আমার জুঁইলতা এখন
পাঁচ ফুট জলের তলায় ফুল ফোটাচ্ছে।

১৯৭৮-এর বন্যায় শহর কলকাতার রাস্তায় কোমর সমান জল, সেই জলে পা হড়কে ডুবে মারা গেলেন একজন। জলের ভয়ানক চেহারা দেখেছি ১৯৭৮-সালের বন্যায়। প্লাবন। একের পর এক নদী, সুবর্ণরেখা, ডুলুং, কংসাবতী, শিলাবতী, কেলেঘাই, হলদি নদী, রূপনারায়ণ, দামোদর, উঠে আসছে স্থলভূমিতে। জল দখল করে নিয়েছিল সভ্যতা। দুর্গাপুর ব্যারেজে ধরেছিল ফাটল। আমি তখন মেদিনীপুরে। বন্যার পরে বাড়ি ফিরেছিলাম তিন মাস বাদে। ১৯৬৮ সালে তিস্তার জল প্রবেশ করেছিল জলপাইগুড়ি শহরে। সেই বন্যার কথা কত শুনেছি। তিস্তার বাঁধ সেই কারণে দেওয়া। নদীবাঁধ নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে ব্যহত করে। তিস্তার জল নিয়ে বাংলা দেশের ক্ষোভ, ওদেশে এই নদী শুকিয়ে শুধুই বালুচর। দেখেছি তা। একই অভিযোগ ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে, চিন বাঁধ দিয়েছে তার উজানে। আমাদের এদিকে জল আসছে কম। গঙ্গার জল ক্যানেল কেটে চুরি করে তুলে নিচ্ছে উজানের মানুষ, আমরা জল পাচ্ছি কম। আবার ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ কম নয়। শুখা সিজিনে জল চাই, বর্ষায় জল দিলে বন্যায় ভাসে দেশ। দামোদর ব্যারেজের ছাড়া জলে প্রতি বছর হুগলি হাওড়া ভাসে। অসম্পূর্ণ নির্মাণই তার কারণ। আর জল নিয়ে দাঙ্গাও দেখেছি। চাষের সিজিনে জমিতে জল পাঠান নিয়ে তা হয়। বড় বড় দিঘিতে জলের ভাগ নিয়ে লাঠালাঠিও দেখেছি কত। ভাগ কত, এক পয়সা, দু পয়সা, এক গণ্ডা দুই গণ্ডা, এক কড়া দুই কড়া… মোট ভাগ এক টাকা বা ষোল আনা হলে এই রকম হয় এক এক শরিকের অংশ।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলি জলাভাবে মরে যাচ্ছে। আমাদের বেতনা, কপোতাক্ষ নদ তো বালুচর মাত্র। তিস্তা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের কথা তো বলেইছি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার কত নদী যে মরে গেছে হিসেব নেই। আর আমরাও শেষ করছি যত জলের সূত্র। পুকুর, দিঘি বুঁজিয়ে জল মেরে দিয়ে অগ্নিকুন্ডের ভিতর বসিয়ে দিচ্ছি সভ্যতাকে। আমাদের জল আছে, তা শেষ করে দিচ্ছি। যাদের জল নেই, মরুদেশে, রাজস্থানে, দশ মাইল হেঁটে জল মাথায় করে ফেরে বাড়ির মেয়েরা। স্বাধীনতার ৭২ বছর বাদেও শুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি আমরা। নেতা মন্ত্রীদের তা জানা নেই। হ্যাঁ, জল নেই বটে, শীতল পানীয় আছে গঞ্জে গঞ্জে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের পশ্চিম প্রান্তে সুবর্ণরেখার কুলের এক গ্রামে তখন ছিল বাস। সেই ১৯৭৬ হবে। গ্রীষ্মের দিনে জল কই? কুয়োর জল তলানিতে। জঙ্গল থেকে একটি ঝোরা নেমে এসে চলে গিয়েছিল নদীর দিকে, সেই ঝোরার বালি খুঁড়ে যে জল উঠত তা ছেঁকে নিয়ে কলসে ভরা হতো। সেই জলই ছিল পানীয় জল। স্নানের জল সেই বালি খুঁড়ে তৈরি করা বড় বড় খোদল, চুইয়ে চুইয়ে যে জল জমত সেখানে তা দিয়েই অবগাহন। সেই জল হতো স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ। গরমের দিনে খুব ঠান্ডা। বংশীধরপুরের কথা এখনো মনে পড়ে, জলের অভাব কি মিটেছে সেখানে? মানুষের চাওয়া কত সামান্য যে তা গ্রামদেশে না ঘুরলে বুঝব না। অন্ন, একখানি বস্ত্র, আর জল। বিশুদ্ধ জল। জঙ্গল মহল যে তিন জেলায়, সেই জেলার গ্রামদেশে জলের জন্য হাহাকার দেখেছি কম না। জলের সূত্র তো পাতাল। কুয়ো আর জঙ্গলের ঝোরা, ঝর্না, জোড়-এসব শুকোতে থাকে মাঘ মাস থেকে। ফাল্গুনের পর কুয়োর জল তলানিতে গিয়ে পৌঁছয়। একদিন বালতি নামল নিচে, ঠং করে আওয়াজ হলো। ভয় পেল বউটি। জল ফুরিয়ে এল! একদিন জলের সঙ্গে বালি, মানে জল শুকিয়ে এল। হায়! সামনে কী দিন অপেক্ষা করে আছে!

শালতোড়া ব্লক বাঁকুড়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। পাহাড়ি জনপদ। কিছু গেরস্তর বাড়ির কুয়ো বাদ দিয়ে জনসাধারণের জন্য বড় একটিই কুয়ো চড়াই থেকে নেমে রাস্তার ঢালে। শেষ রাত থেকে সেখানে বালতির পর বালতির লাইন। তখন জল আছে। আর কদিন বাদে সারাদিন বালি ওঠে জলের সঙ্গে। ভোরে, কত

ভোরে যেতে পারে মানুষ জল তুলতে তার প্রতিযোগিতা চলে যেন। সারারাত চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে জল উঠে আসে কুয়োর তলদেশে তা থাকে স্বচ্ছ। সেই জলটুকুর জন্যই শেষ রাতে ছোটা। আমি টালার জলাধারের পাশে বড় হয়েছি, জলের কষ্ট পাইনি কখনো। বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের পশ্চিমভাগে দীর্ঘদিন বসবাসে বুঝেছি জলের জন্য হাহাকার কী? জলের কত দাম। জল ফুরিয়ে আসে, গঞ্জের হোটেল বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ মেঘ আর বৃষ্টির জন্য আকাশে তাকিয়েই থাকে। ২৪ প্রহর হরিনাম আরম্ভ হয়। হরিনামে আকাশের দেবতা সন্তুষ্ট হবেন। জল নামবে আকাশ থেকে। খরা এবং বন্যা, দুই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গেই জলের সম্বন্ধ। বন্যা আসে জানান দিয়ে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি বন্যা নিয়ে আসে। আর খরা আসে একটু একটু করে। জানান দেয় না। নিঃশব্দ চরণে আসে সে। মানুষ একদিন টের পায় বহুদিন আকাশে মেঘ আসেনি, বৃষ্টি নেই বহুদিন। সব শুখা হয়ে যাচ্ছে। জলের অভাবে মানুষের মাথা বিগড়ে যায়। একটা লোকের সঙ্গে বেলিয়াতোড়ে দেখা হয়েছিল, বিকেলের দিকে আমাকে এসে বলে, 'আকাশটা দেখুন, আগুনে তেতে বেঁকে গেছে কেমন, জল না নামলে আর উপায় নাই'। আমি বৈশাখ, জৈষ্ঠের আকাশ দেখি। হ্যাঁ, তাই। তালগাছের মতো লোকটা যা বলছে, তাই। জল না নামলে উপায় নাই। এস মেঘ এস।

বসন্তের নতুন রং

বসন্ত কোথায়? শীত এল কি এল না, শহরে গাঁয়ে গঞ্জে বসন্ত এসে গেছে বলে রব উঠতে উঠতে মিলিয়ে গেল। বসন্ত আসতে না আসতে গ্রীষ্মের হুহু আগুনে বাতাস বইতে শুরু করেছে। এতদিন জেনেছিলাম বসন্তের সময় জ্ঞান তীব্র প্রখর। প্রকৃতিতে না এলেও মনের ভিতরে সে গুণগুণ করে ঘোর শীতের ভিতরেও। এবছর চলছে ঋতু সংহার। শীত তো এল এল করে চলিয়া গেল অকালে প্রায়। বসন্ত মুখ লুকিয়েছে গ্রীষ্মের তেজময় বাতাসের ভিতরে। আমরা অবাক হয়ে আছি, জীবন থেকে একটি অম্লানকুসুম ম্লান হয়ে ঝরে গেল। বসন্ত মুখ দেখাতে না দেখাতে মিলিয়ে গেল।

আসলে আমাদের এই দেশে শীতের তেমন কামড় আর কই? আমাদের পথ ও প্রান্তর কি তুষারাবৃত হয়ে ঢেকে থাকে, যেমন থাকে শীতপ্রধান দেশে? পুশকিন, তলস্তয়ের উপন্যাসে পড়েছি যে অনন্য শীতের বিবরণ, তা আমাদের দেশে বিরল। সিনেমায় ইউরোপের যে শীত দেখেছি, সেই শীতকাল এক অবরুদ্ধ জীবনের কাল। সৈয়দ মুজতবা আলির দেশে বিদেশের সেই কিশোরটির কথা মনে পড়ে সে দুমাস শীতের জন্য রসদ সংগ্রহ করে ঘরে ঢুকে পড়ে ফায়ার প্লেসে আগুন দিয়ে কাচে ঢাকা জানালার ধারে বসে অবিরাম তুষারপাত দেখে যায়। উত্তর গোলার্ধে, পশ্চিমে শীত বড় কঠিন সময়। ফলে বসন্তের প্রার্থনা থাকে অন্তরজুড়ে। শীতে তুষারাচ্ছন্ন প্রকৃতি, মানুষ প্রায় গৃহবন্দী। সূর্যের উত্তরায়ণের কাল শুরু হয় বড়দিনের সময়, আমাদের পৌষের দিন দশ গেলে। সূর্যরশ্মি ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে নেমে আসতে থাকে। শীতে জমে থাকা তুষার গলতে শুরু করে ফেব্রুয়ারি থেকে। গলা-বরফ ফুঁড়ে সবুজ তৃণের মুখ দেখা যায়। সেই হলো বসন্তের আগমন। বরফ গলে নতুন তৃণে আচ্ছাদিত মাঠ-পাথার মুখ দেখালে ধরা যায় বসন্ত আসিল প্রাণে আর মনে। আমাদের দেশে তেমন শীত কই কাশ্মীর আর লাদাখ ব্যতীত। সে তো এই সাধারণ মানুষের মনে রাশিয়া আর হাঙ্গেরির শীত ব্যতীত কাছের কিছু নয়, ফলে বসন্ত আমাদের তেমন নেই। তলস্তয়ের রেজারেকশন উপন্যাসে সাইবেরিয়ার পথে অপরাধী মেয়েটিকে নিয়ে যখন প্রশাসনের কনভয় যাত্রা করে শীতের শেষে, বসন্তের আরম্ভে, অনুতাপে জর্জরিত কাউন্ট সেই কনভয়কে অনুসরণ করে সাইবেরিয়ায় আত্মনির্বাসনের পথে যাত্রা করে। চারিদিকে বসন্তের আগমনের চিহ্ন সব। দীর্ঘ অবরুদ্ধতা ভেঙে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের শীত অবরুদ্ধতার নয়। আমাদের শীতকাল রৌদ্রালোকিত, উপভোগের। ফলে বসন্ত শুধু তাপমাত্রার হেরফেরে ধরা যায়। কিন্তু সেই বসন্ত এবার উধাও। এবার শীত সেভাবে নিজের দাপট দেখাতে পারেনি তার কালে, পৌষ-মাঘে। আর বসন্তেই এসে গেল গ্রীষ্মের উত্তাপ। কেন?

নিউইয়র্কবাসী বন্ধু ফেসবুকে জানালেন, না, এবার ওদেশেও শীত আসেনি রে রে করে। এল নিনোর প্রভাবে সমগ্র বিশ্বেই এমন। এল নিনো সামুদ্রিক ঘূর্ণাবর্ত। উষ্ণ জলস্রোতের যাতায়াতে সামুদ্রিক সেই ঘূর্ণাবর্ত ক'বছর অন্তরই সক্রিয় হয়ে প্রকৃতির রূপ আর রঙে থাবা বসাচ্ছে। আমাদের নিজস্ব আয়োজনও তাই ব্যর্থ হয়ে গেল এবার বুঝি। শীতকাল পত্র ঝরণের কাল। বসন্ত নতুন পাতা নিয়ে আসে। তা এসেছে নিশ্চয় বনে বনে। কিন্তু বাতাস অগ্নিময়। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ফাল্গুন এসেছে সবে, তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এমন যে হয় না স্বাভাবিক ভাবে। বসন্ত উধাও। অথচ শহর ছাড়িয়ে দূরে গেলে সেই গরম বাতাসে আমের মুকুলের অদ্ভুত সুবাস, এই মুখ লুকোনো বসন্ত বলে দিচ্ছে এবার আম হবে ভালো। আবার খনার বচন বলে দেয়, আমে ধান। এবার ধানও হবে ভাল। ফাল্গুনের দশদিনের মাথায় আকাশে মেঘ। বৃষ্টি হয়ে গেল মেঘ গুড়গুড় করে। খনার বচনে বলে, যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। মানে সেই একই, ফসল হবে ভাল। এই সময়ে বৃষ্টি হলে, মাটি নরম হয়, কৃষকে একবার হল কর্ষণে নামে। তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বসন্ত উধাও হয়েও আছে সে মনে, তাই এত কথা। এল নিনো তো শুধু সামুদ্রিক ঘূর্ণাবর্ত নয়, এল নিনো

সামাজিক ঘূর্ণাবর্তও। এই বসন্ত এসেছে দমন পীড়ন আর ক্ষোভের উত্তাপ নিয়ে। বসন্ত তো যৌবনের কাল। নতুন জন্মের কাল। সেই কালে নেমে আসছে শাসকের প্রাচীন অন্ধকার। বুড়ো পাখির খসিয়ে দেওয়া পালক ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। আমরা এই বসন্তে ভাল নেই। হ্যাঁ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, পলাশের আগুন তো আছেই। সেই আগুন আর রং ছড়িয়ে গেছে ভাবুক নতুন প্রজন্মের নিকট। তাদের স্পষ্ট কথায় তপ্ত হয়েছে প্রাচীন প্রজন্ম। কিন্তু আমি শুনছি বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। এই বসন্ত এসেছে যে প্রেমের উত্তাপ নিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে দেশবাসীর ভিতরে। এবার ইন্টারনেটের ভুবনডাঙায় তেমন চিহ্ন নেই বসন্তের। রক্তপলাশ, শিমুল, মাদার, কাঞ্চন থেকে কৃষ্ণচূড়া রাধা চূড়া, নিমফুল, আম্রমুকুলে রঙে রঙে ছেয়ে যায়নি কম্পিউটারের মনিটর। বদলে মুখর হয়েছে তা নানা কণ্ঠের নানা মতে। সেও তো বসন্তেরই চিহ্ন। রঙের বদলে এসেছে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষের ছবি। মিছিলের ছবি। "আমাকে বলতে দাও", মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উঠেছে আকাশে। আমাকে যদি না বলতে দাও, তবে কেন আমার জীবনে এই বসন্ত এল। এল নিনো এসেছে সত্যি আমাদের সমাজে। তাই সবদিক অশান্ত, কেউ ওদের কথা শুনতে চায় না। দমন পীড়নে বসন্তের অবসান ঘটে না। প্রকৃতিই নিয়ে আসে নতুন ঋতু। বছর ঘুরে আবার বসন্ত আসবে, বনে বনে ফুল ফুটবে। আমার সন্তান মুখর হবে নতুন কথা নিয়ে। ওরা বলবে, আমাদের শুনতেই হবে। প্রহরী আর কোটাল ওদের মুখের ভাষা বন্ধ করতে পারবে না। দেশটা আমাদের চেয়ে ওদের বেশি। ওরা অনেকদিন বাঁচবে।

বসন্তের দেরি হয় না। কোনোদিন কোনো বছর সে দেরি করে না। ৩৬ নম্বরের কুসুমের যেমন, টালা পার্ক এভিনিউ-এর ফুটপাথবাসিনী দামিনীরও জীবনে বসন্ত আসতে দেরি করেনি। কিন্তু দামিনীর ক্ষেত্রে তা হয়েছে বিড়ম্বনাময়। বসন্তের ডাকে রাতবিরেতে ধাড়ি শেয়ালে ঘুরঘুর করে ঝুপড়ির ধারে। সে তো বেওয়ারিশ এক বুনো হংসী। নখের ধার আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে আর কত বাঁচাবে নিজেকে। কম্পিউটারের মনিটরে খুনখারাপি রং ছিটকে পড়েছে। তখন সে বসন্ত দিনে শীতের প্রার্থনা করে।

ওই যে গগনবাবু বসে আছেন তিন-রুম ফ্ল্যাটের বড় এক ব্যালকনিতে, একা, সম্পূর্ণ একা এক সত্তুরে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদখোর বুড়ো, ছেলে বিলেতে থাকে, মিসেস চলে গেছেন আচমকা, সন্ধের উতলা বাতাস দিয়েছে তাঁরে ঘ্রাণ, বসন্ত এসে গেছে। সেই যে পেয়েছেন তিনি বাতাসে তাহারই ঘ্রাণ, নিজেই ফেসবুকের দরজা খুলে ডেকেছেন সেই কুসুমকে, বসন্ত এসে গেছে। ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের কুসুম আর ৩৬ নম্বরের অদিতি তো এক নয়। গগন কুণ্ডু আর জীবন মিত্রও তাই এক নয়। মোবাইল থেকে ছবি উগরে দেয় যেমন কুসুম, তেমনি তিনি উগরে দেন ওই ইন্টারনেট থেকে খুঁজে পেতে নিয়ে। কেউ বলে ফাল্গুন কেউ বলে পলাশের মাস... গুনগুন করতে করতে গগন কুণ্ডু নেট সার্চ করে কত ছবি, ফাগুনের আগুন ডাউনলোড করে কুসুমকে উপহার দেন, এই দ্যাখো বসন্ত এসে গেছে। এই গান শুনেছ তুমি কুসুম? কোন গান গো? বনে বনে পাপিয়া বোওলে... কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরে অলি কুসুমে, নীল নলিনী দোলে...। ওয়া, এই গান যে আমাদের উপরের ফ্ল্যাটের গগন দাদাই চালিয়েছিল সেদিন। তুমি জানলে কী করে?

বসন্ত এসে গেছে, তাই জেনেছি গো। বলে গগন বললেন, তোমার একটা ছবি দেবে?

এই বসন্ত নগরের। আর সেই বসন্ত গঞ্জে গঞ্জে, নপাহাড়ি, সাতপাহাড়ি, সাতশো পাহাড়ে সাতশো ফুলের দেশে। সেই গঞ্জ, সেই পাহাড়তলি, সেই প্রান্তর এখন পলাশের আগুনে জ্বলছে দাউ দাউ। এখনো রাতে শীত শীতে ভাব, দিনে মাটি থেকে গরম নিঃশ্বাস উঠছে। সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়ে গেছে, পাতা ঝরে গেছে বনে বনে। জঙ্গল অনেক ফাঁকা। এরই ভিতরে ফাল্গুণী পূর্ণিমা এল। দু-পক্ষ বাদে চৈত্র পূর্ণিমা। তখন বসন্ত পুড়ে জ্বলে খাঁক হয়ে যাবে। দূর উজ্জয়িনীতে চৈত্র পূর্ণিমায় কামদেবের পূজা। ফুলদোল ছিল একদিন। এখন নেই। ভার্চুয়াল জগতে তা আছে। যা কিছু মুছে যাবে তা থেকে যাবে অনস্তিত্বের এই আন্তর্জালের পৃথিবীতে।

গরুর রচনা

গরুর রচনা। গরুর চোনা নয়। তা ভাল না মন্দ এ নিয়ে কত কথা আছে। গরুর রচনার চেয়ে দেশপ্রেম কিংবা বড় হয়ে তুমি কী হতে চাও লিখতে সুবিধে হতো। বড় হয়ে আমি "দেশপ্রেমিক" হব এই রচনা লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিল আমার খুড়তুতো ভাইয়ের মাসতুতো ভাই মহেশ। মহেশ একটি গরুর নাম। আবার মহেশ মাসতুতো ভাইয়ের নাম। সুতরাং মহেশ নামের এই মানুষটি একটি গরু। গো মাতা নয় গো পিতা। বলদ। সেই বলদে দেশপ্রেম নিয়ে লিখে ২০-র ভিতরে কুড়িই পেয়েছিল শোনা যায়। আমার খুড়তুতো ভাই গণেশ বলে, বরং ২০-র চেয়ে বেশি পাওয়াও অসম্ভব ছিল না। এই কালে পরীক্ষায় যেমন মাইনাস নম্বর দেওয়া হয়, প্লাস দেওয়া চালু করলে কুড়িতে মহেশ পঁচিশই পেত। আমি লিখলে আমিও পেতাম। আমি কাত্তিক গরুর রচনার বদলে আমি দেশপ্রেম লিখতাম না হয়। দেশ অনেক বড়। দেশ আমার দেশ। গরুও অনেক বড়। গরু আমার গরু। গবাদি পশু খুবই মূল্যবান। পুরাকালে দেশ জয় করে সৈনিকরা সোনাদানা রমণী এবং গবাদিপশু লুণ্ঠন করত। সেই লুণ্ঠন বন্ধ করতে দেশপ্রেমিক হওয়া জরুরি। সুতরাং গরুর রচনা লিখতে গিয়ে যদি দেশপ্রেম নিয়ে লেখা হয়, তা ভুল তো হবে না, বরং তাইই সমীচিন হবে। দেশ লুণ্ঠন এবং গবাদি পশু লুণ্ঠন একই ঘটনার দুই রূপ। গো-রক্ষাই দেশ-রক্ষা। দেশ রক্ষাই গো রক্ষা। আসুন গরুর কথা বলি গরুর রচনার মাধ্যমে। গরু নিয়ে যেমন মহেশ গল্পের কথা জানি। গরু নিয়ে আর এক গল্প জানি, 'হাজরা নস্করের যাত্রা সঙ্গী' (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়)। হাজরা চাষা মানুষ। গরু কিনে গো-হাট থেকে ফিরছে। রাতে গরুর সঙ্গে রুটি ভাগ করে খাচ্ছে। গরু আর মানুষ এক সঙ্গে বসবাস করে একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারে। সুখ দুঃখও। গরু চিরকালই ভাল যাত্রাসঙ্গী। যাই হোক গরুর রচনা লিখতে গিয়ে অন্য কথা না বলে গরুর কথা বলি।

গরু এক অবোধ প্রাণী। মানুষের ভিতরেও অবোধ মানুষ আছে। তাঁকে আদর করে 'গরু' বলা হয়। যেমন মহেশ আর গণেশ। আমার খুড়তুতো ভাই এবং তার মাসতুতো ভাই। এবং আমি কাত্তিক। আমিও এক অবোধ মানুষ। সাতও জানি না, পাঁচও জানি না। গরুর চারটি পা। চতুষ্পদ প্রাণী। চতুষ্পদ নিয়ে গরু চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর আর পুবে বঙ্গোপসাগর... উত্তর পুবে আসাম নাগাল্যাণ্ড... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই আমাদের দেশ। এই আমাদের শুরু ও শেষ। যেমন এই আমাদের শাড়ি, এই আমাদের নারী। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা, মুম্বই থেকে গুয়াহাটি, এই ভারত আমার দেশ। গরু এই চারদিকে চতুষ্পদ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। গরু দুধ দেয়। দুধ আমাদের পুষ্টি দেয়। পুষ্টির কথা শুনলে আমার মনে পড়ে ফষ্টির কথা। ফষ্টির কথা শুনলে নষ্টির কথা। কী থেকে কিসে যাচ্ছি? যাচ্ছি তো যাচ্ছি। গরু ঘাস খায়। নদীতীরে সবুজ ঘাসের জমি। নদীর নাম মালিনী। মালিনী নদীর কূলে কন্বমুণির আশ্রম। সেই আশ্রমে উর্বশী মেনকা এবং বিশ্বামিত্রর গর্ভজাত কন্যা শকুন্তলা বড় হয়ে উঠছিল। বেতস লতার মতো তার দেহ বল্লরী। এই সময় দেশের রাজা দুষ্মন্ত শিকারে বেরিয়েছিলেন। একটি হরিণ শিশুর পিছু পিছু দৌড়ে তিনি এসে পৌঁছলেন কন্বমুণির আশ্রমে। যুবতী শকুন্তলাকে দেখে মোহিত হলেন। দেশের রাজা বলে কথা। আশ্রম কন্যাকে প্রলুব্ধ করে নির্জনে নিয়ে গিয়ে ভোগ করলেন। অভিজ্ঞান দিয়ে গেলেন। অভিজ্ঞান আংটি যেমন হতে পারে, অভিজ্ঞান হতে পারে অঙ্গে অঙ্গে নখের দাগ। দাঁত আর নখের দাগ অভিজ্ঞান নিয়ে গৃহে ফেরে বন কন্যা শকুন্তলা, এক আদিবাসী যুবতী। বনে গিয়েছিল পাতা কুড়োতে, ঝাঁটি কাঠ সংগ্রহে। বন তাদের পেটের ভাত দেয়। সালোয়া জুড়ুম, দেশপ্রেমিক গ্রাম-রক্ষী বাহিনীর লোক শকুন্তলাকে ভোগ করে অভিজ্ঞান দিয়ে চলে গেছে। মালিনী নদীর তীরের বনভূমিতে এমন হয়ে থাকে। দুষ্মন্তরা এখন এমন করে থাকেন।

লিখছিলাম গরুর রচনা। হয়ে গেল দুষ্মন্ত আর শকুন্তলার গল্প। গরুর দুইটি কান, মাঝে মাঝে নাড়ায়। লেজ দিয়ে মশা মাছি পোকা-মাকড় তাড়ায়। হাম্বা রব দিয়ে গো-শাবক গো-মাতাকে ডাকে। সেই ডাক গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে শোনা যায় গ্রামের বাতাসে। অন্তত আমি তো শুনেছি। তৃষ্ণার্ত গো-শাবক, বাছুরের মুখে তখন কাকিমা জলের বালতি ধরতেন। আমাদের বাড়িতে কালো গরু ছিল। অঘ্রান মাসভর তার পরিচর্যা করত মা-কাকিরা। সকালে খুরে আর শিঙে তেল মাখাত। গলায় জবাফুলের মালা পরাত। গরু আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজে গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে এক নম্বর। সেই সমাজ ধীরে ধীরে বদলে গেছে। গরুর গাড়ি এক সময়ে ছিল অন্যতম যান। গাড়োয়ানের গাড়ি টানে গরু। এ দেশে পাতাল রেল, রাজধানী এক্সপ্রেসের সঙ্গে গরুর গাড়ি আছে। বিশ্বের সব চেয়ে শ্লথ গতির যান। আবার নিরাপদ যানও বটে। বাসে ট্রামে যাওয়া আসা করলে হামেশাই তো শুনতে পাই কন্ডাকটর, ড্রাইভারকে সুসভ্য নাগরিক তিরস্কার করছেন, যা গরুর গাড়িতে কন্ডাকটরি করগে যা, ড্রাইভার না গরুর গাড়ির গাড়োয়ান! গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হওয়ার চেয়ে অসম্মান আর নেই যেন। একটা নাটক বহুদিন চলেছিল, গরুর গাড়ির হেড লাইট। মোটা দাগের হাসির নাটক। গরুর গাড়ি রাতে চলে না। খুব দরকারে চললে নিচে লন্ঠন ঝুলত। মানুষের ইতিহাসে যানবাহন যতো গতিশীল হয়েছে গরুর গাড়ি ততো ব্যাঙ্গ বিদ্রুপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি শেষ গরুর গাড়ি যাত্রা করেছিলাম ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে। পশ্চিম মেদিনীপুরের (তখন অখণ্ড মেদিনীপুর) গোপীবল্লভপুরের বর্গীডাঙা থেকে প্রায় মাইল কুড়ি পশ্চিমে বংশীধরপুর গ্রামের উদ্দেশে। সঙ্গে বিছানাপত্র আর সুটকেস। আহা শীতের দিনে রোদ পোয়াতে পোয়াতে ঘন্টা চারের যাত্রা। কম বেশি হতে পারে। গাড়োয়ান ছিলেন বছর ৩৫-এর অতীব বলশালী আদিবাসী পুরুষ। গায়ে আলোয়ান সামনে বসে দুই বলদকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছে উদ্দিষ্ট পথে। সেই পথ মোরামের। চড়াই উৎরাই ছিল পথে। টিলার গা দিয়ে, অরণ্যের ধার দিয়ে সেই যাত্রা। দু চোখ ভরে প্রকৃতিকে দেখা। সমুখে বহুদূরে সিংভূমের পাহাড় দেখা যাচ্ছে। গাড়োয়ান তার জিভ আলটাকরায় ছুঁইয়ে বিচিত্র ধ্বনিতে গরুকে নির্দেশ দিচ্ছিল। দুই বলদ আমাদের নিয়ে যেন অগস্ত্য যাত্রা করেছিল। মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পৌঁছতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। এতটা পথ এক সঙ্গে আসায় গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাব হয়েছিল খুব। রাতে সে থেকে গেল গাড়ি আর গরু নিয়ে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নদীর ধারে বাড়ি গল্পে যে পরিবারটি কলকাতা ছেড়ে এক নদীর ধারে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেছিল বনগাঁ রাণাঘাট লাইনের গাংনা পুর স্টেশনে নেমে, দুপুরে যাত্রা করে অপরাহ্নে তারা পৌঁছেছিল নতুন বসতিতে। গাড়োয়ান বলছে, ওই দেখা যায় বটতলা, তারপর আর বেশি নয়। ছইয়ের ভিতর থেকে পিছনে তাকিয়ে শ্যামলী গ্রাম দেখতে দেখতে চলে। সমরেশ বসুর পাপ পুণ্য গল্পে গরুর গাড়ি করে যাচ্ছে গলায় দড়ি দেওয়া মেয়ের লাশ থানার দিকে। তার পিছু পিছু যাচ্ছে অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকা পিতা। সেই যাত্রা ছিল ভয়ানক। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উড়ো চিঠি গল্পে গরুর গাড়ি নিয়ে সা-জোয়ান ছেলেরা বেরোবে মনস্থ করে, হারিয়ে যাওয়া মামোদ আলিকে তারা খুঁজে আনবে খড্ডা থেকে। কিন্তু খড্ডা কোথায় তাই জানা নেই কারো। হাসান আজিজুল হকের উপন্যাস সাবিত্রী উপাখ্যান-এ গরুর গাড়িতে করে ধর্ষিতা গ্রাম বধুকে নিয়ে রাঢ়ের অনন্ত প্রসারিত মাঠ পরিক্রমার এক অসামান্য বিবরণ আছে। আমি খুব ছেলেবেলায় ‘কোন এক সিনেমা দেখেছিলাম মায়ের কোলে বসে। সুচিত্রা সেন চলে যাচ্ছেন ছই দেওয়া গরুর গাড়ি চেপে অজানায়। ব্যাক গ্রাউন্ডে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান, “ওই রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায়রে...।”

গরুর গাড়িতে গরু জুততে সাধারণত জোয়াল ব্যবহার করা হয়, ঘোড়ার গাড়ির মতো লাগাম থাকে না। গাড়ির চাকাগুলি হয় বড় বড়, সাধারণত কাঠের তৈরি। তবে এখন তাতে লোহার রিং ব্যবহার করা হয়। সম্পূর্ণ লোহার তৈরি চাকার ব্যবহারও খুব বিরল নয়। উনিশ শতকের বিভিন্ন বিদেশী উপন্যাসেও যাতায়াত ও মালবহনের উপায় হিসেবে গরুর গাড়ির উল্লেখ দেখতে পাই। এইচ.রাইডার হ্যাগার্ড'এর বিখ্যাত উপন্যাস কিং সলোমনস মাইনস'এর কথা বলা যায়। ওই উপন্যাসেই রাত্রিতে বিশ্রাম নেওয়ার সময় বা বিপদে পড়লে

অভিযাত্রীরা প্রায়শই গরুর গাড়িগুলোকে গোল করে সাজিয়ে একধরণের দুর্গ গড়ে তুলে তার মধ্যবর্তী জায়গায় আশ্রয় নিত। গরুর বা ঘোড়ার গাড়িকে ব্যবহার করে এইধরণের দুর্গ গড়ে তোলার রেওয়াজ অবশ্য সেকালে প্রচলিত ছিল। চেঙ্গিজ খানের নাতি বাতু খানের নেতৃত্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে যে মোঙ্গল আক্রমণ চলে সেখানে তার প্রতিরোধে স্থানীয় অধিবাসীরা গরুর গাড়িকেই এই ভাবে ব্যবহার করেছিল।

সাতক্ষীরার অদূরে ধূলিহর ছিল আমাদের ওপার বাংলার ভিটে বাড়ি। আমাদের নিজেদের গরুর গাড়ি ছিল বোধহয়, কিন্তু তা ক্ষেতের ফসল, বিশেষত অঘ্রান মাসে ধান নিয়ে আসার জন্য ব্যবহার করা হতো। ফসলের ক্ষেতে চাকার দাগ— লিক, পড়ে থাকত বহুদিন। স্বাধীনতার বছর দশের পরের কথা বলছি। আর কোথাও যেতে হলে, মাইল তিন দূরে সাতক্ষীরে, কিংবা ফিংড়ি, কুকরুলি গ্রামে বা ভোমরা বর্ডারে যেতে হলে সক্কালে গরুর গাড়ি হাজির। গাড়োয়ান খড় বিচুলি খাইয়ে নিত গরুকে। ছই দেওয়া গাড়ির বাঁশের চটার পাটাতনে খড় বিছিয়ে তার উপর চাদর দিয়ে বেশ আরামের বসার জায়গা। গাড়ি চলল দুলতে দুলতে। গাড়োয়ান নুর আলি কথা বলছে ঠাকুমার সঙ্গে। কতরকম কথা যে। দেশভাগের তেমন আঁচ আমাদের সাতক্ষীরেতে তখন ছিল না। এপার-ওপার যাতায়াত চলত। এপারে আমরা বসিরহাট সংলগ্ন গ্রামে বসতি করেছি। বর্ডারে আসতে গরুর গাড়ি কিংবা সাতক্ষীরে অবধি গরুর গাড়িতে এসে মোটরগাড়ি।

মনে আছে গ্রীষ্মে কাঁসাই এর বালুকাচ্ছন্ন বুক পার হয়ে গাড়ি উঠবে বাঁধে। বলদ দুটি টানতে পারছে না। উপরে উঠতে গিয়ে বসে পড়ছে বার বার। গাড়িতে অনেক ধানের বস্তা। ভার কম নয়। গাড়োয়ান টানছে গাড়ি জোয়ালে কাঁধ দিয়ে। মনে পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে দুই বলদ। গাড়োয়ান থামাতে পারছে না। পথে ফণা তোলা বিষধর দেখেছিল তারা। গরুর গাড়ির গতি দেখেছিলাম সেদিন। গাড়োয়ান অসহায়। আবার দেখেছি ধীর গতিতে নববিবাহের পর কন্যা চলেছে শ্বশুরবাড়ি। ছইয়ের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে জলভরা চোখে সে দেখছে চারদিকের মাঠ আর গ্রাম-পৃথিবী। বরই গাড়োয়ান। সে বরবেশে বসে আছে গাড়োয়ানের জায়গায়। গরুকেও সাজিয়েছে সে ফুলের মালা দিয়ে। আহা এমন দৃশ্য জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।

গরুর গাড়ির ইতিহাস যুগ যুগান্তের। নতুনপ্রস্তর যুগের সময় থেকেই মানুষ এই যানটি ব্যবহার করে আসছে। আল্পস পর্বতের উপত্যকায় গুহাচিত্র পাওয়া গেছে গরুর গাড়ির। গুহাচিত্র থেকে জানা যায়, যে খ্রিস্টের জন্মের ৩১০০ বছর আগে ব্রোঞ্জ যুগেও গরুর গাড়ির অস্তিত্ব ছিল। হরপ্পা সভ্যতাতেও যে গরুর গাড়ির অস্তিত্ব ছিল তার সপক্ষে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, খ্রিস্টজন্মের ১৬০০ থেকে ১৫০০ বছর আগেই সিন্ধু অববাহিকা ও ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল, যা সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণেও ছড়িয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, এও সত্য, বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে মানব সভ্যতার আদ্যিকালের এই যান। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গায়কের গানের অংশ শোনাই,

গরু মইষের গাড়ি নাই
গাড়ির উপুরা ছই নাই
ছইয়ের তলোত কইনা নাই
সেই গাড়ির গাড়িয়াল নাইরে
আজি গাড়িয়াল বন্ধু হারেয়া গেইছে রে।

গাড়িয়াল, গাড়োয়ান হারিয়ে গিয়ে মানুষের গানই শেষ হয়ে গেছে।

এই দেখুন গরুর রচনা লিখতে গিয়ে গরুর গাড়ি নিয়ে কত কথা বলে ফেললাম। গরুর রচনা এমনি। গরুকে ফেলে তা যাত্রা করে অন্যদিকে। অন্য কারো উদ্দেশে।

বেচতে বেচতে নতুন বছর

পত্র ঝরণের কাল শেষ। কচি পাতা জেগেছে সোনামুখীর শালবনে। শুকনো পাতার স্তূপে আগুন লাগিয়ে জীর্ণ পুরাতন সব ত্যাগ করে নতুন পাতায় সেজে উঠছে শালবন। এখন বনাঞ্চল ফাঁকা ফাঁকা। বহুদূর পযর্ন্ত দেখা যায়। অপারেশন গ্রিন হান্ট এই সময়ে হয়েছিল। বনে কারো লুকিয়ে থাকার উপায় নেই। এই সময়ে আদিবাসীরা শিকারে যায়। অবশ্য শিকারের আছেই বা কী? মেঠো খরগোস, শজারু...এই সব। শীতকাল চলে গেছে। বসন্তও যায় যায়। চৈত্রের দুপুরে ডাক উঠেছে, ও বাবা, ভোলানাথের চরণেই সেবা লাগি, মোয়াদেব! আরে যে লোকগুলোকে আমরা সবদিন দেখি এমনি এমনি। মধুদা রিকশা চালায়, সাধনদার চাল ব্যবসা, গোরাদা ফুটবল খেলে ভালো, তারাই সব বদলে গেছে, পালটে গেছে। গাজনের সন্ন্যাসী হয়েছে। এদের সঙ্গে জুটেছে লালু কাওরা। কাহার। সে খেতে পায় না এমনিতেই। সড়কি নিয়ে কচ্ছপ খুঁজে বেড়ায়। ঘরামির কাজ করে, মাটি কোপায়। কিন্তু তাতে সংসার চলে না। পেটপুরে খাওয়াও হয় না। এই এক মাস গেরুয়া ধরে সন্ন্যাসী হয়ে তার ভাত জোটে, ফলমূল জোটে। গাজনের সন্ন্যাসীদের দিতে কার্পণ্য করে না গেরস্ত। কিন্তু তা গাঁয়ে। আমাদের সেই ছেলেবেলায়। অবাক হয়ে দেখতাম এই কদিন আগে যে লোকটি তাস পেটাচ্ছিল বাজারে বকুল গাছের গোড়ায়, বাঁধানো চাতালে, সে গেরুয়া ধরে মহাদেবের চরণে সেবা লাগি বলে বেড়াচ্ছে। মধুদা রিকশাওয়ালা কিন্তু গেরুয়া পরেই সওয়ারি নিয়ে চলেছে আমতলা থেকে নলকোঁড়া। মাঝে মাঝে হাঁক মারছে' 'মোয়াদেবের সেবা লাগি...'। চৈত্র শেষে গাজন। সে এক মস্ত হৈ হৈ। বান ফোঁড়া, খেজুর গাছ মোড়া, উপর থেকে ঝাঁপ, সে কত কী! শিব মন্দিরে এয়োতির লাইন। মহাদেবের মাথায় দুধ ঢালতে কে আর আসেনি। যার স্বামী একটা বিধবা মেয়েছেলের জন্য হাটখোলা থেকে আর বাড়িই ফেরে না সব দিন, সেও এসেছে শিবের লিঙ্গমূর্তিতে দুধ ঢালতে। লোকটা যে সব টাকা সেই বিধবার কাছেই ঢেলে দিচ্ছে, হে মহাদেব, নতুন বছরে কী হবে? সব মনে পড়ে যায় সকাল বেলায় ড্যাডাং ড্যাডাং কাঁসর বাজিয়ে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীদের ফ্ল্যাটের দুয়ারে এসে দাঁড়াতে দেখে। হাতে সরা। তার ভিতরে একটি জবা ফুল। সন্ন্যাসীর হাতে শিবলিঙ্গের ছবি, দিতে হবে কিছু। মেলে না। মনে পড়ে যায় লিঙ্গ বর্ধক জাপানি যন্ত্রের কথা। বিধবার পায়ে হাটখোলার গণেশদা সব দিয়ে দিল জাপানি তেল মেখে। বসন্ত কাল যে। সব্বোনেশে চৈত। সবটা ঘেটে দিয়ে যাচ্ছে এই সব চিনে জাপানি কোম্পানি। আমাদের ভোলানাথের আর মান থাকল না গো। হ্যাঁ, চৈত্র বড় সবর্নেশে। দুপুরভর এপাশ ওপাশ করে এবাড়ির সে আর ওবাড়ির ও। দুপুর আগুন হয়েছে। গা হাত পা আগুন হয়েছে। মনও। অনুরোধের আসর তো উঠে গেছে। মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে... কেউ বলে ফাল্গুন কেউ বলে কুসুমের মাস...।

সব আমাদের সেই বাল্যকালের কথা। এই কালে সেই রামও নেই, রাবনও নেই। কিন্তু সীতাহরণ আছে। টেলিভিশন দেখে স্বামীর ঘর থেকে ফিরে আসা তপুদির কি আর সেই কল্পনার দুয়ার খুলতে পারে? সেই সময়ে তা হতো। রেডিওর এরিয়ালের তারে কাকেদের সভা বসত বেলা পড়ে এলে। এ বাড়ির কুমু, সারা দুপুর আগানে বাগানে ঘুরে বেড়ায়, সাপের শঙ্খ লাগা দেখেছে সে চৈত্রের ঘোর রৌদ্রের ভিতর আরো অনেকের সঙ্গে। কচি আমের খোসা ঝিনুকে ছাড়িয়ে কুচি কুচি করে লঙ্কা আর নুনে জারিয়ে খেতে খেতে তপুদি কুমুর কাছে শোনে সাপের শঙ্খ লাগার কথা। ইস, তাকে ডাকেনি কেন কুমু। নতুন বস্ত্র ফেলে দিত। তার উপরে উঠে যেত যদি সাপ সাপিনী, সেই কাপড় নিয়ে সব কাজে জয় হয়। তপুদির স্বামী পারবে, পারবে। পুরুষ মানুষ পারবে না কেন? সাপের শঙ্খ লাগা কাপড় পেতে শোবে তারা।

হ্যাঁ, সেই চৈত্র এসে চলে যাচ্ছে। এই শহর তো সেই চৈত্র জানে না। চৈত্রের ড্যাডাম ড্যাডাম ভেসে আসবে নতুন ওঠা গরম বাতাসে, তা শোনেনি এই শহর। এ শুধু জানে চৈত্র সেলের কথা। সেল যেন নতুন

নিয়ে এসে পুরোনোকে বিদায়ের অভিনয়। সেল সেল সেল। শ্যামবাজার থেকে হাতিবাগান, দুপাশের ফুটপাথ, রাস্তার ধার দখল হয়ে গেছে চৈত্র সেলে। কিছুই না। বাজার তোলা, উপলক্ষ করে কিছু বেচা কেনা করে নেওয়া। হকারে কলকাতা শহর ছেয়ে গেছে। চৈত্র সেলের সঙ্গে আমাদের যৌবনও সেলে এসে গেছে। সস্তায় যৌবনকাল বেচা হয়ে যাচ্ছে যেন, পুরোন জামা কাপড়ের সঙ্গে তারাও নেমেছে নিজেদের বিকিয়ে দিতে। সেই সব ছেলেরা, ২০, ২২, ২৪ যখন চিৎকার করতে থাকে সেল সেল সেল... তারপর বুড়ো হয়ে যায় অকালে, বৈশাখ আসে না আর। চৈত্র প্রলম্বিত হতে থাকে। কত বছর ধরে এই শহরে চৈত্র সেল চলছে ফুটপাথে, তার হিসেব কে রাখে। দর কষাকষি চলতেই থাকে। পাঁচশো টাকা দাম বললে, আপনাকে পঞ্চাশ বলে আরম্ভ করতে হবে। তারপর চলবে। পাঁচশো টাকার জিনিশ দেড়শোয় কিনেও মনে হবে ঠকে গেলাম। কিছুতেই মন স্থির হয় না দরাদরির বেচা-কেনায়। বৈশাখের পয়লায় নতুন বছর। বছরের আরম্ভের দিনে সোনার দোকান থেকে বই-এর দোকানে ভীড়। বইয়ের পাড়ায় প্রকাশক খুব নিষ্ঠা ভরে মানেন বৈশাখের এই দিনটিকে। আরম্ভ তো। আরম্ভের দিনে লেখকরা আসেন। আগে বই প্রকাশ হতো অনেক, এখন বই মেলায় যা হতে পারেনি, তাই-ই পয়লা বৈশাখে। নতুন বছরের নতুন দিন আরম্ভ হয় মেলামেশায়। বেশ বেশ বেশ। আমি দেখতে পাই সেই শ্যামল, সিরাজ, সুনীল, বরেন, বিমল কর, সমরেশ বসুরা বৈশাখের প্রথম দিনে আছেন। আছেনই। পার হয়ে যাচ্ছেন ট্রাম রাস্তা। বই-এর ঘরে ঘরে তাঁদের আসা।

আবার জন্ম নেব, এস হে ২৫শে বৈশাখ

ফিরে এল সেই পঁচিশে। পঁচিশে এলে বাল্যকাল ফিরে আসে। কৈশোর উঁকি দেয়। যৌবনবেলার কথা মনে পড়ে। পঁচিশে ধীরে ধীরে আমার এই বয়সেও পৌঁছে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, আমাদের আনন্দের দিন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আমাদেরই মিলিত এক জন্মদিন। হ্যাঁ, তাই যেন। বাঙালীর একটিই উৎসবের দিন, ২৫শে। বাঙালি বুঝি কোনো এক পঁচিশেই জন্মেছিল। সেই পঁচিশে থেকে বাঙালির যাত্রা শুরু। সেই পঁচিশে দুশো, পাঁচশো, হাজার বছর আগে, পাল বংশ, গুপ্তযুগ, তা পেরিয়ে সেই কত হাজার বছর আগে রেবা নদীর তীরে হয়েছিল উদযাপন। কিংবা উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীর কুলে বেজেছিল শুভ জন্মদিনের শঙ্খ। সেই হাজার বছর আগে ঠিক হয়ে গিয়েছিল কোনো এক পঁচিশে জন্ম নেবেন তিনি। সত্যি বলতে গেলে পঁচিশে বৈশাখের আনন্দ যেন নিজ গৃহে নতুন শিশু জন্মানোর আনন্দ। আমার কাছে প্রতিটি পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। আর এও সত্য পঁচিশে এলে ২২শের কথা মনে এসে যায়। পঁচিশে বেজেছিল সহস্র শঙ্খ, ২২শে নেমেছিল অনন্ত বারি ধারা। কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, শিশু কন্যা হয় তো, ২২শে শ্রাবণ কি খুব বৃষ্টি হয়েছিল? আমি তো বাইশে নিয়ে যা জানি, শুনেছিলাম বৃষ্টিই হয়নি, রৌদ্র পোড়া আকাশ ছিল কলকাতার মাথায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি কলকাতার? রবীন্দ্রনাথ এই মহাবিশ্বের। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, পদ্মা, মেঘনা, তিস্তা, তোর্সা, করতোয়া, মহানন্দা, ডাহুক, সুবর্ণরেখা, ডুলুং... সমস্ত নদীর তীরে কবি তো ছিলেন। ২২শে অনন্ত বারিধারা নেমেছিল, বন্যা হয়েছিল, নদীর গতিপথ বদলে গিয়েছিল এপার, ওপার কোথাও।

কবি ১৩৪৫ (১৯৩৮) এর ২৫শে বৈশাখে কালিম্পঙে লিখেছিলেন তাঁর "জন্মদিন" কবিতাটি।

আজি আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন; একাসনে দোঁহে বসিয়াছে;
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা-সম –
একমন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।।

কবির তখন ৭৭ বছর পার হলো। সেই বয়সে পৌঁছে এই প্রজ্ঞায় তিনি পৌঁছেছেন। সুতরাং বাইশে অনন্ত বরিষণে কত নদী তার গতিপথ বদলে নিয়েছিল যে তা ভেবে নিতে আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমরা সকলেই যে পঁচিশে বৈশাখের সন্তান। পঁচিশে না থাকলে বাঙালির কী থাকত? শুধুই বাইশে, জলপ্লাবন? ৪৩-এর মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, বাঙালি শুধুই ভিটে হারা হতো। বোমা পিস্তল, নাফা-মুনাফা ব্যতীত বাঙালির আর কিছুই থাকত না। ফেলে আসা ওপারের সঙ্গে সেতু তো রবীন্দ্রনাথ। পঁচিশে বৈশাখ। যদিও ওঁদের উদযাপন আমাদের সঙ্গে প্রায়ই মেলে না। একদিন আগে হয়ে যায়। কিন্তু সেও তো পঁচিশেই। বৈশাখই। গানে কবিতায় যে বাঙালিয়ানা, তাই দিয়ে আর ২৫শে দিয়ে ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ওঁরা দাঁড়াচ্ছেন। আমরা নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানে, বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গায় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, আমাদের জাতির জন্মদিন পালন করছি। আমার ছোটবেলায় প্রথম পঁচিশে আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির ঘরে। আমার দাদা একটি রেকর্ড প্লেয়ার কিনে এনেছিলেন, এইচ.এম.ভি. কোম্পানির। তার কোনো স্পিকার ছিল না। ঢাউস জি.ই.সি. রেডিওয় জুড়ে দিয়ে গান শোনা হত। সেই রেকর্ড প্লেয়ারে বাজল রবীন্দ্রনাথের গান দেবব্রত বিশ্বাসের গলায়। মেঘ বলেছে যাব যাব...। রবীন্দ্রনাথের একটি বাধানো ছবি এনেছিলেন বাবা। সেই ছবিতে খুড়তুতো দিদি চন্দন পরালো যেমনটি পরাত আমাদের জন্মদিনে আসনে বসিয়ে। সেই বছর ছিল পঁচিশের

একশো বছর। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। চন্দন পরিয়ে বেলফুলের মালা পরিয়ে ধুপ জ্বেলে দেওয়ার পর ছোটবোন নাচল, এস হে বৈশাখ এস এস। হারমনিয়ামে গান গাইল উপরের ফ্ল্যাটের তেজেনবাবুর মেয়ে। আমি আবৃত্তি করলাম, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে...। ছোট নদী আমি দেখেছিলাম কিশলয়ে আঁকা। তার কতদিন বাদে শান্তিনিকেতন যেতে বাসে অজয় পার হয়েছি, আমাদের ছোট নদী...। ২৫শে বৈশাখ। খড়ি নদীর ধারে প্রতিবিম্ব পত্রিকা করেছিল এক ২৫শে বৈশাখ। এসেছিলেন মোহন সিং। কত রাত অবধি গান। কথা। পঁচিশে উদযাপন। আমাদের পঁচিশে হতো বাড়ির ছাদে, তক্তপোশে মঞ্চ। মায়ের শাড়ি, বিছানার চাদর দিয়ে মঞ্চ সজ্জা, কারটেন। ছাত্রের পরীক্ষা কিংবা পেটেও পিঠে অভিনয়। একবার ছাদ থেকে মাটিতে নেমে এসে স্টেজ বানিয়ে বড় রবীন্দ্র জয়ন্তী। বিনি পয়সার ভোজ নাটকে রূপান্তরিত হলো, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে অন্য চরিত্ররাও এল মঞ্চে। সে এক হৈ হৈ। আমাদের পঁচিশে। গোপালদা গাইলেন, চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন চলে যায়। তিনি তখন সত্যিই বসন্তের দিন পার করছিলেন। কিছুই করতেন বলে জানি না। শুধু গান গাইতেন কোনো এক হলুদবসনার উদ্দেশে। সে সেই বসন্ত পার করে তাঁকে বৈশাখের দারুণ অগ্নিবানের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে নিজের বসন্তে ফিরে গিয়েছিল। সেই গোপালদাকে দেখি পা টেনে টেনে হেঁটে আসছেন ব্রিজের দিক থেকে। ময়লা জামা প্যান্ট, রুখু চুল। একা ছাড়া আর একজনের সঙ্গে তাঁকে দেখিনি কোনোদিন। এই তো আসছে আবার পঁচিশে। এইতো বছর বছর পঁচিশে। আসুন না গোপালদা... চলে যায় মরি হায়, বসন্তের দিন চলে যায়...। গলা তুলেছিলেন গোপালদা এমন যে কিছু না বুঝে আমার চোখে জল। তাঁকে দেখি পথে। আমি তাঁকে চিনতে পারি। তিনি তাকিয়েও দ্যাখেন না...গুণগুণ করছেন একা একা কদম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,

আজ মম জন্মদিন। সদাই প্রাণের প্রান্তপথে
ডুব দিয়ে উঠেছে সে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে, কী জানি,
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মালাখানি
সেথা গেছে ছিন্ন হয়ে;...

এস হে পচিশে বৈশাখ। আবার জন্ম নেব আর এক পঁচিশে, সেই যাত্রা শুরু হোক।

২২শে শ্রাবণ

বাংলা সন ১৩৪৮ এর ২২শে শ্রাবণ কপোতাক্ষ, তিস্তা, তোরসা, ডুলং... এই সব নদী তার গতি পথ বদলে নিয়েছিল। উত্তরের পাহাড় কেঁপেছিল। দক্ষিণের সমুদ্র উথাল পাথাল হয়েছিল। বাইশে শ্রাবণে কত মেঘ ছুটে এসেছিল আমাদের আকাশে। নজরুল তাঁর প্রয়াণে লিখেছিলেন, দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্তপারের কোলে/ বংলার কবি শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি তুমি চলে যাবে বলে/ শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে।

আমি ২২শের অনেক বছর পরে জন্মেছি। শ্রাবণ চিনেছি, আষাঢ় চিনেছি রবীন্দ্র নাথে। বর্ষা কবির গানে কবিতায় বন্দিত। বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন সজল স্নিগ্ধ মায়াময় প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথেই অনুভব করতে শিখেছি হয়তো। আষাঢ় শ্রাবণের একটি অন্তর আছে। সেই অন্তর চিনেছি কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথে। মেঘদূতের স্মৃতিই যেন সমস্তজীবন ধারণ করে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ়ের আবির্ভাব কবিকে উদাত্ত করেছিল। সেই তিনি শ্রাবণে মৌন হয়ে যেতে থাকেন, বুঝিয়ে দেন, শ্রাবণ মৌনতার মাস। বাইশে সেই মৌনতা অতল হয়েছিল।

এমন দিনে তারে বলা যায়/ এমন ঘনঘোর বরিষায়.../ এমন দিনে তারে বলা যায়.../ এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরোঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়।

আসলে ২২শের কথাই যেন কবি লিখে নিয়েছিলেন শ্রাবণঘন মেঘে ঢাকা প্রকৃতি থেকে, তিনি লিখছেন, ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,/ বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।/ যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে/ সে কথা আজি যেন বলা যায়/ এমন ঘনঘোর বরিষায়।।

এ যেন ২২শে শ্রাবণের কথাই। রবীন্দ্রনাথ নিজ প্রয়াণের দিনটিকেই যেন এই ভাবে ভেবেছেন। তাঁর প্রয়াণ তো অনন্তে বিলীনতা। অনন্ত থেকে এসে অনন্তে মিলিয়ে যাওয়ার কথাই তাঁর উচ্চারণে, সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর/ আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।

২২শে শ্রাবণ সেই ১৩৪৮-এর পর থেকে আমাদের জাতির কাছে এক আলাদা শব্দবন্ধ। এ যেমন কবির প্রয়াণের দিন, জাতির শূন্য হওয়ার দিনও তো। কিন্তু সবই তো দিয়ে গেছেন তিনি। নিঃস্ব হইনি। আমরা তাঁকে নিয়েই আছি। রবীন্দ্র প্রয়াণের কথা বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর উপন্যাসে আছে। রবীন্দ্রনাথের অসুখ, আর রবীন্দ্রনাথে আচ্ছন্ন এই উপন্যাস। স্বাতী ও তরুণ অধ্যাপক সত্যেনের ভিতরে ভালবাসার জন্ম নেয় ২২শে শ্রাবণ, প্রয়াণের পর কবিকে দেখতে গিয়ে। জোড়াসাঁকো, সেখেনে নেই কবি, কলেজ স্ট্রিট নিয়ে গেছে তাঁকে, তারা হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রিট আসে।

"স্বাতী ভাবছিল লম্বা গভীর আনত আচ্ছন্ন স্তব্ধ মন্থর মিছিল, কিন্তু মাত্রই কয়েকজন যেন অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এল কাঁধে করে— নিয়ে গেলো উত্তর থেকে দক্ষিণে— পিছনে এলোমেলো লোক— বিদ্যুতের ঝিলিক দিলো লম্বা শাদা চুল আর মস্ত শাদা শান্ত তন্ময় কপাল। ঐটুকু দেখলো স্বাতী, আর দেখতে পেল না।"

স্বাতীকে নিয়ে সত্যেন সেই মহানিষ্ক্রমণ দেখতে গিয়েছিল। স্বাতী ঐটুকু দেখতে পেয়েছিল। ঐ তার কবিকে দেখা, প্রথম ও শেষ। তারপর সে নিজেকে সংবরণ করে। করতে চায়। স্বাতীর মুখ দেখে সত্যেনের চোখ কি ভিজে এল? বুদ্ধদেব বসু লিখছেন, "...এ মৃত্যু তো কান্না চায় না, এই দুঃখ মহান, মহামূল্য দুঃখ, আশি বছরের পরম পরিশ্রমের এই সব শেষের রত্ন— এ কি চোখের জলে বাজে খরচ করবার?"

সেই ২২শে শ্রাবণে সমস্ত কলকাতা নিস্তব্ধ। চিনারা, সায়েব, মেম, পাদরি, সাধারণ মানুষ, সবাই চলেছে ফুল হাতে নিমতলার দিকে। তিথিডোর পড়লে সেই ২২শে শ্রাবণ চোখে দেখা যায়। এ এমন এক দিন, মনে

হয় আমিও তাঁর কথা কোথাও একটা লিখে রাখি, কিন্তু লিখব কোথায়, নিজের মনের ভিতরে।

"সেই যে রবি ঠাকুর চলে গেলেন বাইশে শ্রাবণ, নীলকুমার, তিস্তা, তোরসা, ধরলা, গদাধর, কালজানি আর ব্রহ্মপুত্র, যা কি না এদেশে যমুনা, সব ফুলে ফেঁপে উঠল, সেই বাইশে শ্রাবণের কথা জানতে পারল উত্তর দেশের অখ্যাত এক স্টেশনের মাস্টারবাবু নিখিলচন্দ্র একদিন না দুদিন বাদে। শিয়ালদা থেকে ছাড়া দার্জিলিং মেল একটা একটা স্টেশনে খবর দিতে দিতে আর এগোতেই পারে না। মৃত্যুর খবরের ভার বড় বেশি। আর বৃষ্টির শেষ ছিল না। ট্রেন লেট হতে থাকে। শিয়ালদা থেকে রাণাঘাট, মাজদিয়া, পোড়াদহ হয়ে পাকশি জংশন। জংশন থেকে আরো সব গাড়ি সেই মৃত্যু সংবাদ নিয়ে পূর্ববঙ্গের ভিতরে ভিতরে ঢুকে যায়, বাইশে শ্রাবণ কী হয়ে গেছে। পাকশি জংশন থেকে সেই গাড়ি পদ্মার উপরে হার্ডিঞ্জ ব্রিজে উঠল। ঝম ঝম ঝম পদ্মা নদী শুনল তিনি নেই। পদ্মার জল উত্তাল হয়ে উঠল কান্নায়। আরো সব নদীর কাছে খবর চলে গেল। অন্ধকারের নদীর উপরে ভাসা জেলে নৌকোয় খবর উঠে এল, তারা সব ঘরে ফিরতে লাগল। মৃত্যু সংবাদ তো ঘরেই ফেরায়। গাড়ি ঈশ্বরদি, নাটোর হয়ে সান্তাহার জংশনে গিয়ে আর নড়তে পারে না। কতদিকে খবর গেল। তারপর সেই বগুড়া হয়ে লালমনির হাট, কত দেরি করল সেই শোকের খবর নিয়ে আসা গাড়ি। কলকাতা থেকে তাঁর স্টেশন মেটিলি না পাটেশ্বরী, ভুরুঙ্গামারী, সোনাহাট এল এক গাড়ি ওই খবর নিয়ে। বেতারে খবর ছড়িয়েছিল, কিন্তু বেতার রেডিও তো তার ছিল না। এ আমার মনে মনে বলা। কে নিখিলচন্দ্র, কোথায় পোড়াদহ, পাকশি জংশন, ঈশ্বরদি, নাটোর, সান্তাহার জংশন, লালমনিরহাট... আমি জানিই না ভাল করে। পার্টিশনের পর কলকাতা থেকে উত্তরদেশ যাওয়ার সেই রেলপথই অবলুপ্ত। কিন্তু ২২শে শ্রাবণের কথা মনে হতে এমন এক মেল ট্রেনের সওয়ারি হয়েছিলাম সেই আমি আমার জন্মের আগের এক রাতে। ২২শে শ্রাবণ এক অনন্ত মৃত্যুর গাথা। এমন এক দুঃখের দিন, যা কি না মেঘে মেঘে ভার হয়ে ওঠে হিমালয়ের চেয়েও বেশি। কিন্তু এই শোক নিস্তব্ধতার ভিতরেই গভীর। ১৩৪৭-এর কার্ত্তিক মাসে, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু মিশাইলে মূলতানে-/ গুঞ্জন তার রবে চিরদিন, ভুলে যাবে তাঁর মানে। ... শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে, বুঝিবে না আর কিছু-/ বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে বেঁচেছিল কেউ বুঝি,/ আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই তাই সে পেয়েছে খুঁজি।।

বাইশের ছায়া প্রলম্বিত। শেষ ছায়াটুকু মিলিয়ে যায়নি। রাগিনীর গুঞ্জনটুকুও না।

আমাদের বড়দিন

ডিসেম্বর মাস খ্রীষ্টের জন্মমাস। তাইই খ্রীষ্টমাস। কিন্তু সে তো আমাদের কাছে। আসলে মাস শব্দটি তো আমাদের। খ্রীষ্টমাস আদি ইংরিজিতে cristes maesse, masesse শব্দটি লাটিন missa শব্দ থেকে উৎসারিত। missaর অর্থ পবিত্র উৎসব। এই উৎসব এখন সমস্ত পৃথিবীর। বড়দিন আমাদের পৌষের ৮-৯ তারিখ পড়ে। ২৫শে ডিসেম্বর যিশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহন করেছিলেন বেথেলহেমের এক ঘোড়ার আস্তাবলে। কিন্তু সঠিক তারিখ কী করে জানা গেল? খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস অনুসারে যিশুর জন্মোৎসবই বড়দিন। আদি খ্রীষ্টিয় পুরাণে আছে এইদিনের ঠিক ন'মাস আগে ঈশ্বর পুত্র মাতা মেরির গর্ভে প্রবেশ করেন। মেরি-মরিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছায় গর্ভধারণ করে ছিলেন। বাইবেলের মথি লিখিত সুসমাচারে জানা যায় পবিত্র আত্মা থেকে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছিলেন। মানুষের স্নিগ্ধ কল্পনা যাই হোক, যিশুর জন্মদিন খুব বড় এক দিন তো নিশ্চয়। সূযের অয়নান্তের সময় এইটি। দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণ শুরু হয় ২৩শে। আর এই অয়নান্ত উপলক্ষ্য করেই বড়দিন উৎসবের সূচনা। শীতের দেশে সূর্যের অয়নান্তের এই উৎসব নিশ্চিত ভাবেই আনন্দময়। আরো আলো আরো রৌদ্র এস। দিনের আলো দীর্ঘ হোক। বড়দিন তাই শেষ অবধি আলো আর রৌদ্রেরই উৎসব। হ্যাঁ, প্রাচীন গ্রীক ভাষায় X বর্ণটি (সি) Christ শব্দের প্রথম অক্ষর। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে তাই খ্রীষ্ট শব্দের পরিবর্তে X mas, এক্সমাস ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে বড়দিন এখন আর শুধুমাত্র খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের উৎসব নয়। বড়দিন সকলের উৎসব। ইংরিজি নববর্ষ আসছে, তার আগে আগে ঈশ্বরপুত্রের জন্মোৎসব। আমরা ছেলেবেলায় বড়দিনের উৎসব কিছুই বুঝতাম না। আমাদের সেই গ্রাম দণ্ডীরহাট, ওই গ্রামে কোনো খ্রিস্টান ছিলেন না। বড়দিন ছিল না। ইস্কুল তখন পরীক্ষার পর ছুটিই থাকত। এই উত্তর কলকাতায় কীই বা ছিল বড়দিন। শুধু দোকানে দোকানে কেক। শীতের সকালে কেক খাওয়া হতো। এরপর আমার পুত্র-কন্যার জন্য সান্তাক্লজ হয়ে তাদের বালিশের নিচে রেখেছি উপহার। সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা বিস্মিত হয়ে যেত। সান্তাক্লজ এক রূপকথার সকাল উপহার দিত তাদের। পুত্রের জন্য তাকে নিয়ে শ্যামবাজার থেকে ক্রিসমাস বৃক্ষ আর টুনি বাল্ব কিনে এনে বাড়িতে সাজিয়েছি। এর সঙ্গে কোনো ধর্ম জড়িয়ে নেই। বড়দিন এক আশ্চর্য রূপকথা। গভীর শীতের ভিতরে বেথেলহেমের আস্তাবলে যিশুর জন্ম আর আকাশে এক নতুন তারা দেখে ঈশ্বরপুত্রের সন্ধানে আসা সাধুদের কাহিনি ছেলেবেলায় কী অপরূপই না লাগত। এখনো সেই কাহিনির বিস্ময় ফুরোয়নি। বাঙালি খ্রিস্টান পাড়ায় বড়দিন হয়। প্রয়াত লেখক বিমল কর আমাদের বলেছিলেন, বড়দিনের রাতে যিশুর নাম-কীর্তন শোনার অভিজ্ঞতা। রীতিমত খোল-কত্তাল বাজিয়ে সেই নামগান সমস্ত রাত ধরে হতো। তাঁর গল্পের ভিতরে খ্রিষ্টীয় পুরানের ছায়া আছে অনেক। যিশুর জন্মের ভিতরে যিশুর জীবনের ভিতরে এক শান্ত পুরোহিত ও রাজার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। এই কাহিনি বালকমনে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। বেথেলহেমে জন্ম নেওয়া শিশুই যে বড় হয়ে বেথেলহেমের রাজা হেরদের রাজত্বের অবসান ঘটাবে, এই কথা জ্যোতিষীদের কাছে শুনেছিলেন হেরদ। সেই কারণে পাঁচ বছর পযর্ন্ত শিশু বালকদের তিনি হত্যা করেছিলেন। সন্তান নিয়ে মেরি ও যোশেফ তখন মিশরের পথে। তারপর তাঁরা যান ইস্রায়েলের গালিলি প্রদেশের নাজারথে। সেখানেই ঈশ্বরপুত্র বড় হয়ে ওঠেন। নাজারথ থেকেই তাঁর ক্ষমার ধর্ম প্রচারে বের হন। যিশুর জীবন কাহিনি, তাঁর ক্রুশবিদ্ধ রূপ আমাকে তার জন্মোৎসবে মনে মনে সামিল করেছে। বড়দিন উৎসব আমাদের এই শহরে সেই সায়েব আমল থেকেই আলোর উৎসবের মতো করেই পালন করা হয়। মধ্য কলকাতার গির্জাগুলিতে উপাসনা শুরু হয় পঁচিশের শুরু, রাত বারোটা থেকে। পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল উৎসবে মাতে। সেই উৎসব আনন্দের। ধর্মীয় নয় কিছুতেই। আমাদের শহরতলীতে, গ্রামাঞ্চলে বহু খ্রিস্টান পল্লী আছে। বাঙালি খ্রিস্টান তার নিজের মতো করে এই উৎসব পালন করে। আলো

আর ফুল-পাতা, রঙিন শিকলি দিয়ে সাজায় ঘর-বাড়ি। কলকাতার কাছেই কেষ্টপুরের ক্যাথলিক গির্জা বহু প্রাচীন। সেখানে মেলা বসে বড়দিনের। আমি সেই মেলায় গিয়েছি। চমৎকার এক গল্প আছে কবিতা সিংহর। কলকাতার বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারের। "টুলির বড়দিন"। টুলির বাবা মায়ের ডিভোর্স হয়ে গেছে। টুলির বাবা আবার বিয়ে করেছেন। টুলি থাকে মায়ের সঙ্গে। এই গল্প বড়দিনের আগের দিনের গল্প, ক্রিসমাস ইভের গল্প। ইস্কুলে ছুটির ঘন্টা পড়ল, নীল কারডিগান আর শাদা টিউনিকের স্রোত নামতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। এদের ভিতরে টুলি আলাদা। অনেক শুকনো আর ক্লিষ্ট মুখের ভিতরে সেও একজন। তার তাড়া নেই বাড়ি ফেরার। ক্রিসমাস ইভে বাড়ি ফিরে যে বিছানায় শুয়ে আরাম করে এনিড ব্লাইটন নিয়ে বসবে, সে উপায় নেই, তার সুখের স্বর্গে হানা দেবে ধুতি পাঞ্জাবি পরা সেই লোকটা, হিরণমামা। তাঁকে টুলির ভাল লাগে না। নিচু গলায় লোকটা মায়ের সঙ্গে, তার সঙ্গে কথা বলে। টুলির বাবার কথা মনে পড়ে শুধু। ক্রিসমাসের আগে বাবা মায়ের সেই ঘর সাজানো। তারপর পার্টি...এখন সব অবাস্তব মনে হয়। মা খুব কষ্ট করে টুলিকে মানুষ করছে। এক পয়সাও অ্যালিমনি নেয় না টুলির বাবার কাছ থেকে। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে টুলি ওষুধের দোকানে গিয়ে বাবাকে ফোন ঘোরায়। খুব যে মন খারাপ লাগছে বাবার জন্য। বাবা আজ তুমি আসবে বাবা? টুলি কাঁপছিল থরথর করে, 'বাবা লক্ষ্মীটি বাবা, এস, খ্রিসমাসে যেমন তুমি সাজিয়ে দিতে তেমনি করে সাজিয়ে দেবে...।' টুলির বাবা ফোন কেটে দিল। পবিত্র জন্মোৎসবে খ্রিস্টান পল্লীর একটি বালিকার মন নিয়ে কী বেদনাঘন সেই গল্প। বড়দিন আমাদের সাহিত্যে ছায়া রেখেছে অনেক। গ্রামের মাটির গির্জার বড়দিনের উৎসব পবিত্রতায় অনন্য। দিন বড় হোক। সকলের জীবন পবিত্র হোক।

লিটল ম্যাগাজিনের সঙ্গে এত বছর

৪৩ বছর আগে আমি যে পত্রিকায় গল্প লিখে স্বপ্ন দেখেছিলাম লিখব, হ্যাঁ লেখাই হবে সারাজীবনের সাধনা সেই “একাল” পত্রিকা বের হতো আমাদের বেলগাছিয়া থেকে। দুই সম্পাদক নকুল মৈত্র এবং ভরত সিংহ খুব সাধারণ চাকরি করতেন। সামান্য বেতন পেতেন। গাঁট গচ্চা দিয়েই পত্রিকা করতেন। বিজ্ঞাপন ছিল না পত্রিকায়। তাঁদের কাছ থেকেই আমি শিখেছিলাম সাহিত্যের জন্য ত্যাগ করতে হয়। সাহিত্য এক সাধনার ক্ষেত্র। ২৫০-৩০০ কপি ছাপা হতো একাল। কাগজের দাম দেওয়ার সামর্থ্য হতো না বলে এত কম ছাপা। কিন্তু একাল পত্রিকার গল্প সংখ্যার কথা এখনো মনে আছে। সেই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল সুবিমল মিশ্রর গল্প “বাগানের ঘোড়া নিম গাছে দেখন চাচা থাকতেন”, আমার প্রিয় গল্প। সুবিমল মিশ্র প্রথা ভাঙা লেখক। যে পথে সকলে গমন করেন, সে পথে যাননি। বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাসে তিনি উচ্চারিত হবেন। তিনি লিটল ম্যাগাজিনেই লিখেছেন এতটা জীবন। লিটল ম্যাগাজিনই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ। কথাটা বাগাড়ম্বর মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য। সত্য কীভাবে তা এত বছর ধরে দেখেছি, উচ্চারণেই শিহরণ হয়। কেউ কেউ ভাবেন লিটল ম্যাগাজিন হলো বিগ ম্যাগাজিন, বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রবেশের সিঁড়ি। তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ঘটেনি তা নয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? কতিপয় তরুণ একজোট হয়ে যে পত্রিকা বের করতে শুরু করলেন নিজেদের আত্মপ্রকাশের তাগিদে, সেই আত্মপ্রকাশে যে স্পর্ধা তা তাঁরা প্রকাশ করবেন কীভাবে? বাণিজ্যিক পত্রিকা কি স্পর্ধা দেখাবার জায়গা? সেই জায়গা তাঁরা দেবেন কেন? গত শতকের ষাটের দশকে যে দুই সাহিত্য আন্দোলন দেখেছি আমরা তা দুই লিটল ম্যাগাজিনকে ঘিরেই। একদল তরুণ ‘ক্ষুধার্ত’ নামের যে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, নিজেদের ক্ষুধার্ত প্রজন্মের লেখক হিশেবে অভিহিত করেছিলেন, তাঁরা যে প্রথা বিরোধী গল্পের জন্ম দিয়েছিলেন, তা ওই পত্রিকা ব্যতীত হতে পারত না। এঁদের লেখক বাসুদেব দাশগুপ্ত তাঁর ‘রন্ধনশালা’ গল্পগ্রন্থের জন্য আমাদের সাহিত্যে চিহ্নিত এক জায়গা করে নিয়েছেন। সমালোচকরা উল্লেখ করেন কী করেন না, তা আলোচ্য নয়, আলোচ্য হলো রন্ধনশালা বইটির কথা এখনো নবীন প্রজন্ম লিখতে এসে শুনতে পায়। যে গল্প বাণিজ্যিক পত্রিকা ছাপতে চায় না পাঠক হারাতে হবে বলে, সেই গল্প লিটল ম্যাগাজিন ছাপে। সাহিত্যের যাবতীয় দায় ও ঝুঁকি গ্রহন করতে পারে লিটল ম্যাগাজিনই। তরুণ লেখকরা যে কথা বলতে পারবেন না বিগ ম্যাগাজিনে তা বলতেই লিটল ম্যাগাজিন করা। গত শতকের ষাটের দশকের আর এক সাহিত্যের আন্দোলন ছিল, শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। তাঁরাও গল্পের চিরাচরিত লিখন পদ্ধতির বদল ঘটাতে চেয়েছিলেন। সেই তরুণরা এখন প্রবীণ, আমি রমানাথ রায়কে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনারা কেন শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন কেন? তিনি উত্তর দিলেন, নিজের কথা নিজের মতো করে বলবেন বলে, নিজের ভাষা খুঁজে পেতে। বিগ ম্যাগাজিন তাদের ভাষায় তাদের মতো করে কথা বলাই পছন্দ করে। সাহিত্যের যাবতীয় বিদ্রোহের কথা তো লিটল ম্যাগাজিনই উচ্চারণ করতে পারে। বিদ্রোহ কলমে। আমাদের ভাষার বড় গল্পলেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব কৃত্তিবাস পত্রিকায় ছাপা হতে সাহিত্যের চিরাচরিত পথ, যে পথ সহজসিদ্ধির (!) পথ সেখানে বড় ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন। বড় বড় স্তম্ভ বিরক্ত হয়েছিলেন। গত শতকের ষাটের দশকের কথা তা। সাহিত্যের ইতিহাস অনেকটাই আঙ্গিকের ইতিহাস। নতুন আঙ্গিক, নতুন ভাষা নিয়েই তো সাহিত্যের নবীন বরণ হয়। ষাটের দশকের অব্যবহিত আগে আমাদের ভাষার বড় মাপের গল্প-লেখক বিমল কর লিটিল ম্যাগাজিনেই সাহিত্যের “নতুন রীতি” এক সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন তরুণ দেবেশ রায়, সন্দীপন, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্মরজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, যাশোদাজীবন ভট্টাচাযরা। এইসব সাহিত্য আন্দোলনের কথা বলা লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্র নির্ধারণের কারণেই। সেই দেবেশ রায় এখনো এই

আশী বছরে পা রেখে লিটল ম্যাগাজিনেই বছরের সেরা গল্পটি লেখেন (নদী ও শহরের যুগলগীতি — কথা সোপান)। এই বয়সেও তিনি লিটল ম্যাগাজিনে নিজের সেরা লেখাটি দিতে পারেন, তা তো এই সব সাহিত্যপত্রের উপর প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকে। সাহিত্য পত্রিকার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা থেকে। লিটল ম্যাগাজিন আসলে নামে লিটল কিন্তু চরিত্রে ব্যপ্ত। সিংহভাগ পাঠকের ধারণা সাহিত্যের যা কিছু সৃজনশীলতা তা হয় বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায়। জানেন না, বাংলা সাহিত্যের সেরা প্রবন্ধমালা ধরণ করে লিটল ম্যাগাজিন। অশোক সেন, সৌরীন ভট্টাচায, অরিন্দম চক্রবর্তীর মতো বড় মাপের জীবন জিজ্ঞাসুরা অনুষ্টুপ, বারোমাস ইত্যাদি সাহিত্যপত্রের লেখক। এক্ষণ ছিল, এখন নেই। ছিল বারোমাস সাহিত্যপত্র, এখন নেই। শতভিষা, উত্তরসুরী নেই। অমৃতলোক নেই। নেইয়ের তালিকা অনেক বড়। কিন্তু আছে তো কম পত্রিকা নয়। অনুষ্টুপ, অনীক, বিভাব, আত্মপ্রকাশ, কবিতীর্থ, এবং মুশায়েরা, বিষয়মুখ, কোরক, পরিচয়, পরিকথা, দিবারাত্রির কাব্য, নীললোহিত, আদম, আলোচনা চক্র, দেবভাষা, গুরুচন্ডালী, ইসক্রা, কথা সোপান, গ্রাফিত্তি, অতি ব্যতিক্রমী প্রবন্ধপত্র ১৮৭৮ কিংবা দূর উত্তরবঙ্গের মল্লার, মধ্যবর্তী, তিতির, আগরতলার মুখাবয়ব, শিলচরের দ্বিরালাপ, গুয়াহাটির পূবর্মেঘ কত কত। কিছু নাম করলাম। এর বাইরে কত যত্নশীল সম্পাদক আছেন। কত ভালোবাসা নিয়ে তাঁরা সেইসব পত্রিকা করেন। আমাদের বন্ধু সমীর চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৫ নাগাদ একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেন, সংক্রান্তি। সংক্রান্তি পত্রিকায় কত নিবিড় অভিনিবেশে সমীর অনুবাদ করেছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কির অন লিটারেচর বই থেকে তলস্তয়ের সঙ্গে গোর্কির কথোপকথনের এক অসামান্য অংশ। তলস্তয় যখন অসুস্থ, গোর্কি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। দুই প্রতিভাধরের সেই সাক্ষাৎকার খুঁজে বের করেছিলেন সমীর। লিটল ম্যাগাজিনের কাজ এই। চার্লি চ্যাপলিনের "মাই অটোবায়োগ্রাফি" থেকে মসিয়ে ভেরদ্যুর উপরে অসাধারণ লেখাটিও অনূদিত হয়েছিল সংক্রান্তিতে। লিটল ম্যাগাজিনে যত্ন আর মেধা, দুইয়ের সম্মিলন হয়। সমীর পরবর্তী কালে আর একটি পত্রিকা করেন। সেই পত্রিকা "নতুন সময়" এ অনুদিত হয়েছিল জাঁ জেনের নাটক নিগ্রো। মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছিলেন নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। বিরলকেশ গৌরবর্ণের সদাহাস্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায় পরিচিত ছিলেন ফরাসী নারাণদা বলে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই স্মরণীয় গল্প পুরকায়েতের আনন্দ ও বিষাদ এবং উর্বরাশক্তি নতুন সময়ে পড়েছিলাম। মনে পড়ে যাচ্ছে পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কবিপত্র এবং প্রয়াত কবি তুষার চৌধুরীর কবিতা দর্পণ পত্রিকায় ফরাসী নারায়ণ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন ভিক্তর উগোর উপরে ব্যোদলেয়ারের প্রবন্ধ, এবং ব্যোদলেয়ারের কবিতা। কবিপত্র পত্রিকায় পিকাশোর লেখা একমাত্র নাটক অনুবাদ করেছিলেন নির্মল ঘোষ। কবিপত্র একটি শিল্প সংখ্যা করেছিল, ১৯৭৭ নাগাদ। সেই সংখ্যায় সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট-গ্রুপ এর সকলেই লিখেছিলেন, মনে পড়ে যাচ্ছে রবীন মণ্ডল, কাঞ্চন দাশগুপ্ত, বিজন চৌধুরীরা কলম হাতে নিয়েছিলেন। অতিথি সম্পাদক ছিলেন সন্দীপ সরকার। লিটল ম্যাগাজিনই পারে এমন সৃষ্টিশীলতা আর মেধার সম্মিলন ঘটাতে। আমাদের জ্ঞান চর্চায় লিটল ম্যাগাজিনের খুব বড় ভূমিকা। ১৯৫৬ নাগাদ জলপাইগুড়ি নিবাসী সুরজিৎ বসু একটি প্রথা বিরোধী উপন্যাস লিখেছিলেন অবতামসী। সেই উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল এক স্থানীয় সাহিত্যপত্রে। সুরজিৎ বসুর অকাল প্রয়াণে উপন্যাসটি হারিয়ে যায়। কোচবিহারের মাথাভাঙা থেকে প্রকাশিত সঞ্জয় সাহা সম্পাদিত "তিতির" বহু বছর বাদে সেই উপন্যাস উদ্ধার করে সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশ করে। অবতামসী পড়ে আমি অবাক হয়েছি। এই উপন্যাস সাহিত্যের অনুরাগীদের না পড়ে থাকা উচিত নয়। অনেক বড় দিক খুলে যায় পাঠান্তে। লিটল ম্যাগাজিন এই কাজই করে। এঁর সম্পাদকদের বেশিরভাগই গল্প এবং কবিতা, কিছুই লেখেন না, অথচ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সঞ্চয় থেকে ঋণ করে, লেখা সংগ্রহ করে, রাত জেগে প্রুফ দেখে, প্রেসে বসে থেকে তাঁরা কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান? সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ থেকেই এই কাজ তাঁরা করে থাকেন। মেদিনীপুর শহরের সমীরণ মজুমদারের সঙ্গে আলাপ সেই ১৯৭৭ থেকে। সমীরণ কবিতা লিখত আর অমৃতলোক পত্রিকা বের করত। কবিতা লেখা হারিয়ে গেল, অমৃতলোক বড় হয়ে উঠতে লাগল। নিজে জানি অমৃতলোক পত্রিকার

জন্য ও নানা ভাবে উৎপীড়িত হয়েছে। সঞ্চয় নিঃশেষ করেছে। প্রবল প্রতিকূলতা এসেছে আত্মজনের কাছ থেকে, কিন্তু সে তার জায়গা থেকে সরেনি। সমীরণ পত্রিকা করেছে সাহিত্য আর সমাজের উপর দায়বদ্ধতা থেকে। সে অমৃতলোক পত্রিকার নন্দীগ্রাম সংখ্যা বের করেছিল সেই আন্দোলনের সময়। সমীরণের পত্রিকায় অনেক লিখেছি। লিখে সম্মানিত বোধ করেছি। তার প্রয়াণে অমৃতলোক বন্ধ হয়ে গেছে। তাইই হয়। লিটল ম্যাগাজিন ব্যক্তির একক প্রয়াসেই জন্ম নেয়। তিনি চলে গেলে আর সেই পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এইভাবে বন্ধ হয়েছে এক্ষণ, বারোমাস, অনুক্ত, লাল নক্ষত্র, চিল, কবিতা দর্পণ, এমনি কত পত্রিকা। গুণমানে লিটল ম্যাগাজিনই বড় প্রতিষ্ঠানের প্রতিস্পর্ধী হতে পারে। মনে করুন, এক্ষণ সাহিত্যপত্রের কার্ল মার্ক্স সংখ্যা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরির প্রকাশ, অনুষ্টুপ পত্রিকার সমর সেন, শঙ্খ ঘোষ সংখ্যা, কোরক সাহিত্য পত্রের রামায়ণ সংখ্যা, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পরিচয় পত্রিকার ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংখ্যা, গল্পসরণি পত্রিকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা বা ইসক্রা পত্রিকার এশিয়ার গল্প অনুবাদ সংখ্যা...। এমনি কত সব অসামান্য সংখ্যার কথা যে ভুলতে পারিনি। বাংলার হাট, বাংলার পুকুর, বাংলার শ্মশান, কবরস্থান, রাস্তা এসব নিয়ে সমীক্ষা নির্ভর পত্রিকা বের করেন দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রণব সরকার। কেউ বের করেন সুন্দরবনের জল-জঙ্গল নিয়ে বিশেষ সংখ্যা। মহাশ্বেতা দেবীর বর্তিকায় ছাপা হত গ্রাম সমীক্ষা, সাধারণ মানুষের, জেলে, কামার, কুমোর, চাষী, ক্ষেত মজুর, রিকশাচালকের আত্মকথা। বর্তিকাই প্রকাশ করেছিল ভারতের ভূমিদাস প্রথা নিয়ে এক অসামান্য সংখ্যা। বর্তিকা ছিল জমি মাটি আর মানুষের জন্য নিবেদিত পত্রিকা।

এক সাহিত্য সভায় এক তরুণ গল্প লেখক মন্তব্য করেছিলেন, বাণিজ্যিক এক পত্রিকা ব্যতীত ওই সব লিটল ম্যাগাজিনে যা ছাপা হয়, তা নাকি ভিজে ব্লটিং পেপারের মতো লাগে তাঁর কাছে। তিনি সাহিত্যের ইতিহাস জানেন না। গত তিরিশ বছরে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের সেরা গল্পগুলির বড় অংশ ধারণ করে আছে লিটল ম্যাগাজিনই। সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে অনেক বিখ্যাত লেখকের সেরা গল্পগুলি লিটল ম্যাগাজিনেই প্রকাশিত। তালিকা করে দেওয়া যায়। মহাশ্বেতার সেরা নভেল "অপারেশন বসাই টুডু" প্রকাশিত হয়েছিল কৃত্তিবাস পত্রিকায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় "মায়া কাননের ফুল" কৃত্তিবাসেই লেখেন। শ্যামল লেখেন, অগস্ত্যযাত্রা এবং "রূপোকুঠীর পরি" এই দুই উপন্যাস। নবারুণ ভট্টাচার্য'র হারবার্ট প্রকাশিত হয়েছিল প্রমা পত্রিকায়। বিমল কর শেষ জীবনে নিজে সারা দুপুর বসে প্রুফ দেখতেন তাঁর পত্রিকা গল্পপত্র-র। তিনিই সম্পাদক। ভুলতে পারি না সেইসব দিনগুলিকে। গল্পপত্র-এ কে না লিখেছেন, শ্যামল, দেবেশ, মহাশ্বেতা থেকে আমরা সবাই। এখন যাঁরা প্রবীণতার দিকে পা বাড়িয়েছেন, তাঁদের অনেকেই লিটল ম্যাগাজিনেই তাঁদের সেরা লেখাগুলি লিখেছেন যে তা তালিকা করে বলে দেওয়া যায়। তাই যে লেখক বলেন তিনি লিটল ম্যাগাজিনে লিখবেন না, বা লিটল ম্যাগাজিনে ভিজে ব্লটিং পেপারের মতো লেখা ছাপা হয়, তিনি সাহিত্যের ইতিহাস না জেনে কথা বলেন। আমি শুনে আহত হয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি লিটল ম্যাগাজিনের বিস্ফোরক ক্ষমতায় সময়ের সংকট।

৫০ বছর আগে পাওয়া যেত না তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস। আমি কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে একটি পুরনো বই পেয়েছিলাম। সেই আমার প্রথম তিতাস পড়া। এখন তিনি স্বমহিমায় জ্বলজ্বল করছেন। কত প্রকাশক ছেপেছেন তিতাস। সতীনাথ ভাদুড়ীর বইও তখন অমিল ছিল। সময় বাঁচিয়ে তুলেছে তাঁকে। তখন তাঁকে পড়ত না বাঙালি পাঠক, এখন তাঁকে না পড়লে সাহিত্য ও জীবনের অনন্য সৌন্দর্য অনুভব করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সময়ের এই সংকট থাকে। সময় অনেক সময় চিনতে পারে, অনেক সময় পারে না। যাঁকে পারে, তিনি ভাগ্যবান। যাঁকে পারে না, তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহাযাত্রায় যান। কিন্তু এও পুরো সত্য নয়। মানিকের আলো চেনা গিয়েছিল। কিন্তু মানিককে বঙ্গবাসী বই কিনিয়ে পাঠককূল সেই ভাবে চেনেননি। জনতা পাঠকই বা চিনবেন কেন? মানিক যা লিখেছিলেন, তার পাঠক এবং রমা ও

মোহনের পাঠক নিশ্চিত ভাবে এক নয়। সকলের জন্য নয়, তিনি লিখেছেন দীক্ষিত পাঠকের জন্য। সাহিত্য-শিল্প শুধু মাত্র বিনোদন নয়। কোনো শিল্প কর্মই তা নয়। আবার এখন বিনোদনের নানা মাধ্যম। তা সাহিত্যে থাবা মারছে। বইয়ের পাঠক কমছে। কিন্তু একটি কথা বলার থাকতে পারে টেলিভিশনের জন্য কি ভাল থিয়েটার সিনেমার দর্শক কমেছে? টিভি সিরিয়াল দেখা আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কুবেরের বিষয় আশয় পড়া এক ঘটনা নয়। এমনিতে পৃথিবী জুড়ে সিরিয়াস সাহিত্যের পাঠক কমেছে হয় তো। জনগণেশের সাহিত্য যাঁরা করেন, তাঁদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়েছে। চিরকাল তা উচ্চই ছিল, এখন আরো বেড়েছে।

সময়ের এই সংকট নিহিত আছে সমাজে। কোন সমাজ? যে সমাজ আমাদের লালন করছে। অথবা আমরা যে সমাজকে গড়ে তুলেছি আমাদের গ্রাম-শহরে। আমাদের প্রতিবেশি আমাদের স্বজন-পরিজন নিয়ে। সেই সমাজ অনুমোদন করে ক্ষমতাকে। ক্ষমতা কী ভাবে আসে? কী ভাবে ক্ষমতা গ্রাস করে সমস্ত কিছু তা অতি বিশদে বলার দরকার আছে কি?

এখন আমি বুঝে নিতে চাইছি, সময়ের সংকট আসলে কী? সমাজ ও সাহিত্যের সঙ্গে সে কী ভাবে অন্বিত হয়ে আছে। মনে হয় ক্ষমতার দিকে মানুষের অন্তহীন যাত্রাই সমস্ত সময়ের সংকট। সমাজ ও সাহিত্য এই ক্ষমতার দ্বারাই দূষিত হয়। ক্ষমতা কী করতে পারে? ক্ষমতা কাউকে লেখক করে দিতে পারে কিছুদিনের জন্য। তারপর আরেকজনকে ধরে। আরো এমন উঠে আসে। তার হয়ে বিদূষকরা চিৎকার করতে পারে। আমি আমার এই এতটা জীবনে তেমন দেখেছি কম নয়। ক্ষমতা কু-সাহিত্যকে সাহিত্য বলে চালিয়ে দিতে পারে। তার চাপে সৃজনশীল লেখক আড়ালে চলে যান। সতীনাথ ভাদুড়ী চিরজীবন অচেনা হয়েই থাকেন। কাহিনির পর কাহিনি, তার উপর যে গোদা কাহিনি তার ভার কম নয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো লেখক অপ্রকাশিত হয়ে থাকেন দীর্ঘদিন। তাঁর শতবর্ষ চলে যায় নিঃশব্দে। ক্ষমতার কাছাকাছি থাকলে, ক্ষমতার অধীশ্বরের ছায়ায় থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব হয়। না থাকলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো নীরবে চলে যেতে হয়। হ্যাঁ, তরুণ লেখকরা তাঁকে ঘিরে ছিল সন্তানেরা যেমন থাকে পিতার প্রয়াণে। আমি মনে করি ক্ষমতার কাছাকাছি থাকলে লেখকের সৃজনশীলতা নষ্ট হয়। তিনি তো ক্ষমতার বিরুদ্ধেই লেখেন। শুধু একটি কথা বলতে হয়, ক্ষমতা নিরংকুশ হয় না। ক্ষমতা যেখান থেকে আসে তাকে মনে রাখতে হয় অবৈধ ক্ষমতাকে ধারণ করার জন্যই তার আত্মনিবেদন। ক্ষমতার অবৈধ অর্জন কী? যা চলতি কথায় ফোকটে পাওয়া। ফোকটে পাওয়া ব্যাপারটা কী? অনুপার্জিত ধন অর্জন করা। অনুপার্জিত টাকা। আমি আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে একটি উপন্যাস লিখেছিলাম, ভি-আই-পি রোড। সেই উপন্যাসে এক জমির দালাল ছিল। ফোকটে প্রচুর টাকা করেছিল সে। শুধু একটি রাস্তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থাগমের রাস্তা খুলে যায়। জমি কেনা-বেচা করে ক্রমশ ধনী হয়ে উঠতে থাকে সে। সেই টাকা তার অনুপারজিত অর্থ। আমাদের সমাজকে এই টাকাই শাসন করে। সমাজ শাসন করে অবৈধ ক্ষমতার অধিকারীরা। অবৈধ ক্ষমতা কী? যে ক্ষমতা আপনি অর্জন করেছেন ক্ষমতাধর হয়ে নন। কোনো না কোনো উপায়ে প্রভাব খাটিয়ে। আজকের পৃথিবী 'সেই সব শেয়ালেরা' শাসন করে।

> যেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে
> দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
> নীরবে প্রবেশ করে-বার হয়—চেয়ে দ্যাখে বরফের রাশি...।
> (সেই সব শেয়ালেরা)

যে জন্মায় শিকারের তরে তার হিংস্রতা বুঝলাম, কিন্তু মানুষ যখন শৃগালের স্বভাব অর্জন করে, তা হয়ে ওঠে সমাজের কাছে বিড়ম্বনাময়। আর তার ভিতর দিয়েই সমাজ-জীবন অতিবাহিত হয় সভ্যতার আদি থেকেই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, মানুষের সঙ্গে তথাকথিত ইতর প্রাণীর তুলনায় বনের পশুকে ছোট করা হয়। কিন্তু আমাদের তা ছাড়া আর উপমেয় কিছু নেই, যা দিয়ে সহজ সত্যকে বোঝা যায়। বনের পশুর

হিংস্রতা দেখায় সাঙ্ঘাতিক। তাই সে এমন ভাবে উপমিত হয়ে যায়। মানুষ যা তার মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখে, সে আর কোন প্রাণী রাখতে পারে?

আকাশে জ্যোৎস্না—বনের পথে চিতা বাঘের গায়ের ঘ্রাণ
হৃদয় আমার হরিণ যেন;
রাত্রির এই নীরবতার ভিতরে কোনদিকে চলেছি?

জীবনানন্দকে আবার স্মরণ করতে হয়। নীরবতা নিশ্চয়। আমি চুপ করে আছি। আপনি চুপ করে আছেন। অথবা আপনি আমি বলছি, বলতে চাইছি। চতুর্দিকের অখন্ড নীরবতা তা গ্রাস করে নিচ্ছে। অথবা হা হা হা হাসি ঢেকে দিচ্ছে আপনার কণ্ঠস্বর। কিন্তু আমাদের সেইসব কথা সমাজে, সাহিত্য-শিল্পে ছায়া তো ফেলবেই। গোপনে ফেলিতেছে ছায়া। একটা কথা ঠিক, এই পৃথিবী কখনো কোনো সময়ে কি সংকটমুক্ত হতে পেরেছে? আর একুশ শতকের দেড়টি দশক পার হয়ে গেলে আমরা দেখছি সংকট আরো ঘনীভূত। কী সেই সংকট? ক্ষমতাবানের লিপ্সা কিংবা ক্ষমতার বারান্দায় প্রবেশের নয়। এই অসুখ তো সভ্যতার জন্ম থেকে আছে। আলোর বিপরীতে অন্ধকার। এই একুশ শতক প্রযুক্তির শতক। প্রযুক্তির শীর্ষ বিন্দুতে আরোহন করছে মানুষ। নিত্য নতুন app's, application-এর সফট ওয়্যার খুঁজে বের করছে বিশেষজ্ঞরা। তার ফলে মানুষের জীবনের গোপনীয়তা অন্তর্হিত হচ্ছে। টেকনোলজি এমন জায়গায় পৌছেছে যে কোনো কিছুই আর গোপন থাকছে না। এই ধরুন একটি app's দিয়ে আপনি খুঁজে নিতে পারবেন, সে এখন কোথায়। কে? যে কেউ। তার গোপনীয়তা আর গোপন থাকবে না। সবই যদি হয়ে যায় প্রকাশ্য, জীবনের রহস্য থাকবে কী ভাবে? পৃথিবী এখন সেই দিকে যাচ্ছে, আপনার সমস্ত গোপনীয়তা রাষ্ট্রের কাছে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। আপনি রাষ্ট্রের নজরবন্দী হয়ে যাচ্ছেন কম্পিউটারে ইন্টারনেট নিয়ে বসে। ফেসবুকের সমস্ত আদানপ্রদানের রেকর্ড থেকে যাচ্ছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে। মহাশক্তিধরের নিকটে আপনার যাপিত জীবন খুলে যাচ্ছে। এই টেকনোলজি হিংসা ছড়ানোর জন্য অতি উপযুক্ত এক মাধ্যম। আবার এই প্রযুক্তি দূর কে নিকট করেছে। বন্ধু দিয়েছে কত। অজানাকে জানার পথ খুলে দিয়েছে কত! ভুবনগ্রাম হয়ে গেছে এই পৃথিবী, বন্ধুতার হাত প্রসারিত করেছে, নারীর মুক্তির একটি জায়গা হয়েছে, নারী তার কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছে এখানে। এই একুশ শতকে মানুষ যেমন তার মেধার শীর্ষে পৌঁছেছে, তেমনি মানুষ মনে মনে ফিরেছে মধ্যযুগীয় হিংসা আর সাম্প্রদায়িকতায়। আমাদের দেশ এ থেকে মুক্ত নয়। মুক্ত ছিল না কখনো। এখন সাম্প্রদায়িক হিংসা ক্রমশ তার দাঁত-নখ বের করছে। সমাজে তার ছায়া ঘনাইছে ক্রমশ।

সাহিত্যে এর ছায়া তো পড়বেই। টেকনোলজি যে ছায়া ফেলছে, তার ছায়া। সাম্প্রদায়িকতা, হিংসা, মধ্যযুগীয় নরহত্যা এখন নিত্য খবর। এই সংকট থেকে আমরা কি মুক্ত হতে পারব? উনিশ ও বিশ শতক ছিল স্বপ্নের শতক। স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ। মুক্তির স্বপ্ন। অর্জন করেছিল অনেক অধিকার। সবচেয়ে বড় অধিকার ছিল আট ঘন্টার কাজের অধিকার। কর্পোরেট শাসিত এই পৃথিবী থেকে শ্রমিকের আটঘন্টার কাজের অধিকার সুকৌশলে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ যে মুক্তির, তা ভঙ্গ হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টি তার ক্ষমতা থেকে সরে গেছে মানুষের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে যাওয়ার জন্য। আর সবকিছু দখল করার প্রবণতায়। অনেক অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। হ্যাঁ, সেজ নামক দেশের ভিতরে বিদেশ নির্মাণে কমিউনিস্ট চিন তো সবার আগে। সেই দেশ কেমন রাখে শ্রমিকের অধিকার তা আমাদের অজানা নয়। আমি বলছি আমাদের বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন যে স্বপ্ন নিয়ে কেটেছে, তা ক্রমশ মুছে যেতে লেগেছে বিশ শতকের শেষ দশক আর এই শতকের প্রথম দুই দশকে। আমরা যখন লিখতে আসি, আমাদের ভিতরে ছিল আদর্শ। আমি মানিকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, চেখভ পড়েছি, প্রেমেন্দ্র মিত্র পড়েছি, তলস্তয় পড়েছি, দস্তয়েভস্কি পড়েছি, পুশকিন, গোগোল। রুশ সাহিত্য আমাকে শিখিয়েছে লিখতে। লিখতে শেখার সঙ্গে কী লিখতে হবে তাও শিখেছি। সেই শেখা সমস্তজীবন লালন করেছি। নিজ ধর্ম ত্যাগ করিনি। ধর্ম অর্থাৎ আদর্শ। কিন্তু সেই পৃথিবী তো নেই। আদর্শবাদ অলীক। ধীরে ধীরে সমস্ত মুক্তচিন্তার জায়গা ছোট

হয়ে যাচ্ছে। আপনি ভেবে দেখুন আমাদের নদী, অরণ্য, পাহাড় দখল করে নিচ্ছে কর্পোরেট। আপনার দেশের উপর আপনার অধিকার হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

মনে করুন, সেই যে আরণ্যকের আদিবাসী রাজা দোবরু পান্না, রাজকন্যা ভানুমতী, তাদের ধনঝরি পাহাড়, তাদের বন... সমস্ত কিছু চলে গেছে রাসবিহারী সিং নামের রাজপুতের পৌত্রের দখলে। ঠিক তার নয়, সেই পাহাড়, অরণ্য লিজ নিয়েছে কর্পোরেট, রাসবিহারী সিং'এর নাতি তাদের এজেন্ট। আরণ্যক উপন্যাসে জঙ্গল মহলে নায়েব গিয়েছিল জমি বন্দোবস্ত দিতে। দরিদ্র ভারতবর্ষের এক চেহারা ফুটে উঠেছিল। কত অল্পতে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। বেঁচে থাকে। মানুষ কত প্রকৃতি মনস্ক। যুগলপ্রসাদ জঙ্গলে বৃক্ষ রোপণ করে। জমি বন্দোবস্ত দিয়ে ফিরে আসার সময় নায়েবের মনে হয়েছিল, সে নিজেই অরণ্য নিধনের সূত্রপাত ঘটিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু বহু বছর বাদে বিভূতিবাবুর দেশে কিন্তু সত্যই ধ্বংস যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। আমি কী করতে পারি। আমার অসমর্থন রেখে যেতে পারি। কোথায়? আমার লেখায়। মনে করুন, সেই অরণ্যজীবী মানুষগুলিকে মেরে মাটিতে পুতে দিয়েছে রাসবিহারী সিং'এর নাতি। মনে করুন ভানুমতীর কন্যা রূপমতী (উপন্যাসে নেই)র স্বামী জেল থেকে মুক্তি পেল শুধু এই শর্তে, পরদিন তারা ছেড়ে যাবে ধনঝরি পাহাড়ের পাদদেশ। তাদের জন্য সিমেন্ট ফ্যাকটরির কুলি লাইনে ব্যবস্থা হয়েছে। আর ভানুমতীর নাতনি, রূপমতীর কন্যাটি বড় হয়েছে। তার জন্যই তাদের পাহাড় গোড়ায় রাসবিহারী সিং'এর নাতির মোটর সাইকেল বুকবুক করে। অরণ্য পাহাড় না ছাড়লে তাকে তুলে নিয়ে যাবে যে কোনোদিন। কী হয়েছিল তারপর? বহু বছর বাদে এক তৃণগুল্মহীন উষর ক্ষেত্রে চন্দ্রালোকিত রাত্রে একটি মানুষের ছায়া দেখা যায়। সে অনেক বছর আগে এসেছিল জঙ্গল মহলে জমি বন্দোবস্ত দিতে। তারপর কত বছর কেটে গেছে। জমি পড়ে আছে মরুভূমি হয়ে। কর্পোরেট নিয়েছিল। তার আগে জমি সাফ করা হয়েছিল গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছেদ করে। লতাপাতা, বৃক্ষাদি, পাখ-পাখালি, কীট পতঙ্গ সমস্ত কিছু শেষ করে মাটিতে পুতে দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে মানুষ। আদিবাসী রাজা দোবরু পান্নার বংশধরদের। মূল্যবান আকরিকের সন্ধান পেয়েই বহুজাতিক সংস্থা এসেছিল। কিন্তু জমি দখল করে যখন তারা আকরিক উত্তোলন করে, দ্যাখে উঠছে শুধু ক্যালসিয়াম কার্বনেট, মানুষের হাড় মাটির ভিতরে ওই চুনা পাথর হয়ে পড়ে আছে। ফিরে যায় বহুজাতিক। চন্দ্রালোকে অশ্রুপাত করেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দেশের জন্য।

আমার নাটক দেখা, নাটকে জীবন দেখা

আমাদের আদি নিবাস, পূর্ববঙ্গের গ্রাম, সাতক্ষীরার কাছেই। ধূলিহর ধুরলের কথা তেমন মনে নেই। তবে বাড়ির একটা কামরায় নাটকের বা যাত্রার সিন থাকত গোটানো তা মনে আছে। সেই সময় নাটক বা যাত্রায় সিন থাকত। নদী, গ্রাম, শহর, তাজমহল, দুর্গ ইত্যাদি। যাত্রা কিংবা থিয়েটার হতো সমস্ত রাত ধরে। শেষ রাত বা মধ্যরাতে সকলে বাড়ি ফিরত। কাজকম্মো সেরে, গৃহবধূ সমেত পরিবার গিয়ে বসত থিয়েটার বা যাত্রার আসরে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে আমোদ। সেই গল্পে ভূমিহীন চাষাটি একদম পেছনে দাঁড়িয়ে, ডিঙি মেরে মেরে কী দেখল, কী দেখল না, সমস্ত রাত কাটিয়ে, বাজনা আবছা শুনে, ডায়ালগ একটু শুনে শুনে রাত পার করে দিল। দেখুক না দেখুক, আমোদ তো হলো। থিয়েটার শেষ হতে ভোর। সে চলল জমিতে। নিড়েন দেবে। সেই দেখা নিয়ে সে কতদিন বুঁদ হয়ে থাকবে। এই অল্পতে খুশি হওয়াই সাধারণের জীবন দর্শন। আর এও মনে হয়, থিয়েটারের দর্শনও তাই। থিয়েটারে মোটর রেসিং নেই, হেলিকপ্টারে করে খল নায়কের পালানো নেই, শতবার পোশাক বদলে নৃত্যগীত নেই, কিন্তু থিয়েটার হাউসফুল। হ্যাঁ, অনেক থিয়েটার দর্শক আনুকূল্য পায় না, সে তো বহু সিনেমাও লোকে দ্যাখে না। না, আমি সিনেমা থিয়েটারের তুলনামূলক আলোচনা করতে আসিনি। থিয়েটার সম্পর্কে আমার জ্ঞান তেমন নয়, সিনেমাও তেমন জানি না। দুটোই নিজের মতো করে দেখেছি অনেক। মনের টানে, নিজের প্রয়োজনে দেখেছি। দেখে ঋদ্ধ হয়েছি। আমার কাছে বই আর থিয়েটার, সিনেমা শ্রেষ্ঠ বিনোদন। বিনোদন শব্দে কোনো আপত্তি দেখি না। কেন না ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানুষের কাছে বিনোদনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। মারীচ সংবাদ, রাজরক্ত বা চাকভাঙা মধু আমাকে মোহিত করেছিল প্রায় বছর ৪৭-৪৮ আগে, প্রযোজনা অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছিল বলেই না বার বার দেখেছিলাম। আমার মনের অনেক চাহিদা আছে। সেই চাহিদা পূরণ করে থিয়েটার ও বই, এবং সিনেমাও। থিয়েটার হলো দৃশ্য কাব্য। আমি তার কথা বলতে চেষ্টা করব।

ছেলেবেলা কেটেছে দণ্ডীরহাট নামের একটি গ্রামে বেশ কিছুদিন, পরে বেলগাছিয়া। দণ্ডীরহাট গ্রামটি ছিল থিয়েটার আর খেলা, দুয়েই পাগল। পাশে একটি বিল জমি পেরিয়ে ধলতিথা। বিভূতিবাবুর পথের পাঁচালী উপন্যাসে ধলতিথার কথা আছে। ধলতিথা পেরিয়ে পানিতরে তাঁর প্রথম বিবাহ। থাক, দণ্ডীরহাট গ্রামের থিয়েটারের কথা বলি। আমি তখন কত হবো, বছর সাত-আট, মা-কাকিমাদের সঙ্গে গিয়ে প্রথম অসামান্য এক থিয়েটার দেখি, ডি.এল.রায়ের শাজাহান। শাজাহানের ভূমিকায় ছিলেন আমাদের গ্রামের অতিমান্য এবং শ্রদ্ধেয়জন, সুধীর বসু। তিনি ওই গ্রামের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাঁর ভাই সূরথবাবু ছিলেন স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার, থিয়েটার সাহিত্যে উৎসাহী। সেই শাজাহান নাটকে জাহানারার ভূমিকায় ছিলেন মমতা চট্টোপাধ্যায়, সেই আমলের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী। দারার ভূমিকায় শ্যামল ঘোষ, দিলদার মনোজ মিত্র। মনোজ মিত্রই হয়তো এই আয়োজন করেছিলেন। মনে আছে শাজাহান এবং জাহানারার হাহাকারের কথা, দূরে তাজমহলের মাথায় পূর্ণচন্দ্র। সিন আর গ্লোব আলো দিয়ে তা ফোটানো হয়েছিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কয়েকদিন কেটেছিল। যাঁকে নিত্য দেখি তিনি কীভাবে মঞ্চে শাজাহান হয়ে গেলেন। সেই প্রথম দেখা এখনো অবিকল মনে আছে। আমাদের ওই গ্রামে তরুণ ভট্টাচার্য নামে এক যুবক ছিলেন থিয়েটার আর বই পাগল। আমি ক্লাস সিক্স এবং সেভেন ওই গ্রামের ইস্কুলে পড়েছিলাম। তারপর পালিয়ে কলকাতা চলে আসায় কলকাতার বাসা বাড়ি বেলগাছিয়ায় ফিরে এলাম। কিন্তু ঐ দুবছরেই তরুণ'দা আমাকে থিয়েটার আর বই পড়ায় দীক্ষিত করেন। দণ্ডীরহাট গ্রামের বসু জমিদারদের রেখে যাওয়া বাড়িতে ছিল বড় এক পাঠাগার। সেই পাঠাগার ছিল তরুণ'দার দায়িত্বে। এ ব্যতীত তিনি ছিলেন পোস্ট অফিসের ডাক পিয়ন। চিঠি বিলি করতেন। সাব পোস্ট অফিসের অনেক কাজই করতেন। চিঠিতে সিল মারা, ডাকের থলেতে ভর্তি করা।

হরকরার চিঠি রিসিভ করা... সব। আড়াইটে অবধি হয়তো এই কাজ, তারপর লাইব্রেরি। আমাকে হেমেন্দ্রকুমার রায় থেকে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রবার্ট ব্লেক, অনুবাদে অলিভার টুইস্ট, এ টেল অফ টু সিটিজ, হ্যাঞ্চব্যাক অফ নতরদম...। কত বই দিয়েছেন। তাঁর উচ্চাশা ছিল বড় অভিনেতা কিংবা থিয়েটার পরিচালক হবেন। গ্রামের বালকদের নিয়ে প্রায়ই তিনি থিয়েটারের আয়োজন করতেন। আমার প্রথম অভিনয় সুনির্মল বসুর কিপ্টে ঠাকুরদা নাটকে। ঠাকুরদা হয়েছিলেন তরুণদা।... ... ...। নিজেরাই স্টেজ বেঁধেছি হরিতলায়, হ্যাজাগ ভাড়া করা হয়েছে চাঁদা তুলে। রাত আটটায় অভিনয় আরম্ভ। মা-কাকিরা হেরিকেন নিয়ে থিয়েটার দেখতে হাজির। হঠাৎ হঠাৎ থিয়েটারের নেশা জাগত। পাঠ্য পুস্তক কিশলয় বা পাঠসঞ্চয়নের নাট্যাংশ নিয়ে নিজেরা রিহার্সাল আরম্ভ করতাম। অমল ও দইওয়ালা, হলদিঘাটের যুদ্ধ এসব আমরা বালকেরাই করতাম। দুটি পরপর অভিনয় হচ্ছে। এমন নাটক পাগল গ্রাম আর দেখিনি। আমি তো সমস্ত জীবনে কম গ্রাম ঘুরিনি। কোথাও দেখিনি। কিশোর বালকেরা থিয়েটার করছে, তা দেখতে রাতের বেলা গাঁ ভেঙে পড়ছে প্রায়, আশ্চর্য লাগে এখন। আমিও ছেলেবেলায় অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। প্রায়ই নেমে পড়তাম নাটক নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের প্রহসন ছাত্রের পরীক্ষায় ছাত্র হয়েছি, আরো কী কী যেন অভিনয় হয়েছিল। হ্যাঁ, তরুণদাকে নিয়ে আমি একটি উপন্যাস লিখেছিলাম, মালতী মাধব। ডাকপিয়ন তরুণদা ছিলেন সেখানে অলৌকিক হয়ে। বেনামে চিঠি লিখে ডাকপিয়ন ডাকঘরের সিল মেরে সেই চিঠি যাকে গোপনে ভালবাসতেন, তার কাছে পৌঁছে দিতেন।

কলকাতায় তখন রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ইস্কুলে পাড়ায় রবীন্দ্রনাটক করার রেওয়াজ ছিল। বাড়ির ছাদেও মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হতো ছাত্রের পরীক্ষা, পেটেও পিঠে...। ইস্কুলে আমি মুকুট নাটকে হয়েছিলাম ধুরন্ধর। প্রাইজ পেতে পেতে পাইনি। রাজধর যে হয়েছিল, সে পেয়েছিল। পরিবারে দেখেছি অগ্রজ নাটক নিয়ে থাকেন। ঠাকুরদাকে নিয়ে মৃত্যুর চোখে জল নাটক লিখে তাঁর নাম হয়েছে। তখন ক্লাস ফাইব, আনন্দ- বাজারে নবনাট্য আন্দোলন নিয়ে লিখতেন প্রবোধবন্ধু অধিকারী। দাদাকে নিয়ে লিখেছিলেন তিনি। ছবি সমেত সেই লেখা বেরিয়েছিল, পরম বিস্ময়। সুতরাং আমি নাটক লিখব এবং অভিনেতাও হবো, এই ছিল সুপ্ত বাসনা। ক্লাস এইটে ঋতায়ন নাট্যদলের 'নীলা' নাটকে আমি বড় একটি রোল করেছিলাম। আনন্দ। আনন্দবাজার নাট্য সমালোচনায় লিখেছিল, 'বাবুজি মিত্রের আনন্দ নিরানন্দ নয়। 'বাবুজি' আমার ডাক নাম। নীলার দুটি অভিনয়ে আমি ছিলাম, মিনার্ভা ও থিয়েটার সেন্টারে। মিনার্ভায় অভিনয় করতে গিয়ে দেখেছিলাম কল্লোল নাটকের জাহাজের সেট। এখন মনে পড়লে শিহরিত হই। আমি কল্লোল দেখিনি। কত নাটক দেখিনি, কত বই পড়িনি, এমন তো হয়েই থাকে। ক্লাস ইলেভেনে 'বিনি পয়সার ভোজ' – অক্ষয়বাবুর সেই স্বগত কথনে আমি চরিত্র বসিয়ে নাটক বানিয়ে মঞ্চায়িত করলাম বন্ধুদের নিয়ে। আমিই অক্ষয়বাবু। এরপর কলেজ। তখন গল্প লেখা চলছে আর নাটকও। পাড়ার একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় নাটক নিয়ে নামলাম, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর একাঙ্ক। আমি অভিনেতা এবং নির্দেশক। কিছু হলো না। খেলনা পিস্তলকে রিভলবার বানাতে আলকাতরা দিয়ে কালো করেছিলাম। সিল্কের পাঞ্জাবির পকেটে সেই পিস্তল আটকে গিয়েছিল। লাইটম্যান মঞ্চটাকে ভুতুড়ে করে দিয়েছিল। চরিত্রদের দেখাই যাচ্ছিল না। কলেজ ছিল স্কটিশ চার্চ। নাটকে সাহিত্যে সেই কলেজের কত সুখ্যাতি। আমি কেমিস্ট্রি অনার্স। যে উদ্দেশে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, তা সফল হলো না। বার্ষিক অনুষ্ঠানে ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' অভিনয় হবে, গেলাম যদি একটা চান্স হয়। পেলাম না। গল্প দিলাম কলেজ ম্যাগাজিনে, নির্বাচিত হলো না। নাটক আর গল্প লেখার জন্য স্কটিশে ভর্তি হয়ে কোনোটাতেই সুবিধে হলো না। আর রেজাল্টও খারাপ হলো। স্কটিশ চার্চ কলেজে তখন কেয়া চক্রবর্তী পড়াতেন। দূর থেকে দেখতাম। কবি পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল ও নিশীথ ভড়ের তখনই খুব নাম। এত অতি সাধারণ হয়ে কলেজ ত্যাগ করেছিলাম যে কলেজের শতবর্ষ উৎসবেও আমার ডাক আসেনি। কিন্তু আমার মাথায় নাটক আর সাহিত্যের ভূত হয় তো স্কটিশ চার্চ কলেজই দিয়েছিল। বাংলাদেশ নিয়ে তরুণ সান্যালের বক্তৃতা এখনো স্মৃতিতে অমলিন। কত ডিবেট, সাহিত্যের অধ্যাপক- দের সেমিনার, আমি রসায়নের ছাত্র,

একাই শুনতাম। সত্তর দশক। নক্সাল আন্দোলন, জেলখানায় সহপাঠী বন্ধুরা, বাংলা নাটক তখন প্রতিবাদের মুখ। আমি তখন থেকে নাটকের পোকা। নাটক দেখছি সুযোগ পেলেই। মনে পড়ে এবং ইন্দ্রজিৎ দেখতে দুপুরে মুক্তাঙ্গনে গিয়ে টিকিট কেটেছি, সময়ে এলে যদি টিকিট না পাই। চারঘন্টা অপেক্ষা করেছি একা একা। তারপর নাটক দেখে ২ নম্বর ডাবল ডেকার বাসে চেপে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। তখন টিউশনি ভরসা। সেই সময়ে আমি নাট্যরূপ দিলাম চেকভের গল্প। মুখোস। সেই নাটক সূত্রে এক বন্ধু হলো, তার নাম গৌতম লাহিড়ী। পাইকপাড়ায়, দু'নম্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে থাকতেন, গণেশ মুখোপাধ্যায়ের নাট্যদল শ্রীমঞ্চে অভিনয় করতেন। গৌতম আমার ওই চেকভের গল্পের নাটক চেষ্টা করলেন মঞ্চে আনার। হলো না। কিন্তু সে ছিল থিয়েটার নাটকে নিবেদিত প্রাণ। তার সঙ্গে আমার নাটক দেখা শুরু হলো। সেই সময়, আমাদের বাংলা নাটকের স্বর্ণ যুগ। বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তর পরের প্রজন্ম প্রবেশ করেছেন, তাঁদের পরের প্রজন্মও। উত্তর কলকাতায় রঙ্গনা থিয়েটার হল হলো। আর পুরোন ব্যবসায়িক থিয়েটার তখনো রমরম করে চলছে। জনপ্রিয় সাহিত্যের নাট্যরূপ দিয়ে নাটক হতো বিশ্বরূপা, স্টার, রংমহল থিয়েটার হলে। এখানে চলচ্চিত্রের প্রবাদ প্রতিম অভিনেতারা অভিনয় করতেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়দের আমি এখানেই দেখেছি অভিনয় করতে। উত্তমকুমারের শ্যামলী নাটকের কথা শুনেছি, তখন আমাদের খুব কম বয়স, দেখিনি। হাতিবাগানের থিয়েটার পাড়া ছিল আমাদের সত্যিকারের গর্ব। শুনুন এক কথোপকথন, বাংলাদেশের খুলনা জেলার এক গৃহবধূ আমার ফেসবুক ফ্রেন্ড। দীপালি মণ্ডল। তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দাদা আপনার বাড়ি কোথায়?

উত্তর কলকাতায়।

কলকাতার যেখেনে খুব থিয়েটার হয়, রংমহল হল কি কাছে?

হ্যাঁ, কেন?

আপনার ভাই, থিয়েটার পাগল, সে বলে আবার একবার গিয়ে হাতিবাগানে থিয়েটার দেখবে।

সেই ব্যক্তি আমারই বয়সী। অনেক বছর আগে কলকাতায় এসে একবার রংমহল থিয়েটারে কোনো একটি নাটক দেখেছিলেন। এখনো আশা করে আছেন কলকাতায় এসে দেখবেন জহর রায়, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়দের কমেডি।

আমাদের বাড়িতে অনেক নাট্যপত্র আসত। এপিক থিয়েটার, গন্ধর্ব, সুত্রধর, নাট্য পাক্ষিক, বিংশ শতাব্দী... আরো কী কী যেন। কোন একটা সময়ে আমি এপিক থিয়েটার শারদীয় সংখ্যায় পড়ি উৎপল দত্তের মানুষের অধিকারে। সে এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। নাট্যপত্রগুলি আমি পড়তাম। আমাদের বাড়িতে ছেলেবেলা থেকেই নাটকের লোক আসতেন। পার্থপ্রতিম চৌধুরীকে ছেলেবেলা থেকে দেখেছি। যখন কলেজে সেই সময়ে বোধ হয় 'চাকভাঙা মধু' লেখা হয়। একদিন পার্থদা এলেন। সমস্ত রাত তাঁরা হয়তো সেই নাটক পাঠ আর আলোচনা করেছিলেন। আমার প্রবেশাধিকার নেই। সেই নাটক এক্ষণ পত্রিকায় ছাপা হলে আমি পড়লাম। সঙ্গে হাসান আজিজুল হকের 'জীবন ঘষে আগুন'। সেই নাটক করলেন থিয়েটার ওয়ার্কশপ, বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, মানিক রায়চৌধুরী, রাম মুখোপাধ্যায় এবং মায়া ঘোষ। মানিক রায় চৌধুরীর কথা খুব মনে পড়ে। খুব শক্তিমান অভিনেতা ছিলেন। অল্প বয়সে চলে গেছেন। 'পাঁচু ও মাসি' নাটকে মানিকদার অভিনয় এখনো মনে আছে। 'চাকভাঙা মধু'তে জোতদার অঘোর ঘোষের ছেলে শঙ্করও অসামান্য। থিয়েটার ওয়ার্কশপ 'চাকভাঙা মধু'র আগে করেছিল মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত'। 'রাজরক্ত' দেখা ছিল এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। মোহিত চট্টোপাধ্যায় আমার প্রিয় নাটককার। মৃত্যু সংবাদ, ক্যাপ্টেন হুররা তো পাঠ্য নাটক। নক্ষত্র করেছিল এই দুই নাটক। শ্যামল ঘোষ ছিলেন কারিগর। কত কম বয়সে মোহিতদার কিমিতিবাদী নাটক 'গন্ধরাজের হাততালি' দেখেছিলাম, ঋতায়ন করেছিল এক রবিবার সকালে রংমহলে। সত্তর দশক বিদ্রোহের দশক। নাটকের দশক। বিদ্রোহ ছিল সেই সব নাটকেও। চেতনার মারীচ সংবাদ, ও লু সুনের গল্প অবলম্বনে জগন্নাথ নাটক নিয়ে এসেছিল বাংলা নাটকে নতুন বাঁক, বিশেষত

মারীচ সংবাদ। সাম্রাজ্য বাদের বিরুদ্ধে এই নাটক সেই সময়কে চিহ্নিত করেছিল। কী সমস্ত নাটক দেখেছি, পিপলস লিটল থিয়েটারের টিনের তলোয়ার, তীর, মধুসূদনের প্রহসনে উৎপল দত্ত, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ... অসিত বসু করেছিলেন 'কলকাতার হ্যামলেট' চাকভাঙা মধুও ছিল বাংলা নাটকের এক বাঁক। এর পর থিয়েটার ওয়ার্কশপ দুটি নাটক নরক গুলজার, অশ্বত্থামা...। আর নতুন হল রঙ্গনায় নান্দীকার চেকভ থেকে মঞ্জরী আমের মঞ্জরী, গ্রেট অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়... জমি বাগান কিনে নিতে নিতে উরুতে চড় মারতে মারতে উল্লাস প্রকাশ...। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখা এই জীবনের পরম সৌভাগ্য। শের আফগান, ভালো মানুষ, তিন পয়সার পালা, যখন একা, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, খড়ির গণ্ডী... তখন গোটা কলকাতা নান্দীকার এবং বিদেশী নাটকে ভেসে গিয়েছিল। দূর মফস্বল থেকেও মানুষ আসত নাটকে। চারদিকের ভয়ানক অবস্থায় নাটকের ভিতরেই যেন পরিত্রাণ খোঁজা। অজিতেশ, কেয়া চক্রবর্তী, রুদ্রপ্রসাদ...। তিন পয়সার পালা এবং ভালোমানুষ নাটকে কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় তো ভুলিনি। শান্তা এবং শান্তা প্রসাদ। নান্দীকারের হে সময় উত্তাল সময় কিন্তু তেমন সফলতা পায়নি, দেখেছিলাম। পরে অজিতেশ নান্দীমুখ নাট্যদল করে তলস্তয়কে মঞ্চে এনেছিলেন, পাপ পুণ্য। গ্রেটনেস বোঝা গিয়েছিল সেই নাটকেও। কেয়া চক্রবর্তীর অভিনয় সুষমার কথাও এখন মনে পড়ে। বছর ৪৫ আগের কথা সব। বিভাস'দা থিয়েটার ওয়ার্কশপ ছেড়ে অন্য থিয়েটার করলেন, মৈমনসিংহ গীতিকা নিয়ে মাধব মালঞ্চী কইন্যা করেছিলেন আটের দশকে।

আমি 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটক দেখিনি, পড়েছি। নাটক পাঠ আমার পুরনো অভ্যাস। রক্তকরবী, ডাকঘর ও বিসর্জন আমি মাঝে মধ্যে পড়ি সাহিত্য পাঠের মতো করেই। আমার প্রিয় পাঠ চাঁদ বণিকের পালা। কতবার পড়েছি। পড়েছি এবং ইন্দ্রজিৎ, যা নেই ভারতে, অশ্বত্থামা, কিনু কাহারের থেটার, পরবাসও। মনোজ মিত্রের নাটকে সাহিত্যগুণ আছে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটক পড়তে হয়। মধুসূদনের প্রহসন। দেবাশিস মজুমদারের 'অসমাপ্ত' দেখে মনে হয়েছিল একটি ছোটগল্প। 'তখন বিকেল' দেখে সেই উপলব্ধি হয়েছিল। কবিতা। নাটকের গল্প, ব্রাত্য বসুর সিনেমার মতো, মনে হয়েছিল উপন্যাস। ফিরে যাই সেই সত্তরে, আমি নাটক লিখব, অভিনয় করব, এইসব ভাবতে ভাবতে চাকরি নিয়ে দূর মফস্বলে চলে যাই। ধীরে ধীরে নাটক লেখার ইচ্ছে অস্তমিত হয় নিজের ভিতরে। গল্প লিখতে মন দিই। কিন্তু কলকাতায় এলে নাটক দেখা বন্ধ হয়নি। নাটক মূলত সংলাপ নির্ভর। কিন্তু মনে হয় সংলাপের ভিতরে কোথাও কি গভীর এক নীরবতাকে রক্ষা করা যায় না? সংলাপ যেন কথা কথা আর কথা না হয়। কথা যেন হল্লা না হয়ে ওঠে। নাটক লিখিনি, কিন্তু আমার গল্পে সংলাপ থাকে অনেক। সংলাপে সংলাপে আমি গল্প লিখেছি। সাতের দশকে সাজানো বাগান তো কিংবদন্তীর মতো হয়ে গেছে। এই সময়ে বালুরঘাটে বসে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় করলেন অভিজিৎ সেনের গল্প নিয়ে নাটক দেবাংশী, মহাশ্বেতা দেবীর গল্প নিয়ে জল। আমি কোন নাটক ছেড়ে কোন নাটকের কথা বলব?নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত করেছিলেন, প্রেমচাঁদের গল্প নিয়ে দানসাগর। দেবাশিস মজুমদারের নাটক। মনে আছে। শাঁওলি মিত্রর একক অভিনয়ে নাথবতী অনাথবত। মহাভারতের অসামান্য এক বিনির্মাণ ছিল তা। নয়ের দশকে দায়বদ্ধ, দুই হুজুরের গল্প চন্দন সেনের নাটক, বিভাস চক্রবর্তী করেছিলেন শ্বেতসন্ত্রাস... আসলে আমার নাটক দেখা সুখস্মৃতিতে পূর্ণ। মনে পড়ছে উইংকিল টুইংকিল, ব্রাত্যর নাটক, দেবেশের নির্দেশনা। ওই নাটক একটি বাঁক ছিল। স্থবির সময়ে আঘাত ছিল। ভাল নাটক দেখেছি অনেক। লিস্ট করতে গেলে দীর্ঘ হয়ে যাবে । আর সেই ভাল নাটকের দিন এখনো রয়েছে। সাম্প্রতিক নাটকের তালিকাও দীর্ঘ। আমি বলছি বিজয় তেন্ডুলকারের নাটক কন্যাদানের কথা। জীবনের এক আশ্চয ভাষ্য তা। অভিনয়ের শীর্ষে পৌঁছন এখানে ব্রাত্য, মেঘনাদ আর...। সাম্প্রতিক নাটকের ভিতরে শান্তিপুরের এক নাট্যদলের নাটক গন্ধজাল যেমন আছে, আছে মিনারভা রিপারটরির দেবী সরপমস্তা, আছে ফাগুন রাতের স্বপ্ন, সিনেমার মতো, বোমা, মুম্বই নাইটস, তুঘলক, রক্তপুষ্প...। ব্রাত্য, কৌশিক, দেবেশ, অর্পিতা, তরুণ প্রধান, দেবাশিস রায়, তাঁদের আগে কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রের কিশোর সেনগুপ্ত..., রস নাটক

করেছেন কৌশিক কর..., অর্পিতা আর সুজন মুখোপাধ্যায়কে দেখেছি, 'আপাতত এইভাবে দুজনের দেখা হয়েছিল'। আলাদা নাটক। অনাটকীয় নাটক। এমনি বহুজন থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ...কত অভিনেতা অভিনেত্রী, পরিচালক, গ্রিনরুমের ভিতরে থাকা নাট্যকর্মী, এইসব নিয়ে থিয়েটার। সদর এবং মফস্বল দুইই এখন সক্রিয়। বিলাসীবালা করেছেন আশিস দাস, কর্নেল'কে কেউ চিঠি লেখে না, আশিস চট্টোপাধ্যায়। এখানে আলস্যের কোনো জায়গা নেই। যিনি গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, তিনি আসলে অলস এক ব্যক্তি। তাঁর দ্বারা নাটক হয় না। কিন্তু নাটকে তাঁর আগ্রহ প্রবল, বাড়িতে তো নাটক ছাড়া কথা নেই, সেই মৃত্যুর চোখে জল থেকে। আমাদের ঠাকুরদা ওই নাটকের বঙ্কিম। আমি যে লিখিনি তা নয়। নিজের গল্প কুলছুমের হাত ও আসনবনি রেডিও নাটক করে দিয়েছিলাম। টিভির স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম কয়েকটি গল্পের। আমার উপন্যাস এবং গল্প নিয়ে নাটক হয়েছে। আমি এতে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছি। কেন না জীবনে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখে বসে আছি, কেউ নেননি, মানে হয়নি।

আমার উপন্যাস 'অশ্বচরিত' কল্যাণীর কিশোর সেনগুপ্ত মঞ্চে আনেন। উনি যখন টেলিফোনে প্রস্তাব দেন, আমি বলেছিলাম হয় না। কী করে হবে? উনি ভানু দাস ছন্দক আর ঘোড়া কন্থকের কাহিনি মঞ্চে এনে আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন। অশ্বচরিতের পর কিশোর ধ্রুবপুত্র করতে চেয়েছিলেন। নাটক লিখে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি হয়নি। সেই সময় ধ্রুবপুত্রের একটি বড় আলোচনা বেরিয়েছিল চতুরঙ্গ পত্রিকায়। লিখেছিলেন কুমার রায়। কোনো এক পয়লা মে একাডেমিতে বহুরূপীর জন্মদিনে আমাকে যেতে বলেছিলেন অমিয় হালদার। তিনি তখন বহুরূপীর সঙ্গে জড়িত। অভিনেতা। আমি গিয়ে কুমার রায়কে প্রণাম করতে তিনি আমার হাত ধরে বলেছিলেন, তিনি তাঁর শেষ প্রযোজনাটি করতে চান ধ্রুবপুত্র নিয়ে। আমাকে নাটক লিখে দিতে বলেছিলেন। লিখেছিলাম কয়েকটি দৃশ্য, কুমারদার বাড়িতে শোনাতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম হয়নি। হবে না। না, আমি তখন বুঝেছিলাম নাটক এক আলাদা আর্ট ফর্ম। আমি তা পারি না লিখতে। আর সব উপন্যাসে নাটক হয় না। ধ্রুবপুত্র হয়নি। হ্যাঁ, তখন হয়নি। পরে ২০১৭ সালে আবার কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র সেই উপন্যাস মঞ্চস্থ করেন। কিশোর সেনগুপ্ত। ধ্রুবপুত্র চমৎকার প্রযোজনা।

মেঘনাদ ভট্টাচার্য এক রাতে টেলিফোন করে বলেছিলেন 'বালিকা মঞ্জরী' নাটক করতে চান। তখন ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ওই গল্প যে নাটক হতে পারে আমি ভাবিনি। ওঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম টেলিফোনে। উনি নিরস্ত না হয়ে তো করলেন। তারপরেও আবার আবার। মেঘনাদ ভট্টাচার্য যে নাটক কটি করেছেন, প্রতিটি আমার বাড়িতে এসে শুনিয়েছেন। বালিকা মঞ্জরী বা পিঙ্কি বুলি যে কতবার পড়া হয়েছে। ইন্দ্রাশীস লাহিড়ী নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ছমাস আটকে ছিল সেই নাট্য রূপায়ন। মেঘনাদের সঙ্গে দেখা এক অনুষ্ঠানে। জিজ্ঞেস করলাম, হবে না তাহলে? উনি বললেন, হবে। আপনার মতামতও চাই। একটা গিট ছাড়াতে হবে। আমার বাড়িতে এলেন তিনি। পড়া হলো নাটক। আমি আমার মতামত জানিয়ে জড়িয়ে গেছি নাটক নির্মাণে। দামিনী হে নাটক বা পাসিং শো-নাটকেও একই ব্যাপার। তবে দামিনী হে নাটকে একটি গল্প নয়, আমার অন্য গল্প ও তার সংলাপ এসে মিশেছে। আর একটি উপাদান নাট্যকার চন্দন সেন নির্মিত। ফোটোগ্রাফার বিডিও এবং ঐ বিষয় আমার গল্পে ছিল না। আমার গল্পের বাইরে। কিন্তু তা বাদে আমার অন্য গল্পের সংলাপও এই নাটকে ব্যবহৃত। নাটককার, পরিচালক আমাকে এত পড়েছেন ভেবেই আমি রোমাঞ্চিত। সায়ক এখন অবধি যে শেষ নাটকটি প্রযোজনা করেছে, তা পুনরুত্থান উপন্যাসটি নিয়ে। ২০১৮-র প্রযোজনা। এই ধরণের উপন্যাস নিয়ে নাটক মঞ্চে আনার দুঃসাহস মেঘনাদ ভট্টাচার্যই দেখাতে পারেন। ২০১২ সাল নাগাদ নাটককার অভিনেতা নির্দেশক ব্রাত্য বসু তার ব্রাত্যজন পত্রিকায় আমাকে একটি নাটক লিখতে বলেন। লিখেছিলাম 'শেষ পাহাড় অশ্রুনদী'। এই নাটক পরে অনেক পরিমার্জনা করেছি। ২০১৮-র ডিসেম্বরে কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রর নাট্যোৎসবে করিম- পুরের নাট্যদল সেই নাটক 'অশ্রুনদী' অভিনয় করেছে। আরো নানা উৎসবে করছে। একই নাটক শেষ পাহাড় নামে বেঙ্গালুরুর স্মরণিক নাট্যদল করছে সায়নদেব ভট্টাচার্যর নির্দেশনায়।

নাটক আমাদের জীবনে জড়িয়ে থাকে সবসময়। কবিতা গল্পও। চিত্রকলাও। গান। বাজনা। কিন্তু এর ভিতরে নাটক থাকে বেশি জড়িয়ে। অভিনয় তো করতেই হয় প্রতি পদক্ষেপে। যাপিত জীবনে অভিনয় করতে হয়, মিথ্যে বলতে হয়। জীবন তো অভিনয়ে, অভিব্যক্তির বৈচিত্রে পূর্ণ। তাইই মঞ্চে আসে। কিন্তু সত্যই কি তাই? একেক সময় তা অন্য রকম হয় না কি? অভিনয় করতে করতে ‘পরবাস’ নাটকের গজমাধব শেষে তো নিজের নিরালম্ব রূপ প্রকাশ করে ফেলে সত্য উচ্চারণ করে। নাটক এখন নাটক নয়, জীবন ভাষ্য। অভিনয় নয়, সত্য কথন। আর এই সত্য কত নিরাভরণ। চাঁদ বণিকের পালা পড়তে গিয়ে তা মনে হয়। ডাকঘর পড়তে গিয়ে বন্দী বালকের ভিতরে সভ্যতাকে বন্দী দেখি। কিন্তু একটা কথা ঠিক, সব শেষে তা বুঝি, না বুঝি, আমার কাছে আমোদ। বিভূতিবাবুর সেই চাষার মতো আমি তুচ্ছতেই বিশালত্বকে টের পাই। অভিনেতার অভিব্যক্তি আর সংলাপ উচ্চারণ অনেক কল্পনার দুয়ার খুলে দেয়। খুলে দিয়েই অভিনেতা চিরকালের মতো মাথার ভিতরে আসন পেতে বসেন। উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মায়া ঘোষ। অরুণ মুখোপাধ্যায়। মনোজ মিত্র। মেঘনাদ ভট্টাচার্য। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত। ব্রাত্য বসু। বাংলা মঞ্চ চিরদিনই বড় অভিনেতাকে বরণ করে নিতে পেরেছে।

মেঘনাদ ভট্টাচার্যকে নিয়ে দু'এক কথা

গত শতকের ৯০ এর দশকের প্রথম দিকে দায়বদ্ধ দেখে আমি মেঘনাদ ভট্টাচার্য মশায়ের অনুরাগী হয়ে গিয়েছিলাম। যেমন অভিনয় তেমনি নাটক। তারপরেই বোধ হয় দুই হুজুরের গপ্পো দেখেছিলাম। কিন্তু আলাপ ছিল না। আমি নাটক দেখি, নাট্যকলার অনেক মানুষকেই পারিবারিক সূত্রে চিনতাম, কিন্তু মেঘনাদ ভট্টাচার্যকে চিনতাম না। আলাপ হয়নি। তিনি প্রতিভাবান, সুখ্যাত এবং বিখ্যাত। পরে জেনেছি তাঁর জীবনের অনেকটা অংশ কেটেছে আমার বসতির কাছে। পাইকপাড়ায় সায়ক নাট্যদলের জন্ম। মেঘনাদ নাকি এই অঞ্চলের নামী ফুটবল ক্লাব যুগের যাত্রী ফুটবল দলে খেলতেনও। পরে আমাকে বলেছেন আমার বন্ধু, অকাল প্রয়াত নাট্যপাগল অভিনেতা গৌতম লাহিড়ীকেও চিনতেন। এই মেঘনাদ ভট্টাচার্য এক রাত্তিরে ফোন করলেন। কোন বছর, ২০০৮ হবে, দিনক্ষণ মনে নেই। তিনি আমাকে বললেন আমার গল্প 'বালিকা মঞ্জরী' নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করবেন। আমি অবাক। বললাম, এই গল্প কি নাটক হয়, আমার গল্প তো নাটকীয় নয়, এর কোনো নাটকীয়তা নেই, নাটকীয় অন্তিম নেই। কী করে হবে? একই কথা ২০০০ সালে কিশোর সেনগুপ্তকে বলেছিলাম, তিনি ফোন করেছিলেন 'অশ্বচরিত' উপন্যাস মঞ্চস্থ করবেন সেই কথা নিয়ে। পরে যা ঘটেছে তাতে আমি বুঝেছি, কোন গল্প বা উপন্যাস নাটক হয়, কোনটি হয় না, তা আমি জানি না, নাটকের লোক জানেন। মেঘনাদ ভট্টাচার্য সেদিন আমাকে বলেছিলেন, নাটক হয় কি হয় না, সেইটি বুঝেই তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন। বালিকা মঞ্জরী গল্প নিয়ে নাটক লিখেছিলেন প্রয়াত ইন্দ্রাশিস লাহিড়ী। তাঁর সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখা হয়নি। মেঘনাদ ভট্টাচার্যর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। তারপর তিনি আমার বাড়ি আসতে লাগলেন কয়েকটি কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে। পড়া হতে লাগল। আমি আমার মতামত দিতে লাগলাম। এক একদিন এমন হয়েছে মেঘনাদ ফোন করলেন ইন্দ্রাশিসকে। বললেন কোনো দৃশ্য নিয়ে আমার প্রস্তাব। এমনি করে করে নাটক লেখা এবং পাঠ চলতে থাকে। অর্ধেক হলো। মানে বিরতি অবধি। তারপর দীর্ঘ ছ-মাস মেঘনাদ নিশ্চুপ। যোগাযোগ নেই। মনে হতে লাগল শেষ অবধি পারলেন না মেঘনাদ। সেই সময়ে দেখা সল্টলেকের ই.জেড.সি.সি-তে। আমি বললাম তাহলে হচ্ছে না বালিকা মঞ্জরী। তিনি বললেন, আমার বাড়ি আসবেন, একটি জায়গায় আটকে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে। তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। এলেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হলো। জট ছাড়ল। তারপর বালিকা মঞ্জরী গল্প মঞ্চে এল 'পিঙ্কি বুলি' নামে দুই কন্যার গল্প হয়ে। এবং সফল। আমি মিনার্ভা থিয়েটারে একদিন সকালে একটি নিভৃত মঞ্চায়ন দেখতে গেলাম। জনা তিরিশ কি তার একটু বেশি নির্বাচিত দর্শক। নাটক দেখতে দেখতে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। দুই কিশোরী কন্যাকে দিয়ে যে অভিনয় করিয়েছিলেন মেঘনাদ তা যাঁরা ঐ নাটক দেখেছেন, অনুধাবন করতে পারবেন। আর বিরতির দৃশ্যটি বাংলা থিয়েটারে চিরকালীন। অমন অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য আমি আর দেখিনি যেন। একা একা গ্রাম্-বালিকা বুলি ইস্কুল ড্রেস পরে মঞ্চ দাপিয়ে দর্শকাসন অধিকার করে নেয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম নির্দেশকের কল্পনার বিস্তার দেখে। নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়েছে। বুলিকে আমি যেভাবে লিখেছিলাম বালিকা মঞ্জরী গল্পে মেঘনাদ যেন তারও অধিক কিছু করতে পেরেছিলেন নাটকে। নাটক যৌথ শিল্প নিশ্চয়। নাটককার, নির্দেশক, অভিনেতা, আলোক সম্পাত-শিল্পী, মঞ্চ শিল্পী - আরো অনেককে নিয়ে নাটক মঞ্চে আসে। কিন্তু নির্দেশকের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। নির্দেশক যেমন ভাববেন, কল্পনা করতে চাইবেন, তেমন ভাবেই আলোর কথা, আবহর কথা, মঞ্চের কথা ভাবেন শিল্পীরা। মেঘনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দশ বছর। দশ বছর তাঁর সঙ্গে মিশেছি খোলামনে। আমি আমার কথা বলেছি,তিনি মন দিয়ে শুনেছেন। যদি মনে হয় আমার কথার ভিতরে কোনো মৌলিক উপাদান আছে, তিনি তা গ্রহণ করেছেন। না হলে নিজের মতে স্থিত থেকেছেন। পিঙ্কি বুলি নাটকের পর মেঘনাদ করেন

ধ্রুবতারা। উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নাটক। আমার খুব ভাল লেগেছিল নাটক এবং প্রযোজনা। নাটকটি মধ্যবিত্ত চেতনায় ঘা দিয়েছিল মনে হয়। দর্শক ভালভাবে নেননি। আমার এখনো মনে হয় ধ্রুবতারা নাটকটি আরো দর্শক-আনুকুল্য পেতে পারত। ধ্রুবতারার পর আবার একরাতে ফোন। আকাল গল্পটি নিয়ে নাটকের কথা ভেবেছেন। আকাল হয়েছিল দামিনী হে। দামিনী হে শুধু আকাল গল্পটি নিয়ে নির্মিত হয়নি। আমি তো বলেইছি, মেঘনাদ নাট্যকারের সঙ্গে বসে নিজের ভাবনাকে বিনিময় করে নাটক নির্মাণ করিয়ে নেন। পিঙ্কি বুলি নাটকে তাই দেখেছিলাম। আকাল থেকে দামিনী হে নাটক লিখেছেন সুখ্যাত নাটককার চন্দন সেন। চন্দন সেনকে মেঘনাদ আমার আরো গল্প দিয়েছেন। আসলে আমি জানতাম না মেঘনাদ আমার কত গল্প পড়েছেন। দামিনী হে নাটকে আমার আরো চারটি গল্পের অংশাংশ আছে। যেমন অন্ন গল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছে এই নাটকে। সাবলীল ভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন নাটককার আকাল গল্পের সঙ্গে। আর অষ্টম বাউরির মেলা গল্পের একটুখানি বা পীরতলার সামান্য। মেঘনাদ গল্প পড়ে নিজে বুঝে নেন কীভাবে নাটকটি হবে। ছাপার অক্ষরে যে চরিত্রদের কথা লেখা হয়েছে মঞ্চে শুধু কি তারাই আসবে অবিকল? একটি নাটক কীভাবে নির্মাণ হয়, তা মেঘনাদ ভট্টাচার্যর সঙ্গে মিশে আমি জেনেছি। এই জানা আরো নিবিড় হয়েছে পাসিং শো গল্পটি নিয়ে নাট্য-নির্মাণে। মেঘনাদ ভট্টাচার্য বলেন আমার গল্প এবং উপন্যাসের ভিতর তিনি নিজের ভাবনাকে যুক্ত করতে পারেন। আমার সঙ্গে তাঁর রসায়ন মেলে। মেলে তো নিশ্চয়। গত পাঁচ বছরে মেঘনাদ আমার তিনটি গল্পকে মঞ্চে এনেছেন। এই ঘটনা কি আগে ঘটেছে? পাসিং শো গল্পের নাটক আর এক সুখ্যাত নাট্যকার উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের হাতে নির্মিত। পাসিং শো গল্প এবং ওই নামের একটি নভেল মেঘনাদ নিলেন প্রথমে, তারপর কোন গল্প নিয়েছেন আমি জানতাম না। গল্পের ভিতরে গল্প মিশিয়ে দিয়ে যে নাটক তৈরি হল, মঞ্চে দেখে আমি বিস্মিত। আমার কথা মেঘনাদ ভট্টাচার্য যেমন জানেন, যেমন বোঝেন, তা আর কেউ নন। আরো দুটি গল্প তিনি উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে নিশ্চয় বলেছিলেন, মিশিয়ে দিতে। মিশে গেছে। আসলে মেঘনাদ ভট্টাচার্য নিজে যেমন চান, তেমনি নাটক লিখিয়ে নেন নাটককারকে দিয়ে। যতক্ষণ না নিজের ভাবনার সঙ্গে মেলে, তিনি থামেন না। পাসিং শো নির্মাণ পর্বে একদিন আমাকে বললেন গানটি বড় করে লিখে দিতে। টেক্সট-এ যা আছে, তার চেয়ে কিছু বেশি। মেঘনাদ বললেন, এই গান আপনি ছাড়া কেউ লিখতে পারবে না। আমি লিখেছিলাম প্রবল সংকোচে। সেই লিরিকে সুর দিলেন গুণী সুরকার জয় সরকার। জয় সরকার আবহ করেছিলেন অসামান্য। পুরনো বাংলা গানের সুর আবহে যেমন ব্যবহার করেছিলেন তা আমি ভুলব না। আর মেঘনাদের অভিনয়। সে-ও বড় পাওয়া এই নাটকে। পিংকি বুলি নাটকে সুর করে ছিলেন শ্রদ্ধেয়া স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত। নাটকে আবহ নাটককে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। পিংকি বুলি নাটকে বুলির মুখের গান ভুলব না। মেঘনাদ জানেন কোন নাটক, কোন কাহিনিতে কোন সুর বসবে এবং কে তার জন্য যোগ্য। মেঘনাদের প্রেমকথা নাটক ফরাসী নাটককার মলিয়েরের নাটকের বঙ্গীকরণ। চন্দন সেনের নাটক। প্রথম শো দেখে আমার ততটা ভাল লাগেনি। জানিয়েছিলাম। পরে আবার দেখতে বললেন। বুঝলাম মেঘনাদের আত্মবিশ্বাস কত গভীরে। দেখে আবার আগের মত পরিবর্তন হয়েছে। দামিনী হে নাটকের রুদ্ধ দ্বার শো হয়েছিল মোহিত মৈত্র মঞ্চে। সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত এবং অন্যান্য অনেকেই ছিলেন। শো শেষ হলে, মেঘনাদ আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। বিরতির আগের দৃশ্যটি আমার পছন্দ হয়নি। আমি বললাম। মেঘনাদ চুপ করে শুনলেন। কোনো মন্তব্য করেননি। আমার বন্ধু নাটক-পাগল সমীর চট্টোপাধ্যায় আমাকে বললেন, তুই বলে দিলি ওই ভাবে!

আমি বললাম, মেঘনাদ ভট্টাচার্যর সঙ্গে আমার স্পষ্ট সম্পর্ক। খোলাখুলি কথা বলার সম্পর্ক। ভালবাসার এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক। তিনদিন বাদে মেঘনাদ আমাকে ফোনে জানিয়েছিলেন, আমার প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভেবেছেন ক'দিন ধরে, বিরতির দৃশ্যটি নতুন করে ভেবেছেন। নাট্যকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। বদলেছেন। বললেন, লেখকই তো কাহিনির স্রষ্টা, তাঁর মতামতের গুরুত্বই প্রধান। আমাদের দুজনের বন্ধুতা আর

সম্পর্কের ভিতর পারস্পরিক শ্রদ্ধা অনেক। মেঘনাদ ভট্টাচার্য আমার লেখার পাঠক। এমন পাঠক অর্জন একজন লেখকের স্থায়ী অর্জন।

দামিনী হে নাটকের রিভিউ হয়েছিল এক সুখ্যাত পত্রিকায়। সেখানে কাহিনি- কারের ভূমিকাকে খুব খাটো করা হয়েছিল। নাটকের অসম্ভব সুখ্যাতিও হয়েছিল। সমালোচক জানতেন না, 'আকাল' গল্পের সঙ্গে অন্য কাহিনি যা মিশেছে, সবই এক লেখকের। সেই রিভিউ পড়ে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। মেঘনাদেরও মনে হয়েছিল লেখককে খামোকা ছোট করা হয়েছে। তবু ওঁর সঙ্গে আমার বাক্য বিনিময় সুশৃঙ্খলতায় হয়নি সেদিন। আমি বোধহয় বলেছিলাম, আমার আর দরকার নেই থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার। খামোকা নিন্দিত হতে যাব কেন? এবং কথাটি অসত্য তো নয়। নাটকের সমালোচনায় কাহিনিকারের গুরুত্ব ছোট করে দেখা হবে কেন? আমি আর থিয়েটারে আমার গল্প বা উপন্যাস দেব না। ঠাণ্ডা মাথার মেঘনাদ ভট্টাচার্য চুপ করে শুনেছিলেন। প্রত্যুত্তর দেননি। আমাকে ভালবাসেন আমার লেখাকে ভালবাসেন, তাই চুপ করে ছিলেন। তারপর অবশ্য সমালোচক একটি চিঠি দিয়েছিলেন ঐ পত্রিকায়। তা ছাপা হয়েছিল। এই ঘটনা ব্যতিক্রমী বলেই চিহ্নিত মনে হয়। ওখানেই ইতি হয়েছিল মতান্তরের। কিন্তু আরো পরে তাঁর সেই সমালোচনা তিনি ছেপেছিলেন এক সংকলনে, তাতে চিঠিটি ছিল না। আমার বিরক্ত লেগেছিল। অবশ্য এর পরে বহুল প্রচারিত একই সংবাদপত্রে ঐ নাটকের দুটি রিভিউ প্রকাশিত হয়, তার একটিতে সাহিত্যের এক প্রখ্যাত প্রাক্তন অধ্যাপক-সমালোচক গলপকারের নামই উচ্চারণ করেননি। আমি আর এই নিয়ে কথা বলিনি। মনে হয়েছিল ওঁর উচ্চারণ-অনুচ্চারণে কীই বা হতে পারে? প্রতি বিজ্ঞাপনে সায়ক আমার নাম ব্যবহার করে। সায়ক আমাকে প্রতি বিজ্ঞাপনেই যেন আমাকে সম্মানিত করে। প্রতি শো আরম্ভ হয় লেখক এবং নাট্যকারের নাম উচ্চারণ করে। এ খুব বড় পাওয়া। তবে একটা কথা উচ্চারণের প্রয়োজন, গল্পের নাট্যরূপ আর নাটক লেখা এক নয়। সমালোচক এই কথা কি জানেন না? জানেন নিশ্চয়। তবু কেন...? শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে ৮০-র দশকের প্রথমে একটি নাটক হয়েছিল, বিখ্যাত এক নাট্যদল প্রথম দুয়েকটি শো-এর পর আর তাঁর নাম উচ্চারণ করত না। অদ্য শেষ রজনী নাটক এর বিজ্ঞাপন তারই বিপরীত। শ্যামল সেখানে বারংবার উচ্চারিত, বিজ্ঞাপনে এবং নাট্যারম্ভে। ব্রাত্য বসু শ্যামলদার অসম্ভব অনুরাগী। তাই সেই তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের সেই বিষাদের অবসান ঘটেছে। আমিও যে শ্যামলের অন্ধ অনুরাগী। তখন আমারও খুব খারাপ লেগেছিল। আমার একটি গল্প নিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় এক নট ও নির্দেশক একটি নাটক করেছিলেন। ২৫-৩০টা শো হয়েছিল। এখন হয় কি না জানি না। রবীন্দ্র সদন মঞ্চে দেখতে গিয়েছিলাম এক আত্মজনকে নিয়ে। পোস্টার থেকে নাট্যারম্ভ-কোথাও আমার কথা বলা হয়নি। বিষণ্ণ হয়ে ফিরে এসেছিলাম। আমার আত্মজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কই তোমার নাম তো কোথাও নেই। কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্রর অশ্বচরিত নাটকে আমি ছিলাম প্রতি শো আর বিজ্ঞাপনে উচ্চারিত। লেখকের প্রাপ্তি তো এইটুকু। মঞ্চে থাকেন অভিনেতা। লেখক পর্দার আড়ালের মানুষ, যেমন নির্দেশক, আলো ও মঞ্চ শিল্পী এবং নাটককার।

দামিনী হে নাটকে বহুদিন বাদে বাংলা থিয়েটারে নিম্নবর্গের মানুষের জীবন এসেছিল। অসম্ভব ভালো নাটক এবং প্রযোজনা। কোথাও কোথাও আমার 'না' ছিল বটে, কিন্তু গল্প উপন্যাস আর নাটক তো এক নয়। আলাদা মাধ্যম। সুতরাং অদল বদল হয়। শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্তর পৌত্রী, সুরঞ্জনা-কন্যা কথাকলি দেব অভিনয় করেছিলেন মনে রাখার মতো। মেঘনাদ ভট্টাচার্য নিজে উঁচু দরের অভিনেতা। তিনি অভিনয় করিয়ে নিতেও জানেন। পিঙ্কি বুলির দুই কন্যা কিংবা দামিনী হে নাটকের দামিনী বা জাবালির অভিনয় আমার মনের ভিতরে স্থায়ী আসন পেতে আছে। মেঘনাদ এ পর্যন্ত আমার গল্প নিয়ে তিনটি নাটক নির্মাণ করেছেন। ভেবেছিলাম এখানেই থামবেন। গত বছর, ১৪২৩ বঙ্গাব্দের শারদীয় বর্তমান পত্রিকায় একটি উপন্যাস লিখেছিলাম 'পুনরুত্থান'। পড়তে অনুরোধ করেছিলাম। পড়ে গভীর রাতে ফোন করেছিলেন। দিন পনের বাদে আবার ফোন, পুনরুত্থান নিয়ে ভাবছেন। নাটক হবে আবার। সেই নাটক লেখা হচ্ছে চন্দন সেন

মহাশয়ের হাতে। হয়তো হবে। নাটক কোন ফর্মে হবে, দৃশ্য বিন্যস্ত হবে কীভাবে, তা একদিন ফোনে আমাকে শোনালেন মেঘনাদ। ৪০ মিনিট ফোন। এই নাটক যদি ঐ ফর্মে আসে মঞ্চে, মেঘনাদের হাতে তা অন্য মাত্রায় পৌঁছবে। আমার বিশ্বাস তাই। কিন্তু শেষ অবধি পুনরুত্থান নিয়ে আমি কিছু আপত্তি জানিয়েছিলাম। মেঘনাদ সেই কথায় মান্যতা দিয়েছেন। পুনরুত্থান, আমার চার কাহিনি মঞ্চে নিয়ে এসেছেন মেঘনাদ। বিরল সম্মান। এমন কি হয়েছে আগে কারোর? থিয়েটারের আমি ছিলাম শুধুই দর্শক, এখন তার অংশ হয়েছি এই ভাবে। মেঘনাদ ভট্টাচার্যর সঙ্গে আমার বন্ধুতা চিরজীবী হোক। সায়ক আমাকে শিশিরকুমার সম্মান দিয়েছে। নাট্য দলের কাছ থেকে একজন গল্প উপন্যাসের লেখক সম্মানিত হচ্ছেন, এও প্রায় বিরল ঘটনা। তবে সায়ক তা আগেও করেছে। বিমল কর এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে এই সম্মান দিয়েছিল। সাহিত্যের কাছেই সায়ক বারবার যায় নাটকের সন্ধানে। মেঘনাদ যান। কারণ তিনি সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক। নমস্কার মেঘনাদ। বড় নট, নির্দেশক আমার বন্ধু, এও এক দুর্লভ পাওয়া।

পুনশ্চ: ক'বছর আগে একটি নাটক লিখেছিলাম ব্রাত্যজন নাট্যপত্রে। সেই নাটক মেঘনদ ভট্টাচার্যর পরামর্শে কতবার বদল করেছি যে তার হিসেব নেই। দৃশ্য ধরে তিনি আমাকে দিয়ে আবার লিখিয়েছেন। এই কাজটি বন্ধুতার স্মারক হয়ে থাকবে। নাটকের নাম "শেষ পাহাড় অশ্রুনদী"। নতুন করে দৃশ্য বিন্যাস সবই তাঁর পরামর্শে। ঐটিই আমার জীবনের প্রথম নাটক।

গড়ের মাঠ

গড় তো ফোর্ট উইলিয়ম। প্রাচ্যদেশে ব্রিটিশ রাজের সামরিক শক্তির সবচেয়ে বড় নিদর্শন। তার মাঠ আমাদের গড়ের মাঠ। গড় ফোর্ট উইলিয়ম ১৭৮০ নাগাদ আত্মপ্রকাশ করে গড়ের মাঠের পশ্চিমে গঙ্গার পূর্বকূলে। কিন্তু সেনাবাহিনীর সেই গড় তো আম আদমির কাছে অনেক দূরের, তার মাঠ আমাদের অনেক কাছের! শুনেছি একটি গড় আগে ছিল বিবাদী বাগের জিপিও যেখানে, সেখানে। ১৭৫৬ সালে সেই দুর্গ সিরাজের সেনাবাহিনী অধিকার করলে বোঝা গিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে যথেষ্ট নিরাপদ নয় তা। ১৭৫৭-য় পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জিতে গেলে বণিক হয়ে যেতে থাকে শাসক। শাসকের নিরাপত্তার জন্য এই নতুন গড়ের, এই নতুন দুর্গের পরিকল্পনা। গড় হলো, তার মাঠ হলো। এমনি এক মাঠ নয় তেপান্তর। তার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো দেখা যায় না। যদি সমুখ সমর হয়, এই মাঠেই তা হবে। মাঠ ছিল সেনাবাহিনীর অধিকারে। স্বাধীনতার পরও মাঠ সেনা বাহিনীর। কিন্তু তার অধিকার আমাদের। নগর কলকাতাবাসীর। কলকাতা কেন কলকাতায় আসা মফস্বলবাসীরও। ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, নিঃসঙ্গ মানুষের আশ্রয় এই গড়ের মাঠেই। হ্যাঁ, এমনই গড় করেছিল ইংরেজ, যে গড় থেকে যুদ্ধের গোলাগুলি বারুদের ধোঁয়া বের হয়নি কোনোদিন। কোনো যুদ্ধ করেনি কোনো সেনাবাহিনী। এই গড় কোনো যুদ্ধের মুখোমুখি হয়নি কোনোদিন। হুঁ, লড়াই হয়েছে তার মাঠে, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিং, থেকে ইস্টার্ন রেল, উয়াড়ি, এরিয়ান্স কিংবা বালি প্রতিভার ভিতরে। গড়ের মাঠ আসলে খেলার মাঠ। যুদ্ধের মাঠ নয়। বছরে দুই দিন, ২৬শে জানুয়ারি আর পনেরই আগস্ট গড়ের সমুখের রাজপথে যুদ্ধের ভেরি বাজে, কামান নিয়ে ট্যাঙ্ক সেই পথে এগোয়, মহাযুদ্ধের ঘোড়ার টগবগ শোনা যায়, রাইফেল উঁচিয়ে সেনাবাহিনী প্যারেড করে বটে, সবই লোক দেখানো। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই গড়ের মাঠের বাতাস তাই বলে। গড়ের মাঠে যুদ্ধ ছিল না, যুদ্ধ নেইও। গড়ের মাঠে বসে ভিন প্রদেশ থেকে ভাগ্যান্বেষণে আসা সরল মানুষ কাউয়া গুণতি করে। অক্টারলোনি মনুমেন্ট (শহীদ মিনারের পুরনো নাম) কত উঁচু তা আন্দাজ করে। যুদ্ধ নেই। শান্তি আছে। ছেলেবেলা থেকে জানি কুরুক্ষেত্রর মতো করে গড়ে তোলা গড়ের মাঠ রক্তারক্তির যুদ্ধ দ্যাখেনি। ইলিশ আর চিংড়ির লড়াই দেখেছে। এরিয়ান্স থেকে মোহনবাগানে খেলতে আসা অসীম মৌলিকের গোল দেখেছে। ছেলেবেলায়, কিশোর বেলায় টিকি উঁচানো ট্রামে চেপে গড়ের মাঠে যাওয়া ছিল সবচেয়ে আনন্দের। হুঁ, ডিপো থেকে ফার্স্ট ট্রাম ছাড়ত ভোর সাড়ে চারটেয়। আলো ফোটেনি তখনও, ঘুমন্ত উত্তর কলকাতা ভেদ করে ফুটবল নিয়ে গড়ের মাঠ যাত্রা করলাম আমরা একদল, স্বপ্ন দেখি চুনী, পিকে বলরাম হবোই হবো। অবারিত সবুজে ফুটবল পিটিয়ে ফেরা রোদ উঠে গেলে। গত শতকের ষাটের দশকের কথা বলছি। প্রাতের কলকাতা তখন আড়মোড়া ভাঙছে। গড়ের মাঠে ঘুরে ট্রামও ফিরত বেলগাছিয়া, আমরাও ফিরতাম। গড়ের মাঠে ঘেরা ফুটবলের মাঠ। ক্লাবের তাঁবু, ইডেন গার্ডেন, বড় লাটের বাড়ি (রাজ্যপালের কুঠী) থেকে শহীদ মিনার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ঘোড়দৌড়ের মাঠ... এত বিস্তীর্ণ প্রান্তর আমি আদিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। আমি কেন কেউ দেখেছে বলে জানি না। ছেলেবেলার গড়ের মাঠেই সেইসব ক্লাব, যেখানে চুনী, পিকে, বলরাম, অরুময় নৈগম থেকে মঙ্গল পুরকায়স্তকে ঢুকতে দেখা যায়। ওই যে ছফুটের বেশি লম্বা থঙ্গরাজের মাথা দেখা যায়। ক্লাব তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে হাফ প্যান্ট রোগা টিঙটিঙে কিশোর উঁকি মারছে, যদি দেখা যায়। গড়ের মাঠের খেলা তো টিকিট কেটে দেখতে হয়, টিকিটের টাকা কে দেবে? ট্রাম ভাড়াই বা পাব কোথায়, ট্রামের টিকিট ফাঁকি মেরে যদি বা গেলাম, খেলা দেখার উপায় কী? ঘোড়ায় চাপা পুলিশ ঘুরছে ব্যাটন উঁচিয়ে। ভয় তরাশে ছুটছে হাবুলদা, কাবুলদা। লাঠির ঘা পড়ল বুঝি পিঠে। ধুতি তুলে ছুটছে দর্জিপাড়ার নিমাইকাকু। খেলা আরম্ভ হয়ে যায় প্রায়। র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে দেখছি

তারকাঁটার ওপারে ফুটবল নিয়ে ছুটছে অরুময়। দেখতে পাচ্ছি না, লোকে অরুময় অরুময় বলে চিৎকার করছে তাতেই বুঝছি সেই দক্ষিণ ভারতীয়র বুটের ডগায় আঠার মতো লেগে আছে ফুটবল। হু, গড়ের মাঠে প্রথম খেলা দেখা আমার এই ভাবে। বিনি পয়সায়। কিছু দেখা হলো, কিছু দেখা হলো না। গ্যালারির চিৎকারে গলা মেলাচ্ছি গোওওল। কে দিল কে দিল, মঙ্গল না দীপু দাস? র‍্যামপার্টে শুধু গোলকিপারের পিঠ দেখা যায়। জার্সি চেনা যায়। তাই দিয়েই সব বুঝে নিতে হয়। তখন ফুটবল হতো গরমে আর বর্ষায়। আই.এফ.এ লিগ গেলে শিল্ড। ক্রিকেট শীতে। কলকাতায় তখন হকিও ছিল। ভি.পেজ, অশোককুমার, গুরুবক্স সিং, ইনামুর আর আনিসুর রহমান, দুই ভাই... গড়ের মাঠে এঁদের দেখা যেত। ফার্স্ট ডিভিশন ঘেরা মাঠে, সেকেন্ড বা থার্ড ডিভিশন খোলা মাঠে। কী অমোঘ আকর্ষণ ওই মাঠের। খেলা আরম্ভ হবে ঘেরা মাঠে, দলে দলে লোক যাচ্ছে দেখতে। ঠাণ্ডা লেবু জল দেদার বিকোচ্ছে। চানাওয়ালা ঘন্টা বাজিয়ে লোক ডাকছে। ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে হেরো আর জেতা দলের সমর্থক উবু হয়ে বসে পড়েছে। হুইসিল মারছে পাগলা ফকির। সে ঘেরা মাঠের বাইরে রেফারিগিরি করে। ফাউল অফ-সাইড ধরে ফেলে। গড়ের মাঠের গড়ের ওপারে সূযার্স্ত হচ্ছে। ট্রামের জন্য হাঁটছি। খুব ভীড়। যে ট্রাম ধর্মতলায় ঢুকছে তার সেকেন্ড ক্লাসে উঠে গুনগুন করছে হাবুলদা, সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা...। তখন কলকাতা অন্যরকম ছিল। হাবুল মল্লিক ইস্কুল পাশ করতে পারেনি। খেলা ছাড়া আর কিছু জানত না। কোথায় হারিয়ে গেল জানি না। হয়তো গড়ের মাঠেই। তার তো আরম্ভ নেই শেষ নেই। মাঠে প্রবেশ করে আর বের হতে পারছে না।

হাবুল মল্লিকই গড়ের মাঠ চিনিয়েছিল। সে-ই বলেছিল একদিন খিদিরপুর যেতে হবে। যে ট্রাম যায়, সেই ট্রামেই ফিরব। কেন যেতে হবে? না সেই ট্রাম গড়ের মাঠ ভেদ করে বেহালা, খিদিরপুর যায়। ট্রামেই বসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে কী সুন্দর না দেখায়। হাবুলদা দেখেছে কিন্তু আমাদেরও দেখাতে চায়। ঘোড়দৌড়ের মাঠের পাশ দিয়ে যাবে সেই ট্রাম। কপালে থাকলে রেসও দেখা যাবে বাইরে থেকে। পুজোর সময় কবিতীর্থর ঠাকুর দেখতে গড়ের মাঠের এক প্রান্ত থেকে ট্রামে চেপে সেই অবারিত প্রান্তর ভেদ করে খিদিরপুর গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার শহর। ভিক্টোরিয়ার মাথার উপরে অর্ধেক চাঁদ দেখেছিলাম ফেরার সময়। তখন ভিক্টোরিয়া এত আলোয় সাজেনি। কিন্তু অন্ধকারে তার গায়ের শ্বেত পাথর থেকে ঠিকরে আলো বেরিয়ে আসছিল। আশ্বিনের রাত। গড়ের মাঠ নির্জন। ঝিঁঝি পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। কত বড় মাঠ। অন্ধকারে নেমে গেলে দিকহারা হয়ে যাব। অবাক হয়ে অন্ধকার দেখেছিলাম। মনে আছে এখনো। কত বড় বড় গাছ। ভুষন্ডীর মাঠ হয়ে যায় রাত্রিকালে গড়ের মাঠ। আন্নাকালি তার আগের জন্মের স্বামীকে খুঁজে পেয়ে মুড়ো ঝ্যাঁটা নিয়ে তাড়া করে।

গড়ের মাঠ নামে সেই আমলে ট্যাবলয়েড সাইজের একটা খেলার পত্রিকা বের হতো। মনে হয় কলকাতার সবচেয়ে পুরোন খেলার পত্রিকা। তার ছবির গায়ে হাত পড়লে কালি উঠে ছবি ধ্যাবড়া হয়ে যেত। কিন্তু কী ডিম্যান্ড! পকেটে দু-চার আনা থাকলে তা দিয়ে গড়ের মাঠ কিনে ধর্মতলা থেকে হন্টন। ট্রাম লাইন ধরে বেলগেছে। রাস্তা ভুল হওয়ার চান্স নেই। খেলার মাঠ নামে আর এক পত্রিকাও পাওয়া যেত এই ময়দানে। পরে বের হয়েছিল অলিম্পিক। খেলার দিন দেদার বিকোত।

গড়ের মাঠে খেলার সেই আকর্ষণ এখন নেই। ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান, মহামেডান... ভাল খেলা হয় যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। গড়ের মাঠ, ঘোড়সওয়ার পুলিশ, মানুষের দৌড়, র‍্যামপার্ট বাতাসে ভেসে আছে। মনে হয় গড়ের মাঠ নিঃসঙ্গ হয়েছে। কিন্তু গড় আছে আর তার মাঠ তো আছেই। ফি বছর এই মাঠে বই মেলা বসত। কিছু মানুষ পণ করে তা তুলেই দিল কোর্ট কাছারিতে গিয়ে। তবু গড়ের মাঠ আছে। সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ মানুষটি বসবে কোথায় চটি খুলে তার উপরে পাছা রেখে পা লম্বা করে গড়ের মাঠে। সমস্ত দিনের শেষে বিশ্রাম। সন্ধ্যায় ঘরে না ফিরে গড়ের মাঠে। বাড়িতে দুঃখ জমা আছে হে। দুঃখ বোঝো? ঘরে বাতাস নেই, দমচাপা। এখেনে গঙ্গার হাওয়া দেয়। দখিনা বাতাস। গা জুড়োয়। মাঝে মাঝে পাহারাওয়ালা লাঠি ঘুরিয়ে দেখে যায় কারা আছে। মেয়েমানুষ নিয়ে পুরুষমানুষ বসেছে কিনা। বসলে তাদের বয়স কত, দূরত্ব কত

পরস্পরের। গিয়ে দেখুন অন্ধকারে কিংবা অল্প চাঁদের আলোয় এক মধ্যবয়সী মোবাইল ফোনে কথা বলেই যাচ্ছে। হয়ত পুরাতন প্রেম কিংবা নতুন সম্পর্ক। হয় তো বউ ছেড়ে গেছে তাকে। বউয়ের সঙ্গেই কথা হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এস কুসুম। শহীদ মিনারের আশেপাশে কত মানুষ সন্ধ্যায়। চাওয়ালা চানাওয়ালা আইসক্রিমওয়ালা ঘুরছে। ঘুরছে পুলিশের খোচড়। মেয়েমানুষের দালাল। কানের কাছে এসে ফিসফিস, একদম ফিরেশ। এইট্টিন। ফ্যামিলি গার্ল। ফ্যামিলি থেকে আসা বউ। হুঁ, গড়ের মাঠ তো ভিক্টোরিয়া অবধি প্রসারিত। অনন্ত অন্ধাকার নিয়ে আধা ঘুমে পড়ে থাকে সন্ধ্যা থেকে। ঘুরছে কিশোরী কন্যারা। এতবড় ময়দান। রাস্তা থেকে অন্ধকারে নেমে গেলেই হলো। পাহারাওয়ালা নেবে কিছু। ভয় নেই স্যার আসুন। তখন ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়ির ভিতর থেকে নেমে আসা প্রেমিকার গলার মালা গড়ের কাছে পথের উপর লুটোয়। অশ্বমেধের ঘোড়া (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) গল্পের সেই ফিটন গাড়ি নিয়ে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধের পাশ দিয়ে ঘুরে গড়ের পাশ দিয়ে এগিয়ে রেড রোড ধরে গঙ্গার কাছে চলে যেতে পারেন আপনি। বাঁদিকের সবটাই গড়ের মাঠ। ডানদিকে ইডেন গার্ডেন। একবার আগুন লাগতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের কনরাড হান্ট দুই দেশের পতাকা বাঁচাতে আগুনের দিকেই ছুটেছিলেন। চার্লি গ্রিফিথ মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটে ছিলেন হেল্প হেল্প করতে করতে। গড়ের মাঠ জানে তা। তবে কিনা অনেক বছর তো হলো। স্মৃতি বিভ্রম ঘটতে পারে। পারেই। আরো আছে দুঃখের স্মৃতি। ঘেরা মাঠের গ্যালারি ভেঙে অনেক সমর্থকের মৃত্যু। গড়ের মাঠ দেখেছে তা।

গড়ের মাঠ দখল করে নিয়েছে নানা কিসিমের মানুষ। বাস টারমিনাস থেকে দীঘা শিলিগুড়ি বালুরঘাট কোচবিহারের বাস ছেড়েই যাচ্ছে সমস্তদিন ধরে। দুপুরে কাউয়া গোণার অপরাধে বিহারী ভোলেভালে লোকটিকে ফাইন করেছে মৌচ পাকানো লাঠি ঘুরানো পাহারাওয়ালা। অবারিত প্রান্তরে ঘুমিয়ে পড়েছে কতজন। এতখানি রোদ শীতকালে আর কোথায় পাবে? পারলে শীতের দেশে রপ্তানি করা যেত। গরমের দিনেও গাছতলায় ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্ত মানুষ। ওই দূরে প্যাটন ট্যাঙ্ক। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় তাকে রণাঙ্গন থেকে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছে সেনাবাহিনী। যুদ্ধের স্মৃতি।

এইই তো কলকাতা শহরের ফুসফুস। প্রোমোটার আর রিয়েল এস্টেটের কারবারিরা যেতে যেতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, ইস, কত ফ্ল্যাট হতো। কলকাতার এই জায়গাটিই পড়ে আছে। ফেলে রাখার মানে কী? বসন্তদিনে গড়ের মাঠ ভেদ করে ছুটে যাওয়া রাজপথ কুসুম কুসুমে রঞ্জিত হয়ে থাকে। গাছে গাছে কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া... লাল হলুদ। কী যে রূপ হয় তখন এই প্রান্তরের। আহা এ যেন সেই ধুলাউড়ির মাঠরে ভাই, ধুলাউড়ির মাঠ। লাল শাড়ি আঁচল উড়িয়ে কে পার হয়ে যাচ্ছে সেই মাঠ। ভোল কন্যা নয় তো? ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরিয়ে মারবে মাঠের ভিতর।

তাজা বাতাস নিতে এই মাঠে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে গাড়ি নিয়ে প্রাতঃ ভ্রমণে আসেন বরিষ্ঠজন। সবুজ ঘাসের উপর পা ফেলে ফেলে আয়ু বাড়ান। লাইফের এক্সটেনশন চান ভগবান স্যারের কাছে। হুঁ। এমনই এক উষাকালে হয়তো হয়েছিল গড়ের মাঠে প্রথম রক্তপাত। মৃত্যু। যে প্রান্তরে যুদ্ধ হয়নি, রক্ত ঝরেনি এমন একটা সেনাবাহিনি সমেত গড় থাকতে, সেই প্রান্তরে ভয়ানক রক্তপাত, নিষ্ঠুর হত্যা দেখে ভয়ে আমাদের প্রিয় নায়ক অভিনেতা পালিয়ে গিয়েছিলেন মুম্বই। গুলির শব্দ। আর্তনাদ। আপনি কিছু দ্যাখেননি। কে লোকটা? লেখক বিপ্লবী সরোজ দত্ত। সেই ঘটনা রক্তাক্ত করেছিল গড়ের মাঠের বুক। সেই রক্তের দাগ এখনো শুকোয়নি। আমরা মুছে দিতে পারিনি।

নিরাপত্তাহীনতার জীবানু এবং নিরাপত্তার আনন্দধ্বনি

জাতি সঙ্ঘে একটি নিরাপত্তা পরিষদ আছে। যার স্থায়ী সদস্য চিন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। অস্থায়ী সদস্য দশ। এই পরিষদের কাজ বিশ্বে শান্তি রক্ষা করা। যুযুধান দুই পক্ষকে থামানো। অন্যায় যুদ্ধে বিপর্যস্ত দেশের হয়ে লড়াই করতে জাতি সঙ্ঘের সামরিক বাহিনী পাঠানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর নিরাপত্তা পরিষদ গঠন হয়। এর আগে আগেই জাপানে পরমানু বোমা পড়েছে ৬-ই আগস্ট এবং ৯-ই আগস্ট। বলছি নিরাপত্তা পরিষদ থাকতেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কি যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে? দুর্বলের উপর সবলের সামরিক অভিযান? গত শতাব্দীতেই তো হয়েছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধ। নিরাপত্তা পরিষদ কোনো রাষ্ট্র আর তার জনগণকে নিরাপত্তা দিতে পারে? ভিয়েতনামকে নিরাপত্তা দিতে পেরেছিল, তার জনগণকে? কোনো জনজাতিকে নিরাপত্তা দিতে পারে জাতিসঙ্ঘ? আদিবাসী জনজাতিকে মেরে তাদের অরণ্য পাহাড় দখল বন্ধ করতে পেরেছে নিরাপত্তা পরিষদ? আমেরিকার আদিম উপজাতিরা জাতি সঙ্ঘের কাছে আবেদন করেছিল, তাদের যা যা হরণ করা হয়েছে, বন-পাহাড়, নদী, সমুদ্রতট, প্রান্তর, আলো-বাতাস, শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে সব ফিরিয়ে দিতে। নিরাপত্তা পরিষদ কি পেরেছে? নিরাপত্তা পরিষদ পারেনি ইরাকে হাসপাতালের উপর, বিদ্যালয়ের উপর বোমা বর্ষণ বন্ধ করতে? ইরাক যুদ্ধে নিরীহ ইরাকি বন্দীদের উপর মার্কিন সেনা বাহিনীর নৃশংসতা বন্ধ করতে, আবু গ্রাইব কারাগারের ভয়ঙ্কর নির্যাতনের বিপক্ষে কোনো প্রস্তাব নিতে? আফগানিস্তানে ক্রমাগত সামরিক আগ্রাসন রুদ্ধ করতে? একটা দেশ তো তার মানুষকে নিয়েই হয়। জনগণ একটা দেশের সম্পদ। শুধু মরুভূমি কিংবা সমুদ্র, মহাসমুদ্র নিয়ে তো দেশ হয় না। রাষ্ট্র হয় না। মানুষ না থাকলে কী নিয়ে রাষ্ট্র হবে? পাহাড় আর বনভূমি আর বন্যজন্তু কিংবা সামুদ্রিক প্রাণী নিয়ে, মরুপ্রান্তরের শকুন আর হাড়-কঙ্কাল নিয়ে? মানুষই রাষ্ট্র গড়ে। রাষ্ট্রকে সম্পদশালিনী করে তোলে। দেশ প্রেমিক হয়। দেশদ্রোহী শিরোপা পায় ক্ষমতার হাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বললে। রাষ্ট্রেই তার নাগরিক মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। মানুষ নানা আতঙ্কে কুঁকড়ে থাকে। থাকে। কী করে থাকে?

খোঁজ নিয়ে দেখুন নিরাপত্তা পরিষদ যেমন জাতি সঙ্ঘে আছে, অন্য নামে নিরাপত্তা পরিষদ আপনার পাড়ায় আছে, পাড়া থেকে শহরে আছে, শহর থেকে রাজ্যে আছে, রাজ্য থেকে দেশে আছে। নাগরিক সমাজে আছে। সমাজ তো দেশের অংশ। আপনি ছা-পোষা গেরস্ত। আপনার কাছে অমুক সঙ্ঘ (জাতি সঙ্ঘ নয় নিশ্চয়) এসে দাবী করল গণেশ পুজায় হাজার টাকা, দুহাজার টাকা। আপনার বাড়ির সামনে ১০০ ডেসিবেল মাত্রায় লাউড স্পিকার, বাড়িতে অসুস্থ প্রবীণ, আপনি সঙ্ঘের কাছে অনুনয় করে বিচার না পাওয়ায় গেলেন নিরাপত্তা পরিষদে। তিনিই সব দেখেন। বাড়িতে স্বামী স্ত্রী, শাশুড়ি বউয়ের কলহ হলেও তিনি দেখেন, কলেজে ছাত্র ভর্তি হতে না পারলেও তিনি দেখেন। তিনি যদি সদয় হন তবে সমস্যার সুরাহা হতে পারে, না হলে আপনার জীবন হানি হতে পারে। লাউড স্পিকার বাজানো আর পটকা ফাটানোর প্রতিবাদ করতে গিয়ে হত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। অভাব নেই অ্যাসিড ছুঁড়ে আপনার কন্যা সন্তানের উপর শোধ নেওয়ার দৃষ্টান্তেরও। কন্যার অপরাধ, পাড়ার ছেনো কিংবা ধেনো, ইত্যাদি আপনজনের প্রস্তাবে সে 'না' করেছিল। তারাই নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য।

সেনা বাহিনী, আমার দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে। সীমান্তে প্রহর জাগে। আবার বন্যা, ভূমি কম্প, পাহাড়ে ধ্বস নামলে সেনা বাহিনী ভরসা। বিপন্ন মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা এবং শৌর্য সেনা বাহিনীরই আছে। সব দেশেই তা হয়। আবার এই বাহিনীই তো বিদ্যালয়, হাসপাতালে বোমা ফেলে।

অপরাধী সন্দেহে মানুষকে গাড়ির পিছনে বেঁধে গাড়ি চালিয়ে দেয়। সেনা জওয়ানের চেয়ে রাষ্ট্র পরিচালকের ভূমিকা এখানে প্রধান। কর্তার ইচ্ছায় মানুষ বিপন্ন হয়। কর্তাই ঠিক করেন কে নিরাপত্তা পাবে, কে পাবে না।

রাষ্ট্র গড়েছে মানুষ। আবার সেই মানুষের নিরাপত্তা রাষ্ট্রের হাতেও সব সময় মজবুত নয়। নয়। আমার বন আমার পাহাড় তুমি কেড়ে নেবে। নির্বিচারে গাছ কেটে মরুভূমি করে দেবে অপরূপ প্রকৃতি, আমি তার প্রতিরোধ করলে বিপদ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরণ্যক উপন্যাসের শুরুতে যে বনভূমির কথা বলেছিলেন, নায়েব সব জমি বন্দোবস্ত দিয়ে ফেরার সময় অনুধাবন করেছিল, কাজটা ভালো হয়নি। বনভূমি ধ্বংসের সূত্রপাত ঘটেছিল জমি বন্দোবস্তে। আরণ্যকের সেই আদিবাসী গ্রাম, আদিবাসী রাজা, রাজকন্যা ভানুমতীর ধনঝরি পাহাড় ধ্বংসের প্রতিবাদে জোতদার রাসবিহারী সিঙেরা এখন গ্রাম পুড়িয়ে দেবে, জেলখানায় ভরে দেবে। রাসবিহারী সিং'এর হাতে যে ক্ষমতা, তাই-ই রাষ্ট্রের ক্ষমতা।

ক্ষমতার বিরুদ্ধে গেলে আপনি বিপন্ন। সেখানে গণেশ পুজো করা অমুক সঙ্ঘও রাষ্ট্র। হ্যাঁ তাই। তার সঙ্ঘের মাথায় রয়েছে এলাকার নিরাপত্তা পরিষদের হাত। তাই সে বিরূপ হয়ে বোমা পিস্তল নিয়ে আপনার হাড় হিম করে দিতে পারে। এই ভাবেই সেই কাষ্ঠ ব্যবসায়ী, যে জঙ্গল সাফ করে মুনাফা তোলে, সেও রাষ্ট্র, কারণ তার পিছনেও রাজ্যের কিংবা মহকুমার, কিংবা জেলার অথবা পঞ্চায়েতের কর্তার হাত আছে। কেন না তার মুনাফায় কারোর কারোর ভাগ আছে। একের ক্ষমতা অন্যের নিরাপত্তা ধ্বংস করে, যেমন হিরোসিমা বা নাগাসাকিতে করেছিল আমেরিকা, যেমন সন্দেহ করা হয়, সেই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জন.এফ.কেনেডির জীবন নিয়েছিল অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। কেনেডি অস্ত্র সংবরণ করতে চেয়েছিলেন ভিয়েতনামে। কিউবার প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। অস্ত্রই তো ক্ষমতা। জে.এফ.কে নামের একটি সিনেমায় এমন অনেক সন্দেহ স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। অস্ত্রই ক্ষমতা, এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিরোসিমা, নাগাসাকি। আমি কত বড়, আমি কতটা শক্তি ধরি তা দেখাতেই তোমার নিরাপত্তা শেষ করতেই হবে। ধ্বংস করতে হবে নাগরিক থেকে কীট-পতঙ্গ সমূহকে।

পৃথিবীর বয়স হলো ঢের। মানুষের জ্ঞানের সীমা পরিসীমাও কম নয়। প্রযুক্তি মানুষের কাছে এনে দিয়েছে জ্ঞানের অনন্য ভাণ্ডার। তা যেমন আশীর্বাদ হয়েছে, তেমনি অভিশাপ হয়ে মানুষের বিপন্নতা বাড়িয়েছে ক্রমাগত। গণতন্ত্র এলে, রাজা-রানির শাসন গেলে, রাষ্ট্র হয়েছিল জনকল্যাণের। তা সম্ভব হয়েছিল উনিশ শতকের সংগ্রামে। তার ফলে বিশ শতকে ছিল নিরাপত্তা অর্জন। কী অর্জন? না, নিরাপত্তার অধিকার। কত অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল মানুষ। ৮ ঘন্টা শ্রম, কাজের নিরাপত্তা, কর্মীর সমস্ত জীবনের নিরাপত্তা, সব। কিন্তু একুশ শতকে এসে সেই সব অধিকার হরণ করে নেওয়া হতে লাগল ক্রমশ। এর পিছনে সোভিয়েতের পতন একটা কারণ হতে পারে, কেউ কেউ তা বলেন, আমিও অনেকটা তা ভাবি, কিন্তু সেই দেশে সাইবেরিয়ার নির্বাসন, ক্ষমতার বিরোধীদের বিপন্ন করে তোলাও তো সত্য ছিল। ক্ষমতাই আসলে রাষ্ট্রের নির্মাতা। তাই ক্ষমতা অথবা রাষ্ট্র বলল, অত নিরাপত্তা দেব কেন? মানুষ নিজে তা খুঁজে নিক। রাষ্ট্র শাসন করবে। নিরাপত্তা দেবে না যা চায় জনগণ। তখন জনগণ বিশ্বাস হারাতে থাকে রাষ্ট্রের প্রতি। আর রাষ্ট্রও তার জনগণের প্রতি বিশ্বাস হারায়। তখন কত রকম সন্দেহ তার ভিতরে জন্ম নেয়। অমল বিমল কমল এবং ইন্দ্রজিত এদের জীবনের গোপনীয়তা না জানলে রাষ্ট্র ক্ষমতা কি অটুট থাকবে? বিদ্রোহ তো ক্ষমতার বিপক্ষে সব সময় জাগরূক। অমল কী ভাবে, বিমলই বা কী চিন্তা করে? তাদের একটা পরিচয় পত্র হলো। কিছু তথ্য রাষ্ট্রের হাতে গেল। তারপর হলো কম্পিউটারে হাতের ছাপ, মুখের টাটকা ছবি নেওয়া পরিচয় পত্র। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো দূরাভাষ নং। আপনাকে বেঁধে ফেলা হলো। বলা হলো, এই পরিচয় পত্র না থাকলে, আপনার নাগরিকতাই সন্দেহমুক্ত হবে না। ব্যাঙ্কে লাগবে, রেল ভ্রমণে লাগবে, পাসপোর্টে লাগবে, যে কোনো সময়ে আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করা হতে পারে, তখন এই কার্ড নম্বর লাগবে। না থাকলে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বন্ধ, রেলের টিকিটের সংরক্ষণ বন্ধ, অনেক সুযোগ-সুবিধা রহিত হয়ে যাবে। মনে করুন এগুলি হারিয়ে গেছে, বন্যার জলে ভেসে গেছে (যা হয়েছে কেরলে) তখন? নতুন কোনো নিবন্ধন

হবে না। সরকারি ঋণও নয়, ব্যাঙ্কের ঋণও নয়। ভয় হয়, এরপর না চাল চিনি কিনতে কার্ড প্রয়োজন হয়। না থাকলে নতুন কিছুই হবে না। এসব হলো রাষ্ট্রের খেয়াল। মানে ক্ষমতার খেয়াল। খেয়ালও নয়, সুচিন্তিত কৌশল। ক্ষমতা চায় মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকুক, উদ্বেগ ভয়ের জন্ম দেয়। মানুষ ভয়ে থাকুক। তাহলে শাসনে সুবিধে অনেক। ফলে আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বার বার ভিন্ন স্থানে চলে যায় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হয় বলে। সব ঠিক ঠাক আছে তো? এ হলো এক উদ্বেগ। ব্যাঙ্কের পাশ বই এক উদ্বেগ। এ টি এম কার্ড এক উদ্বেগ। অতি কষ্টে উপার্জন করা অর্থ লোপাট না হয়ে যায়। লোপাট হচ্ছে। ব্যাঙ্ক কি দায় নিচ্ছে? তাই আমাকে অদ্ভুত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। জানি না কী করলে আমার অর্থের নিরাপত্তা শতকরা ১০০ ভাগ সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু এ টি এম কার্ডে টাকা তুলতে পাঁচবার ভাবি। সরকার দায় নিচ্ছে না। মানুষ নিজেরটা নিজে বুঝে নিক।

আবার এক নতুন উদ্বেগ এসেছে আমার বন্ধু আর প্রতিবেশীর জন্য। আসামের কথা বলছি। সেখানে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী তৈরি করছেন দায়বদ্ধতা শূন্য সরকারি কর্মচারী। ফলে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলী আহমেদের পরিবার অনাগরিক বলে ঘোষিত হন। ৪০ লক্ষ মানুষের ঘুম গেছে। এবং সামাজিক নিরাপত্তা। ১৯৭১-সালের ২৬শে মার্চের আগে এই দেশে আপনি যে ছিলেন তার একটা প্রমাণ দিন। জমির দলিল, জন্মের শংসাপত্র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট...ইত্যাদি ইত্যাদি। যিনি ইস্কুলের শেষ ধাপ অবধি যাননি, সেই কৃষক, ক্ষেত মজুর, শ্রমিক কী দেখাবেন? জমি কেনার দলিল। জমি না থাকলে? জমি আছে, কাগজ মানে পর্চা, দলিল নেই, তাঁর কী হবে? এমন তো হয় বেশি। জমি দখল করে তিন পুরুষের ভিটে। কিন্তু জমি হয় সরকারি খাস কিংবা অন্যের। কাগজ যা আছে, ভুল কাগজ। কেউ জানে না রেকর্ডে কার নাম। ফলে তিনি হয়ে গেলেন অনুপ্রবেশকারী। তাঁর জন্য অপেক্ষা শিবির হয়েছে। হায়, কী ভয়ানক আতঙ্ক। আতঙ্ক হয়তো কাটবে, হয়তো কাটবে না। ৯৮ বছরের বৃদ্ধ যিনি ১৯৪৭-এ উদ্বাস্তু হয়ে সীমান্ত পার হয়েছিলেন, তাঁর বৈধ কাগজপত্র থাকতেও নাম নেই নাগরিক পঞ্জীতে। হয় এই খাতায় না হয় চিত্রগুপ্তের খাতায়। সরকারের বেতনভূক কর্মচারী, ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা শাসক, নিরাপত্তার বলয়ে যাঁদের জীবন যাপন, তাঁরা তাঁর নিরাপত্তা হরণ করেছেন। দরিদ্র অতি সাধারণ যে নাগরিক, তাঁকে বিপন্ন করতে পারলে আর সকলে ভয়ে থাকবে। মাথা তুলে কথা বলবে না। মানুষের যে হয়রানি হলো, তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

মানুষের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করাই শাসকের প্রধান কাজ। দিল্লিতে শাসক যিনি, হটুগঞ্জে নিশ্চয় তিনি নন। কিন্তু আসলে তিনিই। ক্ষমতার শীর্ষ কোথায় জানা নেই, কিন্তু তা ভাগ হয়েছে সর্বত্র। তাতেই দেশ এগিয়ে চলে। এগিয়ে যে চলে, তা আমাদের দেশে ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখন দেখার কথা এই এগোন আসলে পিছোন কি না। এখন ধর্মাধর্ম জুড়েছে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার সঙ্গে। ভেবে দেখুন আপনি নাস্তিক হতে পারবেন না। হলে আপনার জীবনের ভার রাষ্ট্র নেবে না। প্রতিবেশী দেশে হয়েছে এমন। আমার দেশেও। ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বললে আপনার নিরাপত্তা সরকার দেবে না। এদেশে ওদেশে, দুই দেশেই। আপনি স্রোতে গা ভাসিয়ে চলুন, ভালো থাকবেন। আপনি জঞ্জাল, শ্যাওলার মতো স্রোতের অনুকূলে ভেসে চলুন, আপনার নিরাপত্তা সংরক্ষিত। আপনি মাছের মতো স্রোতের বিপক্ষে ভেসে যান, আপনি অনিরাপদ। আলব্যের কামুর ‘আউটসাইডার’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রটি, যার জবানীতে উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, সেই প্রটাগনিস্টের অপরাধ কী ছিল? মায়ের মৃত্যুতে সে যথার্থ শোকার্ত হয়নি। মা থাকতেন বৃদ্ধাশ্রমে। সেখানে মা ভালো ছিলেন। বয়সজনিত কারণে মারা গেছেন। কিন্তু তুমি সন্তান হয়ে মৃত্যুর পরের দিন প্রেমিকার সঙ্গে জলক্রীড়া করেছ, হাসির ছবি দেখেছ, ইত্যাদি ইত্যাদি...। আরবদের হত্যা করেছিল সে, সেই অপরাধ প্রমাণ করতে মায়ের মৃত্যুর পর তার আচরণ কেমন ছিল তা বিবেচ্য হয়। তুমি স্রোতের বিপক্ষে গেলে নিরাপত্তা পাবে না পরিষদের কাছ থেকে। প্লেগ উপন্যাসে প্লেগে অবরুদ্ধ শহর রোগমুক্ত হয়েছে, জনগণ উৎসবে মেতেছে, দূর থেকে সেই উল্লাস শুনতে শুনতে ডাঃ রিও ভাবছে, মানুষের এই

উল্লাস, আনন্দধ্বনি যে কোনোদিনই হয়তো আবার থেমে যাবে। নিয়ম তাই। প্লেগের জীবানু কখনোই সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় না। থাকে। বছরের পর বছর ঘুমিয়ে থাকে আসবাবপত্র, জামা-কাপড়ের বাক্সের ভিতর, শোবার ঘরে, ভাঁড়ারে লুকিয়ে থাকে। তারপর আচমকা বেরিয়ে আসে মানুষের সর্বনাশ করতে। ইঁদুরের ভিতর ঢুকে পড়ে শহর রোগে প্লাবিত করে দেয়। নিরাপদ জীবন অবরুদ্ধ হয়, বিপন্ন হয়। মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয় অনবরত। মানুষের নিরাপত্তার ধরণ অমনিই। কাস্টমসের উচ্চপদস্থ অফিসার অভিজিৎ সিনহা ছিলেন শান্ত নির্বিরোধ মানুষ। তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল নিরাপত্তারক্ষীরা। সন্দেহ তিনি বিপজ্জনক ব্যক্তি। তাঁর ফোন নম্বর পেয়েছে তারা কোথায় কোন দেশদ্রোহীর ডায়েরিতে। জেরায় জেরায় ভীত মানুষটি আত্মহত্যা করেছিলেন। আমি নিরাপদ কতক্ষণ, যতক্ষণ নিরাপদ আছি। নিরাপত্তাহীনতার জীবানু, সেই প্লেগের জীবানু, কোথায় ঘুমিয়ে আছে আমি জানি না।

দেওয়ালের লিখন

ফেসবুক কেমন? ফেসবুকে প্রাপ্ত বাস্তবতা? এই যে আন্তর্জাল নির্ভর নতুন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম আমাদের জীবনে কীভাবে প্রবেশ করেছে তা আসলে কী? ফেসবুকে সময় কাটাই আমি, কিসে কেটে যায় সেই সময়? ফেসবুকের জনসমাজকে দেখি আমি, সে কেমন জনসমাজ? স্যোসাল নেটওয়ার্কিং সাইট। এই সামাজিক বাস্তবতায় বিশ্বাস করি আমি। কেমন সে বিশ্বাস? এ যেন ২৪০০ বছর আগে জন্মান গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর কথিত সেই অন্ধকার গুহার প্রতীক হয়ে উঠেছে দিনদিন। সমস্তটা নয় কিছুটা। শাদা আর কালোতেই তো সব কিছুর অস্তিত্ব।

এথেন্সের এই মহৎ দার্শনিক ছিলেন আর এক জ্ঞানী, দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্য। সক্রেটিস প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতেন তর্ক বিতর্কে। লেখার চেয়ে তর্কে বিশ্বাস ছিল তাঁর বেশি। যা কিছু সত্য, তা তর্কে বিতর্কে অর্জন করতেন সক্রেটিস। সক্রেটিস লেখায় বিশ্বাস করতেন না। প্লেটো লিখেছিলেন সক্রেটিসের দর্শন ৩৬ খণ্ডে। কিন্তু প্লেটোর গুহার রূপক কাহিনি প্লেটোরই। প্লেটোর মনীষা সঞ্জাত। ফেসবুক কি ক্রমশ হয়ে যাচ্ছে প্লেটো বর্ণিত সেই অন্ধকার গুহা? সেই গুহার অন্ধকারে বন্দীরা আজীবন রয়েছে সমুখের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। তাদের পিছনে জনসমাজ। জনসমাজের পিছনে আগুন। আগুনের জন্য জনসমাজের ছায়া এসে পড়েছে গুহার দেওয়ালে। ছায়াকেই সত্য মনে করত শৃঙ্খলিত বন্দীরা। প্লেটো বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীকে আমরা যেমন মনে করি, সেটি আসলে সে রকম নয়। আপাত দৃষ্টিতে আমাদের সামনে আমরা যা দেখি তা আসলে মূল বাস্তবতা থেকে অন্তরে অন্তরে ভিন্ন। আমরা বেশীর ভাগ মানুষই এই চেহারাকেই বাস্তবতা হিসাবে মনে করি। আমরা মনে করি আমরা সব বুঝতে পারছি কিন্তু আমরা আসলে পারছি না। উল্টে মনে করছি এইটি সত্য। আসলে তা সত্য নয়। বন্দীদের সমুখের দেওয়ালে ছায়া পড়ত পিছনে সঞ্চরণশীল জনসমাজের। প্লেটো বর্ণিত সেই কাল্পনিক গুহায় যে মানুষেরা গুহার দেয়ালের দিকে মুখ করে শৃঙ্খলিত হয়ে আছে, তারা শুধু দেখতে পারছে কম্পমান ছায়াগুলো। ছায়াদের চলমানতার শব্দ। ছায়াদের পরস্পরের কথা। কম্পমান ছায়াদের অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করছে। সত্য ভাবছে ছায়াদের। তারা ভাবতেই পারে না ছায়ার অবাস্তবতা। ছায়াই বাস্তব, মূল বাস্তবতাকে তারা কল্পনাও করতে পারে না। এই মানুষগুলো তাদের সারাটা জীবন অতিবাহিত করে দেয়ালের উপর প্রক্ষেপিত ছায়াগুলোকে বাস্তব পৃথিবী হিসাবে ভেবে। তারপর তাদের মধ্যে কোনো একজন তার শৃঙ্খল ভেঙ্গে পেছনে যখন ঘুরে আগুনের দিকে তাকায়। তার দৃষ্টিতে সবকিছু প্রথমে ঝাপসা মনে হয়, তারপর সে দেখতে পারে আসলে সে কোথায় অবস্থান করছে। সে তখন হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে আসে এবং সূর্যের আলো দেখতে পায়। দেখতে পায় সত্যিকারের পৃথিবী। এই দেখার আনন্দময় অভিজ্ঞতা নিয়ে এরপর সে গুহায় আবার ফিরে আসে। গুহার বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে সে যা কিছু অন্যদের বলে তা কেউই বিশ্বাস করতে পারে না। যে মানুষটি তার শৃঙ্খলিত জীবন থেকে বের হয়ে আসতে পারে, সে-ই দার্শনিক। সাধারণ মানুষের খুব সামান্যই ধারণা আছে বাস্তবতা সম্বন্ধে, কারণ গভীরভাবে ভাবার বদলে তাদের সামনে যা আছে তা দেখেই তারা সন্তুষ্ট। ফেসবুক কি সেই অন্ধকার গুহা? ফেসবুক বাস্তবতার ছবি কিংবা ছবির বাস্তবতা, ফেসবুক আসলে কী? ফেসবুকে অভ্যাসের আয়ু দেখতে দেখতে বছর আট হয়ে গেল। আন্তর্জাল এবং ফেসবুক এই জীবনের নতুন বিস্ময়, তা সত্য। আবার বহু বিস্ময়ের সমাধিও যেন এখানে, তাও সত্য। সমাধি কেন, আন্তর্জাল যেন কল্পনার বিপ্রতীপ এক অবস্থান। কোন ছেলেবেলায় অন্নদাশংকর রায়ের পথে প্রবাসে থেকে একটি অংশ পেয়েছিলাম পাঠ্য তালিকায়। তার শিরোনাম ছিল বিলেত দেশটা মাটির। বালক নিজের কল্পনায় সেই দেশটিকে ভেবেছিল এক রকম। অন্নদাশংকর রায়ের লেখা পড়ে সে জেনেছিল যা তা যেমন জেনেছিল,

তেমনি তার কল্পনার পৃথিবীও নতুন করে তৈরি করেছিল সে তার মনের ভিতর। আন্তর্জাল কল্পনাকে থামিয়ে দেয় আচমকা তা যেমন সত্য, আবার প্রশ্নের জন্মও দেয়, যদি আপনার প্রশ্ন করার অভ্যাস থাকে।

আন্তর্জাল আমার কাছে তথ্য এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার উপুড় করে দিয়েছে সত্য, সহজ লভ্য হয়ে গেছে বহু পরিশ্রমে যে তথ্যকে সংগ্রহ করতে হতো একদিন। আবার এও সত্য সেই আহরিত তথ্য সঠিক কি না তা নিয়ে উদ্গত হয় সন্দেহ। কত তথ্য যে বিকৃত হয়ে আছে আন্তর্জালে। সেই নষ্ট তথ্য পরিকল্পিত। মনিষীদের ভাষ্যের কত নষ্ট চেহারা যে দেখতে পাই আচমকা। বিভ্রান্ত হয়ে ভেবেছি তিনি এই বলেছিলেন অমুক সালের অমুক ভাষণে? কোথায় আছে তা? নেই। ফেসবুক তৈরি করেছে তা। অসুন্দরকে সুন্দর করেছে, সুন্দরকে অসুন্দর, বিকৃত করেছে। ভুলকে সঠিক প্রতিপন্ন করতে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সিনেমার ছবি নিবেদন করে বলেছে এই-ই বাস্তবতা। এই-ই সেই ছবি, দাঙ্গার সময় যা ঘটে থাকে। যা ঘটেনি তা ঘটেছে বলেছে। যা ঘটেছে তাকে মিথ্যে বলেছে। আমি তা সত্য ভেবেছি। কেন না আমার সমুখে গুহার দেওয়াল। আমি এর থেকে বেরতে চাই না। যা আমাকে নিরাপদ রাখে, আমার মুখ লুকিয়ে দিতে পারে, আমি তার দিকেই হেলে পড়ি। ব্যতিক্রম তো আছেই। কিন্তু ব্যতিক্রমও সত্যের মুখ দেখতে ভয় পায়। আমি যদি গুহার বাইরে এসে সূর্যালোকিত পৃথিবীর রূপ দেখে সেই রূপের স্মৃতি নিয়ে ফিরি, আমার বিবরণ আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমিও শেষ অবধি দেওয়ালের ছায়ায় মনোনিবেশ করব। সমাজটা এমন। ফেসবুক সমাজেরই চেহারাই ধারণ করে। কিন্তু তা গুহাবাসী করেছে আমাদের। আমার উদ্বিগ্ন মুখের ছবি আপনার কাছ থেকে লুকিয়েছে।

ফেসবুক বহু মানুষের জীবনে এমন বাস্তবতা নিয়ে এসেছে, যে তার বাইরের পৃথিবীতে তার বড়ই অনীহা। আন্তর্জালের এই সামাজিক বাস্তবতাই তার বাস্তবতা। ব্যক্তিগত এক অনুভবের কথা বলি, যখন ফেসবুকে আসি, মনে হতো, ঐ যে আমার বন্ধুসকল, ওই যে রঙ্গিত, কিশোর কিংবা ঐশী, সঙ্গীতা, এদের বাস্তব অস্তিত্বই যেন নেই। নতুন আসা মাধ্যম। এখানে যারা কথা বলতে আসছে আমার সঙ্গে, তার বাস্তবের কেউ নয়। রঙ্গিতের সঙ্গে বইমেলায় আলাপ করাতে নিয়ে এল অলীক। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, সে না অন্য কেউ? রঙ্গিত নামের সেই যুবক কি বাস্তবে আছে? তুলিকা রায় এলেন বই কিনে, তাঁকে দেখে অবাক। আপনি? আমি চন্দ্রিমা দত্ত নামে আছি আপনার বন্ধু হয়ে, আসলে আমি তুলিকা রায়। ইস্কুলে বাংলা পড়াই। নিজের নামে নেই ফেসবুকে। কেন নেই? পথঘাটের মতো আন্তর্জালও কি অনিরাপদ? তিনি জবাব দেননি।

এ সব অনেক দিন আগের কথা। তখন ফেসবুক ছিল ভয়েরও। এক অধ্যাপক, নিজের প্রোফাইলে নোবেল বিজয়ী ভারতীয় বংশোদ্ভুত লেখকের ছবি লাগিয়ে বাংলা ভাষার লেখকদের ক্রমাগত অপমান করতেন। মনে হয় নিজেই গোটা চারেক আইডেন্টিটি নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন ফেসবুকে। একজনকে চার নামে বিদ্ধ করতেন। সেই ব্যক্তি কে তা পরে জেনেছি। তিনি লুক্কায়িত পরিচয় ত্যাগ করেছেন কি না জানি না, নিজ নামে প্রবেশ করেছেন এই জগতে। জগতটা কেমন? ফেসবুক এখন কিছু মানুষের কাছে সবচেয়ে বিশ্বাস্য জগত হয়ে উঠছে। কেমন বিশ্বাস্য? আমি যে অধ্যাপকের কথা বলেছিলাম, তিনি নিজেকে লুকিয়েছিলেন, প্রোফাইল ছবি এবং নামে। আমরা এখন নিজেরা স্বনামেই লুকোতে চাই না কি? আর আমরা শেষ অবধি সেই লুকোনো পরিচয়কেই বিশ্বাস করতে ভালবাসি। আপনি এক পেশাদার মানুষ। আপনি পেশার কারণেই কখনো উদ্বিগ্ন, কখনো প্রফুল্ল। আপনার যে সহাস্য মুখখানি আমি দেখছি বা আমার যে মুখখানি আপনি দেখছেন সব সময়, ফেসবুক খুললেই, তা থেকে আমার বাস্তবতা না দেখে আমার ছায়াই দেখছেন আপনি। ছায়া। হ্যাঁ, প্লেটোর কাল্পনিক সেই অন্ধকার গুহার দেওয়াল হলো ফেসবুকের টাইম লাইন যেখানে আপনার সমস্ত পরিচয় বিধৃত আছে। সেখানে আপনার পরিচয়ে আপনার মুখচ্ছবিতে কিংবা আপনার নিবেদন করা ছবিতে আপনার উদ্বেগ নেই। যা আছে আনন্দ। আমার সন্তান অসফল হলে তা আমি লিখি না। জনসমাজ জেনে যাবে। আমার সন্তানের সাফল্যকে বিস্তারিত করে আমিও বিস্তারিত হই। হতেই পারি,

মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে অপ্রাপ্তির ভার অনেক বেশি। সুখের চেয়ে দুঃখের ভার বেশি। সে এমন একটা জায়গা খোঁজে যেখানে সে নিজের মলিন মুখ দেখাবে না। আপনি আমার মতোই প্রফুল্লমুখে আছেন সেখানে। আমি আছি আপনার মতো হয়ে। শেষ অবধি আমার সঙ্গে আপনার কোনো তফাৎ নেই। গত শতকের ষাটের দশকের সুখ্যাত ব্রিটিশ রক-ব্যান্ড পিংক ফ্লয়েড গ্রুপের সেই গান, ইকোজ (প্রতিধ্বনি) এখন আন্তরজালের কল্যাণে শুনে বুঝি এই কথাই তো ছিল সেখানে, I am you, and what I see is me...। আমার মুখ আমি দেখি না, দেখি তোমার মুখ, আর আমি জানি আমি আমাকেই দেখি তোমার ভিতরে, তোমার মুখ আমারই মুখ। তোমার কোনো নিজস্ব মুখ নেই। আমারও নেই। আসলে আমরা ছায়া। আমাদের ছায়া গুহার দেওয়ালে দেখে আমরা মনে করি ছায়াই সত্য, তার বাইরে কিছু নেই।

নেইই তো। বাসে ট্রামে অ্যান্ড্রয়েড ফোন সার্ফিং চলছে সব সময়। বিরতিহীন যোগাযোগ চলছে। আত্মপ্রকাশ চলছে। পূর্ব গোলার্ধে যখন মানুষ জাগল, পশ্চিমে তখন মানুষ নিদ্রা গেল। পূর্ব গোলার্ধ জেগে উঠে দেখল পশ্চিম কী লিখে গেছে। কোন ছবি দিয়ে গেছে লেখায় রেখায়, গভীরে প্রবেশ করলে দেখতে পাচ্ছি আমিই রেখে গেছি সেই ছবি। রেখে নিদ্রা গেছি পশ্চিমে। জেগে উঠেছি পুবে। কিন্তু এর সমস্তটা সত্য নয় যেমন, অনেকটা সত্য। এই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম যা দেখা যায় এই চোখে, তার অনেকটাই ছলনাময়, আমরা যা দেখি তার অনেকটা অলীক, বাস্তবতা নয়। কিন্তু এই ছায়ার বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে আসি কী করে? প্রশ্ন করতে গিয়ে টের পাই, যাদের জিজ্ঞেস করছি তারা সকলেই তো ছায়াময়। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও কি নেই? দাঙ্গার সময়ে যে সিনেমার ছবি বাস্তবতার ছবি বলে কেউ প্রচার করল, সেই মিথ্যায় দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ আরো বাড়ল, রে রে করে তেড়ে গেল পরস্পরের দিকে, তার আসল সত্যও প্রকাশ হয়ে গেল দ্রুত। স্যোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটে দ্রুত ছড়িয়ে যায় আপনার বিষাদ আপনার আনন্দ। বিষাদের কথা তেমন কেউ লেখে না। কিন্তু লেখেও তো। এই কদিন আগে একজন লিখলেন, এই জীবন সম্পর্কে সমস্ত বিস্ময়ই তাঁর শেষ হয়ে গেছে। জীবনকে এখন বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ভারবাহীর মতো। এ জীবন তিনি রাখবেন না। তখন অন্ধকার গুহায় শৃঙ্খলিত মানুষ গুহার দেওয়াল থেকে চোখ সরিয়ে বেরিয়ে এল সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবীতে। জানিয়ে দিল পৃথিবীটা এখনো অনেক বিস্ময় ধারণ করে আছে তার জন্য। অনেক অপরূপ মুহূর্ত রয়েছে বাকি আমাদের এই জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য। তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে লাগল বন্ধুরা। সামাজিক সম্পর্কে জড়িত মানুষজন। ফেসবুক থেকে বেরিয়ে এসে ফোন করতে লাগল। কেউ কেউ ছুটেও গেল তার কাছে। বিষাদ সিন্ধুতে ডুবেছিল যে তার মুখে হাসি ফুটল। যে বিষাদ সিন্ধুতে ডুবেছিল সে, সেই সিন্ধু থেকে উঠে এল মাটির পৃথিবীতে। রবীন্দ্রনাথ উচ্চারিত হলেন,

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,

সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ ক'রে দিতে।

১৩-ই মে ১৯৪১, মৃত্যুর তিন মাস আগে কবি গভীর রাত্রে উচ্চারণ করলেন এই জীবন-সত্য। জীবন। জীবন। গুহার দেওয়াল থেকে চোখ সরিয়ে গুহা থেকে বেরিয়ে এস জীবন। দেওয়ালের লিখন এই।

পৃথিবীর পাঠশালায়

যে সময়ে আমি ১৭-১৮, সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে নক্সালবাড়ির গণ অভ্যুত্থান হয়ে গেছে। আমার বন্ধুরা কেউ কেউ ঘর ছেড়েছে। সোভিয়েত রাশিয়াকে তখন সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ নামে যথেচ্ছ গালাগালি দেওয়া হতো। দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হতো চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান। কত সব শ্লোগান লেখা হতো, উচ্চারিত হতো, একটি ছিল আমার খুব পছন্দের, "গ্রামে গ্রামে ডাক পাঠাও, জোট বাঁধো তৈরি হও।" সেই ১৭ থেকে ২২-২৩ বছর বয়স ছিল ভয়ের সময়। পুলিশী সন্ত্রাস নেমে এসেছিল সেই সব বিপ্লবীদের শেষ করে দিতে। দুই প্রতিভাবান কবি, বিপ্লবী কবি তিমিরবরণ সিংহ এবং দ্রোণাচার্য ঘোষের মৃত্যু হয়েছিল পুলিশের হাতেই। জেলখানায়। সরোজ দত্তের নিহত হওয়ার কথা নতুন করে বলার নয়।

আমি রাজনীতি করিনি কোনোদিনই। রাজনীতির লোকদের থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি বেশিরভাগ সময়। আমার মনে হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা যা বোঝেন, তা আর কেউ বোঝে না। মফস্বলের কেন শহরের রাজনীতিকের কাছে কত যে শুনতে হয়েছে, কী পড়ব, কী লিখব নিয়ে কত কথা। কিন্তু এর মানে যে এইটাই সব তা নয়। বহরমপুর থেকে প্রকাশিত হতো 'অনীক'। 'অনীক' পুরোপুরিই বিপ্লবী সাহিত্যের পত্রিকা। সম্পাদক অধ্যাপক দীপঙ্কর চক্রবর্তী বিপ্লবী রাজনীতি করতেন। জেলও খেটেছিলেন অনেকদিন। তিনি ছিলেন আমার প্রিয় সম্পাদক। পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। কোনোদিন জোর খাটাতে চাননি। ৩০ বছরে একবারই আমার গল্প তাঁর পছন্দ হয়নি। আর তিনি আমার এমন গল্প ছেপেছেন যে তার জন্য তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়েছে। নিন্দিত হয়েছেন। পরে প্রমাণিত হয়েছে তিনিই ঠিক। আমার একটি উপন্যাস "নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান" তিনিই ছেপেছিলেন। চটকল শ্রমিক ভিখারি পাশোয়ানের অন্তর্ধান নিয়ে সেই আখ্যান। হ্যাঁ, পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৭-৯৮ এর ঘটনা। দীপঙ্কর চক্রবর্তী, রতন খাসনবিশ বা অনুষ্টুপ সম্পাদক অনিল আচার্য ব্যতিক্রমী মানুষ। এই সব কথা বলা ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের শতবর্ষ নিয়ে কথা বলতে বসে। আমি রাজনীতির মানুষ নই। আমি প্রকৃতিগত ভাবে প্রশ্ন করতে ভালবাসি। রাজনীতি চায় প্রশ্নহীন আনুগত্য। রাজনীতি না করলে কী হবে, ছোটবেলা থেকে রুশ বিপ্লব, চৈনিক বিপ্লব নিয়ে বেড়ে তো উঠেছি। লেখা নিয়ে যাঁদের কাছে গিয়েছি, সেই দেবেশ রায় বা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো রাজনীতিরই মানুষ। কিন্তু লেখক হিসেবে অনন্য। অসীম রায়ের গল্পে আমি সেই বয়সে মুগ্ধ। তাঁর গল্প বা উপন্যাস একটুও রাজনীতি বিবর্জিত নয়। অনি, ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র, শ্রেণী শত্রু, অসংলগ্ন কাব্য - আমার প্রিয়পাঠ হয়ে উঠেছিল সেই সময়। সেই সময়ে, ১৯৭৫ সালে আমি "পরিচয়" পত্রিকায় প্রথম গল্প লিখি, শকুন্তলার জন্ম। সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭৬-এর পুজোয় "পরিচয়" পত্রিকার শারদীয়তে প্রথম গল্প লিখি "রাজকাহিনি"। সেই বছরই সমরেশ বসু বহুদিন বাদে শারদীয় পরিচয়-এ গল্প লেখেন। দীপেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় পরিচয় খুব উচ্চমানে উঠেছিল। পরবর্তীকালে দেবেশ রায় বা অমিতাভ দাশগুপ্ত-র সম্পাদনায়ও। কম বয়স। সেই সময়ে এক অখ্যাত তরুণের পরিচয় পত্রিকায় লিখতে পারা ছিল খুবই গর্বের। ১৯৭৬ সালে পরিচয় পত্রিকা বের করে অসামান্য এক ফ্যাসিবিরোধী সংখ্যা। সেই সংখ্যার প্রুফ দেখতেন দীপেন্দ্রনাথ, আমি কপি ধরতাম। ৮৯ নং মহাত্মা গান্ধী রোডে। সারা দুপুর কেটে যেত। আমি তখন চাকরি সূত্রে থাকতাম মেদিনীপুরের পশ্চিমে গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত বংশীধরপুর নামে এক গ্রামে। জরিপের কানুনগো। ছুটি নিয়ে কিংবা লুকিয়ে কলকাতায় চলে এসে সাতদিন-দশদিন, তারপর ফিরে একমাস বাদে আবার দশদিন বাড়িতে। ক্যাম্প অফিসে আমিই তো হেড। যখন থাকতাম, রবিবারেও কাজ করে পালিয়ে আসা দিনগুলির কাজ উদ্ধার করে দিতাম। বহুদূর সেই অঞ্চল। বাসে ৭ ঘন্টার পর ১ ঘন্টা ৪৫ মিনিট পায়ে হেঁটে পৌঁছতে হতো। আদিবাসী অধ্যুষিত। আর নক্সালবাড়ি আন্দোলনে গোপীবল্লভপুর তখন সংবাদের

শিরোনামে। সেই সময় সেই আন্দোলন শেষ করে দিয়েছে পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজারভ পুলিশ। দীপেন্দ্রনাথ প্রুফ দেখতে দেখতে আমার কোনোদিন তলস্তয়, কোনোদিন দস্তয়েভস্কি, কোনোদিন আন্তন চেখভ নিয়ে আলাপ করতেন। কোনোদিন হয়তো গোপীবল্লভপুরে মানুষের বসতির ভাগ নিয়ে কথা জিজ্ঞেস করতেন। জমির মালিক আর ভাগ চাষীদের বাসস্থান যে আলাদা সেই কথা জিজ্ঞেস করে আমার জানাটিকে পরখ করে নিতেন। কোনোদিন বলতেন সোভিয়েত বিপ্লবের কথা। ১৯১৭-র মার্চ মাসে জার নিকোলাস-২ এর পতন এবং জনগণের সরকার গড়ে তোলা রুশ বিপ্লবের কথা। দুনিয়া কাঁপানো সেই দশদিনের কথা। ননী ভৌমিকের অনুবাদে বিখ্যাত সাংবাদিক জন রিডের লেখা দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন-আমাদের উদ্দীপ্ত করেছিল। জারের পতনের কাহিনি নিয়ে সেই বই কী উদ্দীপনাই না জাগিয়েছিল আমাদের রক্তের ভিতরে। এরপর ১৯১৮-র অক্টোবর-নভেম্বরে বলশেভিক-কমিউনিস্টদের শাসন ক্ষমতা অধিকার, পৃথিবীর প্রথম সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, আমাদের রক্তের ভিতরে স্পন্দিত হতো নিশ্চিত। রাজনীতি করি আর না করি, তবুও। নানা জাতি-উপজাতি, নানা প্রদেশ যুক্ত করে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আমাদের কাছে ছিল গল্প কথার মতো। চারপাশের গ্রাম-নগর তখন দেখছি, বুঝতে পারছি সমাজে দুই দল মানুষ, কেউ খায় কেউ খায় না। তখন মানে সেই সত্তর দশকে সোভিয়েতকে চিহ্নিত করা হচ্ছিল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ হিশেবে। আমি তো রুশ সাহিত্যের অনুরাগী। আমি দেবেশ, দীপেন, অসীম রায়ের অনুরাগী। তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে, পরে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পড়ে প্রান্তিক মানুষ, নিম্নবর্গের মানুষ চিনেছি। চিনেছি নিজের গ্রাম বাসেও। ভূমি সংস্কার বিভাগে চাকরির সুবাদেও। ফলে নিজের তো ছিল অসম্ভব রুশ সাহিত্য প্রীতি। তা হয়েছিল সেই ছোটবেলা থেকে। আমাদের বাড়িতে সোভিয়েত দেশ এবং রুশ দেশে প্রকাশিত রুশ সাহিত্যের অনুবাদ আসতই। আমি জানি সোভিয়েত রাশিয়ায় বিপ্লব না হলে রুশ সাহিত্য আমার কাছে অনেকটাই থেকে যেত অধরা। আমি যেটুকু লিখতে শিখেছি তার অনেক শিক্ষাই যে রুশ সাহিত্য আমাকে দিয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ রুশ সাহিত্যের কথা বলতেন। রাজনীতির একটি কথাও না। তাঁর মাথার উপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। নিস্তব্ধ দুপুর, আমি পৃথিবীর পাঠশালায় বসে আছি যেন। দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ রায় বা অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং পরিচয় পত্রিকা চিরদিনই সোভিয়েতে মুগ্ধ। আমি চিন বা সোভিয়েত কে ভাল বা কে মন্দ, অত বুঝতাম না। বোঝার তেমন আগ্রহ ছিল কি? আমার যাবতীয় আগ্রহ সাহিত্যে। লু-সুন পড়ে মুগ্ধ। ম্যাড ম্যান'স ডায়েরি, আ কিউ এর সত্য কাহিনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল সাহিত্যের মহত্ব কোথায়। আ কিউ এর গল্প নিয়ে অরুণ মুখোপাধ্যায় 'জগন্নাথ' নামের যে নাটক করেছিলেন, তা বার কয়েক দেখেছি। সত্তর দশকের আরম্ভে রাজরক্ত, চাক ভাঙা মধু, কলকাতার হ্যামলেট, এই সব নাটকে সাম্যবাদ ছায়া ফেলেছে। সাম্যবাদী দর্শন, নক্সালবাড়ি আন্দোলন বাংলা নাটককে প্রভাবিত করেছিল গভীর ভাবে। প্রসঙ্গে ফিরে আসি, আমি আমার শৈশব থেকে রুশ বই, প্রগতি প্রকাশন, রাদুগা প্রকাশন-এর বই পড়ে বড় হয়েছি। সোভিয়েত দেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট সরকার একটা দেশের সাহিত্য, লোককথা, উপকথা সব অনুবাদ করে দেশে দেশে পাঠাচ্ছে। সেই সব বইয়ের দাম খুব কম। এই কাজের জন্যই সে দেশের সরকারের কাছে বিশ্ববাসীর চির-ঋণী থাকা উচিত। আমি প্রথম পড়ি বড় সাইজের উক্রেনীয় লোককথার একটি বই। আমার তখন পাঁচ-ছয় হবে। দাদুর দস্তানা। অসামান্য রঙ আর ছবিতে ভরা সেই বইই বোধ হয় এই অনুবাদ কার্যক্রমের প্রথম বই। খুব সম্ভবত ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা ভাষায়। অনুবাদ করেছিলেন শঙ্কর রায়। ২০ পৃষ্টার বইয়ের পাতায় পাতায় আশ্চর্য ছবি এঁকেছিলেন, ই.রাচেভ, প্রকাশনা: বৈদেশিক ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয় (মস্কো)। এখন সেই বই হয়তো কারোর সংগ্রহে আছে। আমার কাছে নেই। তখন নিম্নবিত্ত পরিবারের শিশুদের জন্য এই বই ছিল আকাশ থেকে নেমে আসা মন্ডা মিঠাইয়ের মতো। কত বই ছিল এমন ২০-২২ পাতার। বই পেতে দিতাম শানের মেঝেতে। ভাই বোনেরা একসঙ্গে পড়তাম। আর অন্য সময় বই আমার। একই ছবি কতবার যে দেখেছি। কল্পনাকে উসকে দিত সেই বই, দাদুর দস্তানা। বনের ভিতরে পড়ে থাকা দাদুর দস্তানায় নেংটি ইঁদুর থেকে ঘোঁত ঘোঁত করা বুনো শুয়োর অবধি আশ্রয় নিল শীতের হাত থেকে বাঁচতে, শেষে সেই দস্তানা

ফেটেই গেল। গল্পটি আবছা মনে আছে। আরো কত বই ছিল, "মোরগছানা"র কথা মনে পড়ে। সেই সব বই শৈশবকে মধুর করেছিল। এ ছাড়াও "প্রথম শিকার", আজেরবাইজানের গল্প, কত বইয়ের কথা মনে পড়ে। আমাদের বাড়িতেই ছিল তলস্তয়ের 'দুই হুজার', নিকোলাই গোগোলের উপন্যাস 'তারাস বুলবা'। বড় হচ্ছি রুশ সাহিত্য পড়তে পড়তে। আন্তন চেখভের গল্প পড়লাম কোন বয়সে তা আর মনে নেই। কিন্তু ছোটগল্পকে বুঝতে শিখেছি চেখভ পড়ে। হ্যাঁ, গল্পগুচ্ছ কিংবা তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রর গল্পও আমাকে ছোট গল্প লেখার পাঠ দিয়েছে। চেখভ আমাকে মোহিত করে রেখেছেন এত বছরেও। সেই কেরানির মৃত্যু, মুখোস, কুকুর সঙ্গী মহিলা, ছ'নম্বর ওয়ার্ড, কর্নেলের কুকুর, গুজবেরি...কত গল্প যে আজীবন মুগ্ধ করে রাখল। সাধারণ, অতি সাধারণ, বৈচিত্রহীন মানুষ নিয়ে কী আশ্চর্য সব গল্প। যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, নাটক নিয়ে মেতেছি। নিজে চেখভের মুখোস গল্পটি নাটকে রূপান্তরিত করলাম। সেই নাটক কতজনকে পড়ে শুনিয়েছি। প্রশংসা পেয়েছিলাম, কিন্তু মঞ্চস্থ করাতে পারিনি কোনো দল দিয়ে। এর পরে চেখভের নাটক দেখলাম অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় অভিনয়ে। "মঞ্জরী আমের মঞ্জরী"। গোটা রুশদেশই যেন আন্তন চেখভ। কিন্তু তা যে নয়। এক সোভিয়েত রাশিয়ার ভিতরে নিকোলাই গোগোল, আলেকজান্ডার পুশকিন, লেভ তলস্তয়, ফিওদর দস্তয়েভস্কি, ম্যাক্সিম গোরকি, ইভান তুরগেনেভ, মিখাইল শলোখভ, এত সব মহৎ লেখক। মহৎ শিক্ষক, আমি যত পড়ি ততো ধন্য হয়ে যাই। গোগোলের 'ওভারকোট' গল্পেই তো আধুনিক ছোটগল্পের সূত্রপাত। ধীরে ধীরে পড়ছি রুশ সাহিত্য। আমার যেন সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যই পড়া হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় তা নয়, কিন্তু অনেকটা তো বটে। সোভিয়েত বইয়ের জন্যই আমি সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, রুশ বিপ্লবকে স্মরণ করছি। আসলে মানুষ তো শাদা কালো। ভালো মন্দতে মেশান। সে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হোক বা না হোক। ক্ষমতাই মানুষকে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যায়। রাষ্ট্র শাসক তার ক্ষমতা ধরে রাখতে একনায়ক হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পরে এবং কিছু আগে এমন অনেক কথা শুনেছি যা আমাদের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছিল। ইতিহাসের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল ১৯১৭-১৮য়, তা সমগ্র বিশ্বকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। সেই স্বপ্নের ভাষা আমরা পড়তে পেরেছিলাম সোভিয়েত বইয়ে। আমি স্মরণ করছি ম্যাক্সিম গোরকির দুই অসামান্য আত্মকথা, আমার ছেলেবেলা এবং পৃথিবীর পাঠশালা। পৃথিবীর প্রকৃত পাঠশালাই হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। তলস্তয় অনুবাদে পড়লাম, ইভান ইলিচের মৃত্যু, ক্রয়েটজার সোনাটা। পরে রেজারেকশন, আনা কারেনিনা। কিছু গল্প। দস্তয়েভস্কির ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট পড়ি অবশ্য বাংলাদেশের অনুবাদে। অনুবাদ করেছিলেন আকবরউদ্দিন। সেই সোভিয়েত অনুবাদে গ্যাম্বলার পড়লাম। অপমানিত ও লাঞ্ছিত। ফাদার সিয়েরগি ও অন্যান্য গল্প। আমরা যে বিপ্লবের কথা অহরহ পড়েছি, কল্পনা করেছি, সেই বিপ্লবী সাহিত্য তো এসব নয়, কিন্তু মানুষের আত্মার কথা। গোর্কির মাদার অবশ্যই বিপ্লবের আখ্যান, কিন্তু তাও তো ছকের বাইরে। নিজের মায়ের সঙ্গে মিল খুঁজে পেতাম কী করে সেই কিশোরবেলায়। আর গল্পগুলির কথা স্মরণ করুন, চেলকাশ। সমুদ্রতীরের এক সন্ধ্যার সেই গল্প। শীত থেকে বাঁচতে মানুষ মানুষী পরস্পরকে আঁকড়ে শরীরের তাপে তাপিত হচ্ছে। এই রকম একটি গল্পই লিখেছিলেন সমরেশ বসু, খুব সম্ভবত তার নাম, 'উত্তাপ'। রাশিয়ার লেখকরা আমাদের লেখকদের প্রভাবিত করেছিলেন সত্য। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাস আনা কারেনিনা প্রভাবিত যে তা আন্দাজ করা যায়। পুশকিনের কবিতা, গল্প, ছোট উপন্যাস আমাকে তাড়িত করেছে। স্টেশনের ডাক বাবুর মেয়ের গল্পটি মনে আছে। এমন স্পন্দিত জীবনের গল্প বলেছে রুশ সাহিত্য যে তার তুলনা মেলা ভার। উপজাতি সর্দার এবং অভিজাত পরিবারের সেই রাজপুরুষকে নিয়ে উপন্যাসটি, 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে' কী অসামান্য! এই ঐতিহাসিক উপন্যাস উপজাতি সর্দারের নেতৃত্বে এক গণ বিদ্রোহের পটভূমিতে ১৮৩৬ সালে লেখা। অভিজাত রাজপুরুষদের নিয়ে জারের শাসন আর উপজাতি সর্দারের বিদ্রোহ, সর্দারের সঙ্গে রাজপুরুষের সাক্ষাৎ, আমি ভুলতে পারিনি। এমনিতে রুশদেশের শীতকাল, তুষারাচ্ছন্ন প্রকৃতির আমি মুগ্ধ পাঠক। প্রকৃতি পাঠই যেন হয় পুশকিন তলস্তয় পড়তে পড়তে। অভিজাত পরিবারের যুবকটি যাচ্ছিল

সেনাবাহিনিতে যোগ দিতে। উচ্চপদে তার নিয়োগ হয়েছে। তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে সে পথ হারায়। তার ফিটন গাড়ি সমেত সে কোথায় চলে যাচ্ছিল জানে না। মারাই পড়ত ঘুরে ঘুরে, কিন্তু এক উপজাতি যুবক এসে তাঁকে বাঁচায়, নিয়ে যায় সরাইখানায়। বিনিময়ে একটি ভদকার বোতল আর শীত বস্ত্রে সে খুশি। হাত মিলিয়ে চলে যায়। সেই যুবকই উপজাতি সর্দার, পরে তার নেতৃত্বে বিদ্রোহ। উপজাতি সর্দার কিন্তু ভোলেনি সেনাবাহিনির তরুণ অফিসারকে। ...আশ্চর্য এক কাহিনি। মনে পড়ে যায় শেষ অবধি বিদ্রোহ দমন হলো। ফাঁসিতে যাচ্ছে উপজাতি সর্দার যে কি না রাজপুরুষের গায়ে হাত দেয়নি যখন কয়েকটি এলাকা দখল করে নিয়েছিল। অনেক রাজপুরুষকে কোতল করেছিল কিন্তু এক বোতল ভদকা আর শীত বস্ত্রটির কথা ভোলেনি। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় সে পুরোনো বন্ধুকে হাত নাড়ে। চিনতে পেরেছিল। এসব কিন্তু জারের আমলে লেখা সাহিত্য। কিন্তু তা ধরেছিল রাশিয়ার সমাজের অন্তরাত্মাকে। অভিজাত সম্প্রদায়ের কাহিনি কিন্তু বর্জন করা হয়নি। অনূদিত হয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। আমরা বিপ্লবী সাহিত্য ব্যতীত অন্য কিছুকেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই যদি সাম্যবাদে আস্থা থাকে। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হয়তো ইতিকথার পরের কথা লিখতে হয়। আর প্রাগৈতিহাসিক কিংবা দিবারাত্রির কাব্যকে বক্র দৃষ্টিতে দেখা হয়। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর নিন্দিত হন যথেষ্ট বিপ্লবী নন বলে। বিভূতিভূষণ ভাববাদী, তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের জন্য হাহাকার করেছেন। ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট উপন্যাসের রাসকলনিকভকে কী ভাবে তাহলে গ্রহণ করব আমরা? সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। রাশিয়ান সাহিত্য তো সেই কথাই বলেছে। কমিউনিস্ট শাসকরা বুঝেছিলেন এই সব ঐশ্বর্যকে পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে দেশের গৌরব গাথা পাঠের সুযোগ করে দিতে হবে। ‘ইভান ইলিচের মৃত্যু’ নভেলা তো এক অভিজাত মানুষের পাপ স্বীকারের কাহিনি। খ্রিস্টীয় রীতিই যেন তলস্তয়ের লেখায় বারংবার উচ্চারিত। রেজারেকশনও তাই। কাউন্ট-বিচারক নিজের যৌবন কালের পাপ স্খালন করতে চলল সাইবেরিয়া। এই সব লেখা কমিউনিস্ট দেশ সমগ্র বিশ্বে পাঠিয়েছে অনুবাদ করে, এই দায়িত্ব কোনো রাষ্ট্র নেয় বলে জানা নেই। খুব সস্তায় বইগুলি হাতে পেতাম। অনুবাদ করতেন যাঁরা, তাঁরা অনেকেই বাংলাভাষার সৃষ্টিশীল লেখক। সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক, হায়াত মামুদ, অরুণ সোম যে অনুবাদ করেছেন মূল রুশ ভাষা থেকে, তা আমরা বাংলাভাষায় লেখা গ্রন্থের মতো করেই পড়েছি। সোভিয়েত দেশ থেকে প্রায় বিনামূল্যে বিতরণের জন্যই যেন বইগুলি আসত। প্রগতি প্রকাশন, রাদুগা প্রকাশন পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল লোকসানের ভার সহ্য করতে না পারায়। সেই বিপ্লবী দেশটাই তো নেই। প্রকাশন থাকবে কী করে? পুঁজিবাদী সমাজের কাছে তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি কে? বিপ্লবী পার্টির সরকার যে যে কাজ করেছিল, তার ভিতরে এই কাজটিও ছিল অগ্রাধিকার নিয়েই। এই কাজ ছিল বিপ্লবের অন্তর্গত। ভাবতেই পারি না এই নগদ মূল্যের বিশ্ব মনে রেখেছে কি না সেই ঝকঝকে বইগুলির কথা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রাধান প্রচারক ছিল কমিউনিস্ট সরকার। তাঁকে তুমি কত নিন্দা করবে? সব যে ধুয়ে যাবে পৃথিবীর সেই পাঠশালার কথা মনে করলে। গোগোলের ওভারকোট কিংবা চেখভের ছ'নম্বর ওয়ার্ড তো বাতিল করেননি তাঁরা যথেষ্ট বিপ্লবী সাহিত্য নয় বলে। কেরানির মৃত্যুকে ভীতু মধ্যবিত্ত, পাতি বুর্জোয়ার কাহিনি বলে ব্যঙ্গ করেননি তো। হ্যাঁ, সলঝেনিতসিনকে তাঁরা সমর্থন করেননি। সত্য। মায়কোভস্কি আত্মহত্যা করেছিলেন সত্য, কিন্তু দস্তয়েভস্কি পড়ে কেউ গোল্লায় যাবে না যে তা বুঝেছিলেন সোভিয়েত যুক্ত রাষ্ট্রের শাসকরা। বুঝেছিলেন, রাশিয়ার আসল ঐশ্বর্য এই সব চিরায়ত গল্প উপন্যাস। পুঁজিবাদি সমাজ ধনতন্তের কোনো দায় নেই ক্লাসিক পড়ানোর, বরং পাল্প লিটারেচর, যাবতীয় কুসাহিত্যের প্রচারক তারা। কিসে বাণিজ্য হবে তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুই ভাবতে পারেন না তাঁরা। সেই বইগুলির জন্য আমি শোকার্ত হই। সেই আশ্চর্য ছাপা আর ছবিতে ভরা দাদুর দস্তানা কিংবা মোরগ ছানা বই কি আর কি এই পৃথিবীর শিশুরা দেখতে পাবে?

নিরুদ্দিষ্টের অশেষ যাত্রা

উপন্যাস এক অশেষ যাত্রা। উপন্যাসের আসলে শেষ নেই। আসলে লেখক যেন একটি উপন্যাসই সমস্ত জীবন ধরে লেখেন। হয়তো ঠিক তা নয়, কিন্তু কখনো যেন এমন মনে হয়। নদী নিয়ে লেখা ফুরোয় না দেবেশ রায়ের। তিস্তা পারের বৃত্তান্ত, তিস্তা পুরাণের পর করতোয়া নদীকে তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন নদী ও শহরের যুগলগীতি শীর্ষ নামে লেখা বেশ কয়েকটি আখ্যানে। উপন্যাস কাহিনি কথন নয় যদিও কাহিনি কথনই এক জাতীয় পাঠক পছন্দ করেন বেশি। কাহিনির বৃত্তায়নই পছন্দ বহুজনের। ইচ্ছাপূরণের কাহিনি আরো বেশি পছন্দ মানুষের। যেমন সিনেমায় হয়। কিন্তু পাঠকের তো রকমফের আছে। কেউ বিভূতিভূষণ পড়েন, কেউ পড়েন নীহার গুপ্ত। লেখক যদি পাঠক ধরতে লেখার কথা ভাবেন, তাহলে তিনি সেই অচেনা ব্যক্তিকে মাপবেন কীভাবে? কে পছন্দ করবে তাঁর লেখা তা আন্দাজ করা দুরূহ। তার চেয়ে এমন তো হতে পারে তিনি যাঁকে চেনেন সবচেয়ে তাঁর জন্যই লিখতে পারেন। সেই ব্যক্তিটি তিনি নিজে। নিজেকে মাপাও সব সময় হয়ে ওঠে না। তবুও একটি কথা নিজে নিজে টের পাই, নিজের জন্যই লিখি আমি। নিজে সন্তুষ্ট না হতে পারলে শেষ অবধি সে লেখা হয়ে ওঠে না। কীভাবে তা হয় বলছি। আমি ১৯৮০ নাগাদ, তখন তিরিশে পৌঁছইনি, একটি নভেলেট লিখেছিলাম শিলাদিত্য পত্রিকায়। সম্পাদক ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। বিভ্রম ছিল সেই নভেলেটের নাম। একটি ঘোড়ার গল্প। দীঘার সমুদ্রতীরের এক হোটেলওয়ালার একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি প্রতি আশ্বিনে পালায়। সুবর্ণরেখা এবং সমুদ্রের মোহনার কাছে বড় একটি চর ছিল। আশ্বিনে সেই চরে চারদিক থেকে ঘোটক ঘোটকীরা পালিয়ে আসে সবুজ ঘাস এবং প্রেমের নেশায়। ঘোড়া এবং ঘুড়ীদের ভিতর ভালবাসা হয় সেই সময়। কিন্তু সেই বছর বৈশাখে সে অদৃশ্য হয়েছিল। নিখোঁজ সেই ঘোড়া খুঁজতে যায় হোটেলওয়ালার আশ্রিত ভানুদাস। মধ্যবয়সী ভানু ছিল হা-ঘরে। দুনিয়ায় কেউ কোথাও ছিল না তার। আমি দীঘায় গিয়েছিলাম শীতের সময়। ডিসেম্বর মাস। একটি হোটেলে মাস-চুক্তিতে আমি ঘর ভাড়া করেছিলাম। সেই হোটেলের মালিকেরই ছিল ঘোড়াটি। দেখতাম আমার ঘরের জানালার ওপারে নিঝুম বেলায়, নিঝুম রাতে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভানু কোথায় যেত ঘোড়াটির খোঁজে তা জানা যেত না। রাহা খরচ নিত গাঁজাড়ু হোটেলওয়ালার কাছ থেকে। মনে হয় ঘোড়া খোঁজার নাম করে সে নিজের একটা ইনকামের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ভানু আশ্চর্য সব জায়গার নাম করত হঠাৎ হঠাৎ। মীরগোদার জাহাজ ঘাটার দিকে দেখা গেছে নাকি একটি ঘোড়া। রানিসাই গ্রামের একজন খবর দিয়েছে সেদিকে একটি ঘোড়া দেখা গেছে। যাই হোক ভানুর সঙ্গে আমিও ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে নুনের খালারি দেখে এসেছিলাম। কিন্তু যে কথা বলতে চাইছি, আশ্বিনে যার পলায়নের কথা সে বৈশাখে কেন পালিয়েছে? গেল কোথায় সেই বুড়ো টাট্টু? ভানু জানে না। লেখক জানবে কী করে?

বাস্তবতা ছিল ঘোড়াটি নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু কেন তা কেউ বলতে পারছে না।

জীবনের অনেক রহস্য খুঁজে বের করা যায় না সত্য। অনেকেই তা প্রকাশ করেন না। লেখক তো তৃতীয় নয়নের আধিকারী, তিনি সেই রহস্য কি উন্মোচন করতে পারবেন না। আমি ভানুকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি তার অশ্ব কেন নিরুদ্দেশে গেল। হোটেলের ঠাকুর বলল, কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে। সোজা কথা। এতে করে নিরুদ্দেশের রহস্য শেষ হলো। কিন্তু ভানুদাস আমাকে বলেছিল, না দাদা, বুড়ো ঘোড়াকে কে চুরি করবে? তাহলে সে পালালো কেন, এখন তো আশ্বিন নয়?

ভানু উত্তর দিতে পারেনি। পরের ডিসেম্বরে আমি চলে আসি দীঘা থেকে। তখনো রাহা খরচা নিয়ে ভানু সেই পলাতককে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বদলি হয়ে চলে আসার পর আমার ভিতরে প্রশ্নটি ছিল, সে পালিয়েছিল কেন বৈশাখে? আশ্বিনের বদলে বৈশাখে কেন? উত্তর নেই। আমি উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম নিজের ভিতরে।

নভেলেট লিখতে আরম্ভ করেছিলাম সেই ঘোড়াটিকে নিয়ে। সেই সময়েই যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো এক ভোরে আমি লিখতে বসে পেয়ে গিয়েছিলাম পলায়ন রহস্য। সে ছিল যেন প্রকৃতি এবং জীবনের রহস্য উদ্ধার।

সেদিন ছিল ভয়ানক বৈশাখ। ঘোড়ায় চেপে ঘোড়ার মালিক ফিরেছিলেন গ্রাম থেকে দীঘায়। রোদে ঘোড়াটির জিভ বেরিয়ে এসেছিল। সে দাঁড়িয়েছিল একটি নিম গাছের ছায়ায়। নবীন তরুর ছায়া ছিল না বেশি। ফলে বৈশাখের রোদে পুড়ছিল। গরম বাতাস বইছিল। বালিয়াড়ি তেতে গিয়েছিল ভীষণ। ঘোড়াটি ধুঁকছিল। এরপর দুপুরের শেষে আকাশের ঈশান কোণে মেঘের সঞ্চার হয়। ধীরে ধীরে ঘন কালো মেঘ ছেয়ে ফেলে সমস্ত আকাশ। সমুদ্র দিগন্ত থেকে মেঘ উঠে আসতে থাকে উপরে। ঘোর অন্ধকার হয়ে আসে। ঝড় এল। তারপরই বৃষ্টি। প্রবল বর্ষণে ভেসে যায় সব। উত্তাপ অন্তর্হিত হলো। বৃষ্টি থামে ঘন্টা দেড়ের পর। সন্ধে হয়ে আসে। সবদিক ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঘোড়াটি বৃষ্টিতে ভিজেছে কত। ঠান্ডা হয়েছে শরীর। আরাম হয়েছে তার। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধের পর চাঁদ উঠল। আশপাশের বালিয়াড়ির ধারের গর্তে, রাস্তার কোথাও কোথাও জল জমেছিল। রাত হলে চাঁদ আকাশের মাথায় উঠে এলে জোছনা পড়ল জমা জলে। আকাশে দেখা গেল পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশে। ঘোড়াটি অবাক হয়ে আকাশ মাটি দেখল। বাতাসে ঘ্রাণ নিল। তার মনে হলো আশ্বিন— শরৎকাল এসে গেছে। সকাল থেকে দুপুর পযর্ন্ত ছিল ভয়ানক গ্রীষ্ম। দুপুরের শেষে এল বর্ষা। তারপর আশ্বিনের পূর্ণিমা। শরৎকাল। একই দিনে দুই ঋতু পার করে আশ্বিনে এসে গেছে সে। সুতরাং চলো নিরুদ্দেশে। সেই যে সুবর্ণরেখার মোহনায় চর জেগেছে সবুজ ঘাস নিয়ে, সেখানে এসে গেছে ওড়িশার ভোগরাইয়ের ঘুড়ী, আগের বছর তার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল তার। মিলন হয়েছিল। সে খুটো উপড়ে পালালো এই বিভ্রমে। সারারাত ছুটেছিল সে জোছনার ভিতর দিয়ে। সকাল হতে ফিরে এল বৈশাখ। রোদ তেতে উঠতে লাগল। সে টের পেল আর ফেরার উপায় নেই। ভয়াবহ গ্রীষ্ম ফিরে এসেছে। বিভ্রম হয়েছিল। বিভ্রমে সে সমস্ত রাত ধরে মৃত্যুর দিকে ছুটেছে। অশ্বচরিত উপন্যাসের খসড়া ছিল এই। ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে শিলাদিত্য পত্রিকায় ছাপা হয় ‘বিভ্রম’ নামের সেই নভেলেট।

এই নভেলেট প্রকাশিত হলে অনেকের ভালো লেগেছিল। অচেনা লেখকের লেখা ছেপেছিলেন সুধীরবাবু পাণ্ডুলিপি পড়ে। আমার তখন একটি দুটি বই বের হচ্ছে প্রকাশকের ঘর থেকে। কিন্তু বিভ্রম নিয়ে আমার ভিতরে দ্বিধা ছিল। মনে হতো আরো কিছু লেখার আছে। আমি লিখতে পারিনি। বছর সাত বাদে ১৯৮৮ নাগাদ আমি আবার লিখতে আরম্ভ করি উপন্যাসটিকে। সামনে সেই নভেলেট। লিখেছিলাম। এক প্রকাশকের হাতে দিয়েছিলাম প্রকাশের জন্য। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য, তিনি পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মনে হয়েছিল বিভ্রম আর বই হয়ে বের হবে না। আমি আরো নভেলেট লিখেছি এই সময়ে, ‘আসনবনি’ নামের নভেলেট তো গল্পের বইয়ে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু ‘বিভ্রম’ আমার মাথার ভিতরে একটি কাঁকর ফেলে দিয়েছিল। গল্পের বইয়ে রাখিনি। আরো লিখতে হবে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না নভেলেটটি নিয়ে। পড়েই থাকল আরো দশ বছর। ১৯৯৭-এ রাজস্থানের মরুতে পরমানু বোমা বিস্ফোরনের পর আমি আবার নভেলেটটিকে সামনে রেখে নতুন উপন্যাস লিখতে শুরু করি। বিস্ফোরণের দিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। আমার ঘোড়াটি পালিয়েছিল সেইদিনই। আমি তা ১৯৮১ সালেই লিখেছিলাম। এই ১৭ বছরের মাথায় সেই বুদ্ধ পূর্ণিমাই হয়ে গেল পথ। রাজপুত্র গৌতমের অশ্ব কন্থক হয়ে গেল সেই বুড়ো টাট্টু। ভানু হয়ে গেল গৌতমের সারথি ছন্দক। তারা তপোবনে দিয়ে এসেছিল রাজপুত্রকে। তিনি ফিরবেন এই হিংসার পৃথিবীতে। ভগবান বুদ্ধ ফিরবেন। সারথি ছন্দক আর অশ্ব কন্থক অপেক্ষা করছে তার জন্য এই সময়ে। সময় ১৯৯৮। রাজপুত্র ফিরে এলে পৃথিবী হিংসা মুক্ত হবে। পলাতক ঘোড়া বিভ্রমে পড়েছিল। বিভ্রম তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। ছুটতে ছুটতে সে হিরোসিমায় গিয়ে পড়ে। সেখানে তখন কালো বৃষ্টি।

একটি উপন্যাস লিখতে সতের বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। লেখক নিজেই বোঝেন লেখা হয়েছে কি হয়নি। তিনি নিজেই নিজের পাঠক। নিজের জন্যই প্রথমে লেখেন। অশ্বচরিতের পর নিরুদ্দেশ যাত্রাই হয়ে

ওঠে আমার বিষয়। শেষ হয়নি সেই লেখা। ধ্রুবপুত্র এক নিরুদ্দিষ্ট কবির কথা। কবি নিরুদ্দেশ হলে মেঘও অন্তর্হিত হয় নগর থেকে। এরপর নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান লিখি এক নিরুদ্দিষ্ট জুটমিল শ্রমিককে নিয়ে। ধনপতির চর নিয়েই নিরুদ্দেশ যাত্রা করে চরবাসী। সোনাই ছিল নদীর নাম এক নিরুদ্দিষ্ট নদীর কথা। আর অতি সম্প্রতি লেখা পুনরুত্থান উপন্যাসেও নিরপরাধ পুলিশ কর্মী নিরুদ্দেশে যায় নিজেকে বাঁচাতে, এবং ফিরেও আসতে চায় লক আপে হত মানুষটির পুনরুত্থান ঘটিয়ে। মর্গ থেকে বেরিয়ে আসে মৃত। চাপা পড়া খনি থেকে উঠে আসে নিরুদ্দিষ্ট। একটি উপন্যাসই যেন শেষ হচ্ছে না। বারবার লিখতে হচ্ছে নিরুদ্দিষ্টের কাহিনি নানা রকমে।

পুনশ্চ: পশ্চিম আমেরিকার লস এঞ্জেলস থেকে ১৫০ মাইল দূরে যশুয়া বৃক্ষ ন্যাশানাল পার্ক। মরু অঞ্চল। সব নেড়া পাহাড় আর মধ্যম উচ্চতার যশুয়া বৃক্ষ। নিঝুম জনবিরল অঞ্চল। সেখানে একটি উপত্যকার নাম "লস্ট হর্স ভ্যালি" আর রাস্তার নাম লস্ট হর্স রোড। ভানুর ঘোড়া প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে কি সেই মরু অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছিল হিরোসিমা পার হয়ে? প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারেই তো ক্যালিফোর্নিয়া, লস এঞ্জেলস আর যশুয়া বৃক্ষের মরু-পাহাড়ের অঞ্চল।

বিবেক আছে বিবেক নেই

বিবেক নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষের বড়ই মাথা ব্যথা। বিবেক যদি লকারে ঢুকিয়ে চাবির পাশ ওয়ার্ড ভুলে যান বা চাবিটি গঙ্গা গোদাবরী নর্মদার জলে ফেলে দেন তবেই না আপনি আপনার জীবনে সব পাবেন। ধন ও মান। ক্ষমতা। বহুজনের সম্ভ্রম। আপনি দুধে ভেজাল দেন, ভেজাল ওষুধের ফ্যাক্টরি খুলে বসেছেন, ভাগাড়ের মাংসর কারবারে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন, ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোটি টাকা লোন নিয়ে পগার পার হয়ে বিবেকের বাণী দিচ্ছেন, সবের মূল সেই চাবিটি যা কি না গঙ্গা গোদাবরীর জলে আপনি ফেলেছেন কি ফেলেননি। জীবনে সবই হবে বিবেক বর্জিত হয়ে থাকলে। আর যদি অপরটি হয়, বিবেক নিয়ে দিন রাত ভাবেন, দুধের লাইন থেকে, সমস্তদিন যা যা যেভাবে করা উচিত, তা না করে পারেন না। ভিতর থেকে সায় পান না লাইন ভেঙে আগে নিজের কাজটি করে ফেলার, কেরানি হয়ে টেবিলের নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে অকাজের কাজটি আগে করে দেওয়া কিংবা বড় সায়েব হয়ে ফাইল জমিয়ে রেখে চাপ রাখা, কিছু বেনিফিট আসুক, তারপরে তো ফাইল নড়বে। আমি এক বিবেকবাবুর কথা বলি, একেবারে জীবনের অভিজ্ঞতা। ভেজাল নেই। অবাঙালি বড় সায়েব তরুণ, বছর চল্লিশ। প্রাণময়। তাঁর অধীনে যিনি ছোট সায়েব তিনি পুরাতন। ছোট সায়েব লেখেন। বই আছে কিছু। নাম আছে যে অবাঙালি বড় সায়েব জানেন। বড় সায়েবের পরিবার এই কলকাতা শহরের একশো বছরের পুরনো পরিবার। তাঁদের পরিবারের ব্যবসা আছে। তিনি ব্যবসায় না জুতে সিভিল সার্ভিস দিয়ে সরকারি চাকরিতে ঢুকেছেন। বলেন পাবলিক সার্ভিসে বহুত আনন্দ আছে, ব্যবসায় তা নেই। আনন্দ কেমন, না পাবলিকের মুখের হাসি দেখতে তাঁর ভালো লাগে। ভয় আর আশঙ্কা নিয়ে যে পাবলিক আসে, তার কথাটি মন দিয়ে শুনা গেলে অর্ধেক ভয় কেটে যায়। আর কাজটি যদি হয়ে যায়, সে যে কেমন আলো ফুটে ওঠে মুখের উপর তা তিনি এক্সপ্লেন করতে পারবেন না। তিনি বলেন 'দত্ত সায়েব আপনি লিখেন, আপনি তা লিখতে পারেন'।

হ্যাঁ, বড় সায়েবের কাছে অনেক রকম অনুরোধ আসে, এই কাজটি করে দিন, ওই কাজটি করে দিন। আইন বড় বালাই। আইনকে আবার তিনি যত ভয় করেন, তাঁর অধীনস্ত ছোট সায়েব তার চেয়ে বেশি ভয় করেন। চাকরি আছে বছর দেড়। সারাজীবন উদ্বিগ্ন হয়ে কাটিয়ে গেলেন, ভুল হলো নাকি। আইনের বাইরে কাজ হলো নাকি? অল্প বয়সে ঝুঁকি নিয়ে যা করেছেন, করেছেন, কিন্তু তা করেছেন বিবেকের তাড়নায়। বিবেকের তাড়নায় তিনি আইন ভেঙেছিলেন। বেশি বয়সে বিবেক বিসর্জন দিয়ে আইন ভাঙতে তিনি পারবেন না। তা করতে মন সায় দেয় না। ভয়ও করে। অথচ উপর থেকে চাপ আছে। খুব চাপ। খোদ মহাকরণের চাপ। যা হয় না, তা যেভাবে হোক করে দিতে হবে। অল্প বয়সে বিবেকের তাড়নায় যে আইন ভেঙেছিলেন তার কথা মনে পড়ে। নিঃসন্তান বিধবা এক বৃদ্ধা যাবেন কাশীতে তীর্থ করতে, এক বিঘে জমি তার জন্য বেঁচে দেবেন। দেওরকে বলেছিলেন, এক বিঘে ধানীজমি নিয়ে তীর্থ যাত্রার পাথেয় দিতে। দেওর দিয়েছিল। বিনিময়ে তাঁর অজান্তে যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় দলিলে ঢুকিয়ে নিয়েছিল। ভিটেটুকু পর্যন্ত। এক মাস বাদে তিনি কাশী থেকে ফিরে দ্যাখেন তাঁর ভিটেই আর নেই। মাটির বাস্তুভিটে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে দেওর। সব দখল করে নিয়েছে রেজিস্ট্রি করা দলিলের জোরে। তিনি তরুণ বিবেকবান কর্মী। সেই বিধবা তাঁর কাছে অভিযোগ করলে, তিনি সেই দলিলের নথিবন্ধন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। যা করা যায় না তাই করেছিলেন। এর ফলে ভুগতে হয়েছিল তাঁকে, কিন্তু শেষ অবধি তাঁর জয় হয়েছিল। বিবেকবান উপরওয়ালাকে সব লিখিত ভাবে জানালে তিনি সমস্ত কথা শুনে, আইনের পথ বাতলে দিয়েছিলেন। কী ভাবে রায় লিখতে হবে বলে দিয়েছিলেন। আইন তো আইন। লিখনে তার নানা ব্যাখ্যা করা যায়। এখনো লিখনে মহাকরণের অনুরোধ মান্য করা যায় যদিও তা এক প্রতিষ্ঠানের বেআইনি কাজকে মান্যতা দেবে।

জমি হাঙরের পক্ষে দাঁড়ানো হবে। কাজ আর হয় না। উপর থেকে চাপ আসে, তবু ছোট সায়েব ফেলে রাখেন। কী ভাবে করবেন? বড় সায়েবের অনেক গুণ। একবার এক ধনী ব্যক্তির কাজ আটকে ছিল। আগে করার জন্য তিনি এসেছিলেন দুটি সিঙ্গল মল্ট হুইস্কির বোতল নিয়ে। দুই সায়েবকে দেবেন। বড়দিন আসছে তো। বড় সায়েব ছোট সায়েবকে ডেকেছিলেন তাঁর চেম্বারে। তখন ধনী ব্যবসায়ী বসে আছেন সেখানে। বড় সায়েব জিজ্ঞেস করলেন ছোটকে, আচ্ছা, দত্ত সাহাব, আপনি ড্রিঙ্ক করেন? ছোট সায়েব চমকে গেছেন, বাইরের লোকের সামনে এই প্রশ্ন? জিজ্ঞেস করলেন, কেন স্যার?

করেন কি না বোলেন।

মাঝে মধ্যে, খুবই কম।

বাড়িতে ড্রিংক কোরেন না?

নো স্যার।

বড় সায়েব বলেন, হামার বাড়িতে ভি চোলে না, ওয়াইফ জানলে তুলকালাম হয়ে যাবে, আপনার?

ছোট সায়েব বলেন, আমার বাড়িতেও সে চল নেই স্যার।

লুকিয়ে রেখে দিবেন।

ছোট সায়েব বলেন, সম্ভব নয় স্যার।

হামার পক্ষেও তো ইম্পসিবল, তাহলে কী হবে?

ছোট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বুঝতে পারছি না স্যার।

এই দেখেন না, মিঃ গণপত, দুটা সিঙ্গল মল্ট হুইস্কি এনেছেন, হামি নন ড্রিংকার, আপনি ভি ড্রিংক কোরেন না, তবে কী হবে, বাড়িতে নিয়ে গেলে বিরাট অশান্তি হবে, সংসার ভেঙে যাবে, রিলেশন ব্রেক করে যাবে, দেখুন মিঃ গণপত, ইম্পসিবল, নিয়ে রাখার জায়গা নেই, অফিসে তো মদের বোতল রাখা যায় না, স্যরি, হামি ভাবলাম মিঃ দত্ত লিখেন, মদ-টদ চোলে, শক্তিদাকে দেখেছি একবার, কত খেতে পারতেন, কিন্তু ইনি তো শক্তিদা নন, পোয়েট হলে হতো ঠিক, ইনি দেখি হামার মতো, মদ না খেয়ে যে লিখা যায়, তা আমি এই প্রথম দেখলাম, স্যরি মিঃ গণপত।

মিঃ গণপত এবং তাঁর সঙ্গী বেরিয়ে যেতে বড় সায়েব বিষণ্ণ মুখে বললেন, কী ভাবে বলুন দেখি হামাদের, সব বিসর্জন দিয়ে এসেছি, হুইস্কির বোতল দিয়ে কাজ করাবে! বহুত ইনসাল্টেড ফিল করেছি আজ, চলুন আজ সন্ধ্যেয় হয়ে যাক।

এই বড় সায়েব চাপ খাচ্ছেন মহাকরণ থেকে। খোদ মন্ত্রীর স্ত্রী ওই জুয়েলারির নিয়মিত ভিজিটর। অনুরোধ এসেছে মন্ত্রীর স্ত্রীর, ভায়া মহাকরণ। একদিন বড় সায়েব জিজ্ঞেস করলেন ছোটকে, হবে না, না?

বেআইনি হবে স্যার।

হুঁ, কিন্তু প্রচুর চাপ।

কয়েকদিন বাদে অফিসের শুরুতেই বড় ডাকলেন ছোটকে, দত্ত সায়েব, প্লিজ কাম।

দত্ত সায়েব গিয়ে দ্যাখেন সিংহ সায়েবের সামনে বসে আছেন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর হাত খুব বড়। স্বয়ং মন্ত্রীর স্ত্রী তাঁর ক্লায়েন্ট। তিনি নিজেই এসেছেন কাজটি কবে হবে জেনে নিতে। তাঁর উপস্থিতি আরো চাপের। সিংহ সায়েব বললেন, দত্ত সায়েব বসুন, আপনি তো লিখেন।

দত্ত অবাক, আবার এক হুইস্কি কেস নাকি? বললেন, কেন স্যার?

সিংহ সায়েব বললেন, নভেল লিখেন তো, দেখুন মিঃ চাউদুরি, ইনি একজন রাইটার, অ্যাওয়ার্ড ভি পেয়েছেন।

চৌধুরী হাত বাড়ালেন, আপনার কী কী বই আছে বলবেন, হামি পারচেস করাব।

আপনি বাংলা পড়েন? দত্ত জিজ্ঞেস করলেন।

বলতে পারি, পড়তে পারি না, হামার সব এমপ্লয়ী আছে, তারা পড়বে, পুরা এডিশন কিনে নেব।

বাহ বাহ বাহ, আপনি রয়ালটি পাবেন দত্ত সায়েব, আচ্ছা লিখে কত হয় বছরে?

দত্ত বলতে সিংহ হিশেব করলেন, মানে পার মান্থ দশ বারো হাজার।

কম বেশি।

তাতে কী হবে, এখন আপনি পঁচাশের উপর পান, দুটা ইনক্রিমেন্ট আছে, রিটায়ারমেন্টের সময় ষাট হয়ে যাবে প্রায়, তাই তো।

হবে হয়তো।

বারো হাজারে কি সংসার চলে মিঃ দত্ত?

মাথা নাড়লেন দত্ত, কী করে চলবে, সমরেশ বসু ব্যতীত আর কোনো লেখক লেখাকে পেশা করতে পারেননি, বাংলায় লিখে তা হয় না।

সিংহ চুপ করে থাকলেন, চিন্তিত হয়ে পড়লেন, বললেন, হামি ভেবেছিলাম আপনি লাখ লাখ টাকা লিখে পান, হামি ভেবেছিলাম...।

দত্ত বললেন, ভুল ভেবেছিলেন।

তাহলে কী হোবে মিঃ চাউডুরী?

মিঃ চৌধুরী বললেন, উনি তো চাকরির ইনকাম করেন, লিখাটা এক্সট্রা ইনকাম।

হামার বাড়ির বিজনেস আছে, পিতাজি চেয়েছিল হামি বিজনেসে ঢুকি, হামি না হয় বিজনেসে ঢুকে গেলাম, কাঠের বিজনেস করব, আসাম থেকে কাঠ আনব আর কলকাতায় বিক্রি করব, লেকিন দত্ত সায়েবের তো বিজনেস নেই, লিখাটা বিজনেসের মতো হয়নি, উনি কী করবেন?

মতলব? সূরজপ্রসাদ চাউডুরী বা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন।

আপনার ফাইল ছেড়ে দিলে, মতলব আপনার ফেবারে কাম করে দিলে হামাদের দুজনের সার্ভিস নট হয়ে যাবে, উনি চাকরি শেষ করে এনেছেন, পেনশন গ্রাচুইটি কুছু মিলবে না, যে সায়েবরা বলছেন করে দিতে, তারাই বলতে পারে কেন করলে, কী আইনে করলে, যে লোকের ফেবারে কাজ হওয়া দরকার, তা না হলে, সে আর এক সায়েবকে ধরবে, চাকরি গেলে হামার কুছু হোবে না, বিজনেস আছে, লেকিন দত্ত সায়েবের কী হোবে বলুন, লিখে উনি অনেক পান হামি তাই ভেবেছিলাম।

সূরজপ্রসাদ চৌধুরী আর থাকেননি। কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন অবিলম্বে। তিনি চলে যেতে দত্তকে সিংহ বলেছিলেন, নেভার, নেভার, অন্যায় কাজ করবই না দত্ত সায়েব। অপমান লাগে যখন বলে, আপনি করুন পুষিয়ে দিব। সেই ঘটনার কিছুদিন পর সিংহ বদলি হন। দত্ত তো রিটায়ার করলেন কদিন বাদে। দত্ত আর সিংহর ঘটনার সাক্ষী আমি। আবার এমনো আছে বিবেক, মানবিকতা বিসর্জন দেওয়া আমলা নিরুপায় মানুষকে আরো নিরুপায় করে দিয়েছেন। বিবেকবান মানুষের চেয়ে ক্ষমতাবান মানুষের প্রভাব এই পৃথিবীতে অনেক বিস্তৃত। আর ক্ষমতার প্রধান চিহ্ন হলো বিবেক বিসর্জন দেওয়া। বিবেক বিসর্জন না দিলে আপনি ক্ষমতার মধু আস্বাদনে বঞ্চিত হবেন। তথা কথিত শিক্ষিতজন, সমাজে যাঁরা প্রভাবশালী, তাঁরা কি বিবেকবান হন? গ্রামের চাষীবাসী মানুষকে দেখেছি একটি অন্যায় করতে অধর্ম হবে বলে পিছিয়ে যেতে। আর ধর্মাধর্ম যিনি অন্তরে বিশ্বাস করেন না, তাঁর রোষে পড়ে লোকে ভিটেমাটি ছাড়া হয়, চাকরি হারায়। বিবেকবান হতো যদি এই পৃথিবী তাহলে হিরোসিমায় পরমানু বোমা পড়ত না, সেই লিটল বয় সমস্ত বিবেক তার পেটে পুরে নিয়ে হিরোসিমার উপর তেজস্ক্রিয় মেঘে কালো বৃষ্টি নামিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, এক একটা খবর আসে, অটো ড্রাইভার অনেক টাকার ব্যাগ পেয়ে, অলঙ্কারের ব্যাগ পেয়ে থানায় এসে জমা দিয়েছে। বিবেকের আনন্দ এই। বিবেক আছে কোথাও। সকলেই লকারের চাবি গ্যাঙের জলে ফেলে দেয়নি। একটা কথা বলি, অতি সংগোপনে বলি, বিবেকবান অটো-ড্রাইভারের কথা শুনে,আমার কি মনে হয় না, মেয়ের বিয়ের জন্য জুয়েলারি থেকে কেনা কয়েক লাখ টাকার গয়নার পোটলা যদি আমি পেতাম, মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে তোলা কয়েক লাখ টাকার টাকার ব্যাগ যদি আমি পেতাম, সাময়িক ভাবে কোথায় রেখে দিতাম তা

সমস্ত খোঁজাখুঁজির সময় পার করাতে। ব্যাঙ্কের লকারে? লকারের সেই চাবি কোথায় রাখতাম যতদিন না স্বাভাবিক হয় সব। চাবি লুকোতাম কোথায়, বিবেকের কোন ঘরের কোন দেরাজে? বিবেক বড় বালাই।

আড্ডাবাজের জীবন

আড্ডাবাজের জীবনে কিছু হয় না এই বাক্য জ্ঞান হওয়া ইস্তক শুনে আসছি। কিন্তু আড্ডা ব্যতীত জীবন চলতেই চায় না। কিছু না হলে না হবে। চাই না কিছু। আড্ডা চাই। গল্পের আড্ডা। সাহিত্যের আড্ডা। তাস পাশার আড্ডা নয়। তাস আমি পছন্দ করি না।

আমার ছেলেবেলার কিছুটা দিন কেটেছে বসিরহাটের অদূরে দণ্ডীরহাট গ্রামে। আর সেই গ্রাম ছিল যেন আড্ডার পীঠস্থান। ছোট একটি বাজার ছিল হাই ইস্কুলের কাছেই। সেই বাজারে ছিল গোড়া বাঁধানো এক বকুল গাছ। সেই বকুলতলায় আমার আড্ডাজীবন শুরু। তখন ইস্কুল বালক। তবু আড্ডা দিয়েছি খেলার পর। ইস্কুল ছুটির পর। বাজারে ধনাদার চায়ের দোকানের ধরাটে ছিল বড়দের আড্ডা। ধরাট হলো বাঁশের চটা জুড়ে জুড়ে বেঞ্চির মতো করা। ওই ধরাটে বসলে তার জীবনে আর কিছু হয় না। এই কথা নীতিবাগীশ মেজদাদের মুখে শুনতাম। সেই ধরাটের আড্ডা আর কলকাতার রকের আড্ডা একই রকম বলা যায়। আমাদের কিশোর বেলায় কিংবা সদ্য যৌবন বেলায় রকের আড্ডায় যে রং ছিল বন্ধুতার, তা এখন নেই। কলকাতা শহর থেকে রকই উঠে গেছে। তবে উত্তর কলকাতায় এখনো আছে। শ্যামপুকুর স্ট্রিটে খুব ভালো আড্ডা দিয়েছি আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে। রকে। থাকতেন এখন খ্যাতিমান ভাস্কর বিমল মণ্ডল। থাকতেন প্রখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার। থাকতেন প্রদ্যোত ভদ্র, কল্যাণ সর্বাধিকারী। এই আড্ডা ছিল সাহিত্য আর শিল্পের। সদ্য প্রকাশিত গল্প নিয়ে কথা হতো এখানে। বিমলের বাড়ি শ্যামপুকুর স্ট্রিটেই। তার কাজ দেখতে তার বাড়িতেও যাওয়া হতো। এখনো রবিবারে পুরনো পাড়ায় দেখা যায় পুরনো আড্ডা। রক না পেলে চায়ের দোকান। তাও না পেলে রাস্তার ধারে,ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। আড্ডায় বন্ধুতা বাড়ে। আড্ডায় মত বিনিময় হয়। আড্ডা অতি মধুর। নিউ ইয়র্কের কুইনস সিটিতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বাঙালি বাংলাদেশিরা চায়ের কাপ হাতে আড্ডা দিচ্ছে, দেখেছি। আমিও যোগ দিয়েছিলাম।

আমি আড্ডা দিতে ভালবাসি। আড্ডা দিতে দিতে বড় হয়েছি। অভ্যাসটা রাখব কোথায়? জানি আড্ডা সময় খেয়ে নেয়, নিক, আড্ডা না দিলে যে ভাত হজম হয় না। আড্ডা কেরিয়ার নষ্ট করে, করুক, কিন্তু আড্ডা না হলে মন প্রসারিত হয় না। অনেক কিছু পাওয়া হয় না। যেহেতু বহুদিন নিবার্ন্ধব প্রায় থেকেছি বাইরে, দুর্গম গ্রামে, আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকতাম কলকাতার আড্ডার জন্য। আড্ডার বন্ধুদের সঙ্গে মানসিকতার মিল না থাকলে সেই আড্ডা ভেঙে যায়। নাটকের লোকজন একসঙ্গে, সিনেমার লোক একসঙ্গে আড্ডা দেন। আমি দেখেছি নাটকের আড্ডা। ন'টায় বসে সেই আড্ডা বেলা দুপুর পযন্ত গড়াত আমাদের ফ্ল্যাটে। বিভাস চক্রবর্তী, অশোক মুখোপাধ্যায়, মাণিক রায়চৌধুরীরা আসতেন।

শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্খ ঘোষের বাড়ির আড্ডায় ছুটির দিনে কোনো বিরাম থাকে না। সকাল থেকে চলতে থাকে। বেলা তিনটে অবধি তা গড়াতে দেখেছি আমি। সেই আড্ডা কলকাতা শহরের সেরা আড্ডা। সেখানে তরুণ কবি থেকে প্রবীন কবি, গল্পকার, সিনেমা নির্মাতা, চিত্রকর, গায়ক থেকে অভিনেতা, নির্দেশক, কে না যান? ঘুরে এসে আনন্দ। আড্ডা শুধু শঙ্খবাবুর সঙ্গে নয়, সকলের সঙ্গে সকলের। আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেই আড্ডায় কয়েকবার যাওয়ার। অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

লিখতে আরম্ভ করলে বন্ধু বদলে যায় আমার। পাড়ার আড্ডা আর হয় না। পুরনো আড্ডা ভেঙে যায়, নতুন আড্ডা শুরু হয়। সেই আড্ডা অবশ্যই সাহিত্যের। পাড়ায় আড্ডা হত বাল্যকালের বন্ধুদের সঙ্গে। তারপর 'একাল' নামের একটি লিটল ম্যাগাজিন ঘিরে। ম্যাগাজিনটি পাড়া থেকেই বেরোত। সম্পাদক নকুল মৈত্রের বাড়ি। তাঁর সঙ্গে কফি হাউস। চায়ের দোকান। গল্প পড়া হত। সে এক দিন গেছে। ১৯৭৩-এর শেষ থেকে আমি কলকাতার বাইরে। ১৯৭৫-এর প্রথমে কবিপত্রের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ। এক পক্ষ অন্তর

কলকাতা ফিরে ২২/বি প্রতাপাদিত্য রোডে কবিপত্রের আড্ডায় গিয়ে পড়েছি। সেখানে কত নতুন প্রতিভাবান বন্ধু হয়েছিল। কবি তুষার চৌধুরী, অনন্য রায় (দু'জনেই এখন নেই), সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সমীর চট্টোপাধ্যায়, বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দাস, শচীন দাস, অসীম চক্রবর্তী (শেষ তিনজনই এখন নেই) ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী। একদিন এক আড্ডার সন্ধ্যায় বটুকদা (জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র), একদিন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়..., কতজন। বটুকদা নিজ কন্ঠে, নবজীবনের গান শুনিয়েছিলেন। এস মুক্ত কর, মুক্ত কর...। কবিপত্রের আড্ডা সেই পঁচাত্তর থেকে। সেখানেই শৈবাল মিত্র, চণ্ডী মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয়। আমার সেই সব বন্ধু অগ্রজরা অনেকেই তো নেই। শ্যামলদা, চণ্ডীদা, শৈবালদা, দীপঙ্কর, শচীন, অসীম, তুষার অনন্য। বৌধায়ন এখন ইংরেজি ভাষার মান্য কবি। আমি প্রায়ই নতুন গল্প বের করতাম ব্যাগ থেকে। মেদিনীপুরের নিঃসঙ্গবাস আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিত। একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল সকালে উঠে লিখতে বসা। সেই অভ্যাস রয়ে গেছে। আমাকে নিয়ে তুষার বলত, সুলেখা কোম্পানির পাইপ লাইন অমরের কলমে ঢুকে গেছে। হা হা হা। কী হাসি। নির্মল বন্ধুতা। কী লিখব সেই সব দিন আর আড্ডার কথা। বারদুয়ারি, খালাসিটোলা... আড্ডা চলত। ১৯৮৩ নাগাদ আমার জন্ডিস হয়। তুষার বলেছিল, মদ খেয়েছি আমি, জন্ডিস হয়েছে তোর।

কত আড্ডার কথা মনে পড়ে। কলেজ স্ট্রিটে পুস্তক প্রকাশনী নামে একটি প্রকাশন সংস্থা সেই ১৯৭৫-৭৬ নাগাদ ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। আর করেছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সেই প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার ছিলেন কনকবরণ মিত্র। বেলেঘাটা সুভাষ সরোবরের কাছে থাকতেন। কলেজ স্ট্রিটে তাঁর ঘরে এসে বসতেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। প্রথম তাঁকে সেখানে দেখে আমি অভিভূত। সঙ্গে সমীর চট্টোপাধ্যায়, বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়, শচীন দাস, কখনো তুষার থাকতেন। পবিত্রদা আর প্রভাত চৌধুরী তো ছিলেনই। সেখানে কতদিন আড্ডা দিয়েছি সেই পিতৃপ্রতিম লেখকের সঙ্গে। তিনি বলতেন সাহিত্যের নানা কথা। আমার গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতা শুনতেন নিবিষ্ট হয়ে। শেষে বলতেন, এ সব আমি দেখি নি, তুমি দেখেছ, তুমি লিখতে চেষ্টা করো। আমি একটি গল্প লিখেছিলাম ১৯৮৮ নাগাদ, 'বাদশা ও মধুমতী'। যে ঘটনা সেই গল্পের সূত্র, সেই ঘটনা তাঁকে আমি বলেছিলাম ১৯৭৬ নাগাদ। তিনি অবাক হয়ে শুনেছিলেন। বলেছিলেন লিখতে। সেই লেখা এল বারো বছর বাদে সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকায় তাঁকে স্মরণ করে একটি লেখা লিখতে গিয়ে। যা দেখিনি তাও মনে পড়ে গিয়েছিল যেন। তিনি ছিলেন লেখকের লেখক। এখনো তাঁকে পড়ি। এক জীবনে এত পাওয়া হয় না সাধারণত। মনে পড়ে এক এক সন্ধ্যায় আমরা বন্ধুরা, সমীর আমি গিয়ে হাজির হতাম পরিচয়ের আড্ডায়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন পরিচয় সম্পাদক। তিনি কথা বলতেন সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে। জানি না কবে শ্রোতা থেকে সেই আড্ডার অংশীদার হয়ে গেলাম আমরা। পুজোর পর বড় আড্ডা হত পরিচয়ে। পুজো সংখ্যার লেখা নিয়ে সকলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানাতেন। আমি পরিচয়ের ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংখ্যায় দীপেনদার সঙ্গে বসে সমস্ত দুপুর প্রুফ দেখায় সাহায্য করেছি। কপি মেলাতাম। দীপেনদা কাজের সঙ্গে সঙ্গে কত বিষয়ে না কৌতূহলী সেই তরুণের কৌতূহল মেটাতেন। তাঁর কাছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনেছি, প্রগতি লেখক শিবিরের কথা, শম্ভু মিত্রের কথা...কত কথা। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প, মানিক - তারাশঙ্করের উপন্যাস নিয়ে কথা শুনেছি। কোন লেখা পড়তে হবে, তিনি জানাতেন। পরিচয় পত্রিকায় গল্প লিখি ১৯৭৫ সালে। শকুন্তলার জন্ম। সেই গল্প হারিয়ে গেছে। শারদীয়তে লিখি ১৯৭৬ সালে। গল্পের নাম রাজকাহিনি। দীপেন্দ্রনাথের সঙ্গে সারা দুপুর কথাবার্তা আমার জীবনে অনেক কিছু দিয়েছিল।

তখন কিন্তু ২২/বি প্রতাপাদিত্য রোডে আমাদের আড্ডা চলছিল। কবিপত্রের আড্ডা। এই সময়ে পবিত্রদা একদিন বললেন, শ্যামলদা, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন প্রতাপাদিত্য রোডে, আর কয়েকটা বাড়ি পরে ৫১/১ নম্বরে, চলো আলাপ করে দিই তোমাদের সঙ্গে। কুবেরের বিষয় আশয়ের শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়! সেই আমাদের আড্ডা কবিপত্র থেকে শ্যামলদার বাড়ি আড্ডা স্থানান্তরিত হয়ে যেতে লাগল কখনো কখনো। আর

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আর মনোরম দিন। তখন নিজেকে গড়ে তোলার সময়। ওই সময়ে অমন এক মহৎ লেখকের সঙ্গ পাওয়া জীবনের দুর্লভ অর্জন। শ্যামলদার সঙ্গে আড্ডায় আমি জীবনকে যেটুকু শিখেছি, জেনেছি, তাই নিয়ে এতটা বছর কেটে গেল। সেই আড্ডায় তুষার সমীর প্রভাতদা, শৈবালদা, কতজন যে বিভিন্ন সময়ে একসঙ্গে। এমনই আড্ডা আর গল্পের মানুষ ছিলেন তিনি, কলেজ স্ট্রিট থেকে টেনে নিয়ে গেছেন তাঁর বাড়ি। আমার হাতে ব্যাগ। আমি মেদিনীপুর থেকে এক পক্ষ পর বাড়ি ফিরছি। শ্যামলদা বাড়ি ফিরতেই দিলেন না। পরের দিন সকালে ফিরলাম।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি বললেন, নদীর বয়স হয়, জানো? আমি চুপ করে আছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেই কুলটিকরিতে চালের দর কত? হাটে যাও? তিনি বললেন, বিভূতিভূষণের ইছামতী পড়েছ? অনুবর্তন, দৃষ্টি প্রদীপ? মেঘমল্লার গল্পটি? জীবনটাকে দেখে নাও। জরিপের এক চেনে কত লিংক থাকে? চাষা তার হেলে বলদের সঙ্গে কথা বলে, শুনেছ?

তিনি আমার আরম্ভে আমাকে পেলেই এই সব জিজ্ঞেস করতেন। এক সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত, তুই ধারাবাহিক উপন্যাস লিখবি। আমি যে লিখিনি কখনো? বন্ধুরা, তুষার সমীর বলল, চ্যালেঞ্জ নে। লেখ। তিনি বলেছিলেন, সম্পাদক বললে, না করতে নেই। আমার উপন্যাস লেখার শুরু তাঁর প্ররোচনায়। "পাহাড়ের মতো মানুষ" লিখেছিলাম, তখন আমি ২৭। কোন সূত্রই ছিল না, লিখতে আরম্ভ করলাম ডুলং নদীর তীরে রাজবাড়িতে ফিরে। উপন্যাস লিখতে শিখেছি লিখতে লিখতে। তিনি বলতেন, কচু গাছ কাটতে কাটতে তলোয়ার চালাতে শেখে সৈনিক, লিখতে লিখতে লেখক হয়। এখন সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে।

মহাশ্বেতাদির বাড়িতেও সেই সময়ে, তার পরেও কম আড্ডা হয়নি। অসীম চক্রবর্তী, জয়ন্ত জোয়ারদার, নির্মল ঘোষ, কলকাতায় এলে দীপঙ্কর চক্রবর্তী(অনীক সম্পাদক) আরও কত মানুষ। তাঁর সঙ্গে আড্ডাও ছিল এই জীবনের বড় পাওনা। তাঁর বাড়িতেই আমি তৃপ্তি মিত্রকে দেখি একদিন। দুপুরে গিয়ে দেখি তাঁরা তাঁদের কম বয়সের কথা বলছেন। সেই তেতাল্লিশের মন্বন্তরের কথা। মায়ের কোলে ক্ষুধার্ত শিশুর মৃত্যু, লঙ্গরখানা, পথে মৃতদেহ পড়ে। আমি এখনো সেই কথা স্মরণ করে শিহরিত হই। আমাদের সেই আড্ডায় গীতা ঘটকের গানও শুনেছি মহাশ্বেতাদির বাড়িতে।

আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে রমাপদ চৌধুরীর ঘরে ছিল শনিবারের আড্ডা। আমি বহুদিন সেই আড্ডায় থেকেছি। সাহিত্য, শিল্পই ছিল সেই আড্ডার বিষয়। শনিবারের শেষবেলায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বুদ্ধদেব গুহ কোনো কোনদিন আসতেন। বুদ্ধদেব গুহ, সিরাজদা আর শীর্ষেন্দুদার খুনসুটি ছিল অসামান্য। আসতেন হিমানীশ গোস্বামী, প্রখ্যাত চিত্রকর সুধীর মৈত্র, লেখক রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু... কে নয়? আমাদের সমসাময়িক বন্ধুরা, রাধানাথ মণ্ডল, শিবতোষ ঘোষ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই কুণ্ডু, দীপঙ্কর দাস, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নবকুমার বসু, মালবী গুপ্ত...থাকতেন। রাধানাথ এখন বেঁচে নেই। লন্ডন থেকে এলে নবকুমারের সঙ্গে দেখা হয়। সে এক মহাআড্ডাবাজ। খুব বন্ধুবৎসল। রমাপদবাবুর ঘরের আড্ডায় তিনি শুনতেন বেশি, বলতেন কম। আবার তাঁর মুখেই শুনেছি সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কলকাতার কথা। মার্কিন সোলজারদের কথা। খড়গপুরে তাঁর শৈশবের কথা। একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন রেলের কামরায়। তাঁরা কবিকে দেখতে অচেনা ফুল হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জানালা দিয়ে তাঁর হাতে সেই ফুল তুলে দিতে, তিনি চিনতে পেরেছিলেন, বললেন, মুচকুন্দ! রবীন্দ্রনাথের রূপ বর্ণনা করেছিলেন রমাপদবাবু। রমাপদ চৌধুরীর ঘরে সেই আড্ডায় এমনি কত কথা শুনেছি। তিনি তরুণ লেখকদের সাহচর্য পছন্দ করতেন। তাঁর সঙ্গও অনেক দিয়েছে আমাকে।

আড্ডায় তো পাওয়া যায়। দেওয়া নেওয়া হয়। আমি এখন বুঝতে পারছি পেয়েছি বেশি। অনেক অনেক। সমকালের লেখকরা এক সঙ্গে বসে নতুন লেখা পাঠ হতো। রাধানাথের ছিল গল্পচক্র। আমরা ছিলাম তার অংশীদার। সেখানে কত গল্প পড়েছি পাণ্ডুলিপি থেকে। শুনেছি কত গল্প। এমনি এক অনতি সন্ধ্যায়

এসেছিলেন সমরেশ বসু ও তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী। বহুরাত অবধি তাঁর কাছে শুনেছিলাম 'দেখি নাই ফিরে' রচনার প্রস্তুতি কাহিনি। তখন তিনি লেখার জন্য তৈরি হচ্ছেন। উপাদান সংগ্রহ করছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ, শ্যামলদা, মহাশ্বেতা, রমাপদ চৌধুরীর পরে আমার কাছে যে আড্ডা যে সংসর্গ মূল্যবান হয়ে উঠেছিল তা ছিল প্রতিক্ষণ পত্রিকা ঘিরে। প্রতিক্ষণ আমাদের সাহিত্যে বড় একটা ছায়া ফেলে গেছে। এখানে শিল্প নির্দেশক ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী। তিনি পত্রিকার অলঙ্করণে এনেছিলেন অভিনব সৌন্দর্য। কবিতার পাতায় অলঙ্করণ প্রথম প্রতিক্ষণেই দেখি। প্রতিক্ষণ সম্পাদনা করতেন স্বপ্না দেব। প্রকাশক প্রিয়ব্রত দেব। প্রতিক্ষণের মতো রুচিমান সাময়িক পত্র আমি আর দেখিনি। এই পত্রিকার পুজো সংখ্যার অলঙ্করণ করতেন বিখ্যাত চিত্রকররা। আমার উপন্যাস হাঁসপাহাড়ির ছবি এঁকেছিলেন যোগেন চৌধুরী। পাতা জুড়ে সব রঙিন ছবি। প্রতিক্ষণের আড্ডা বসত মঙ্গল আর বৃহস্পতিতে। সেই আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন দেবেশ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। আমরা বন্ধুরা, নলিনী বেরা, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, আফসার আমেদ, অশোককুমার সেনগুপ্ত, তরুণ লেখক জয়ন্ত দে, শিল্পী যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, কবি সিদ্ধেশ্বর সেন, তরুণ শিলাদিত্য সেন... কতজন যে আড্ডা দিতাম। মাঝে মাঝে আসতেন দিব্যেন্দু পালিত, স্বপ্নময়, বালুরঘাট থেকে কলকাতায় আসা অভিজিৎ সেন, ভগীরথ মিশ্র। সেই আমাদের নানা রঙের দিন ফুরিয়ে গেল প্রতিক্ষণ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যেতে। প্রকাশন সংস্থাটি রয়েছে। কী অপূর্ব তাঁদের বইয়ের ডিজাইন, ছাপা। বইমেলায় প্রতিক্ষণের স্টলে একটি আড্ডা ঘর হতো। সেই আড্ডা ঘর ছিল বইমেলায় আমাদের অফুরন্ত আড্ডার জায়গা। সেখানে একদিন দেখি কবি শামসুর রাহমানকে। বাংলাদেশের লেখকদের একটা ভাল ঠিকানা ছিল প্রতিক্ষণ। একদিন বাংলাদেশের আবুবকর সিদ্দিকি, একদিন তরুণ লেখক প্রশান্ত মৃধা। কতজন যে এসেছেন। সব নাম মনে নেই।

আড্ডা ছাড়া আমি পারি না। সেই কলেজ জীবনে যে কফি হাউসে প্রবেশ করেছিলাম, আর বের হতে পারিনি। এখনো শনি মঙ্গলে যাই। থাকে তরুণ বন্ধুরা। সমকালের নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিত, আমাদের পরবর্তী কালের জয়ন্ত দে, প্রবুদ্ধ মিত্র, অলোক গোস্বামী, সমীরণ দাস, মৈত্রেয়ী সরকার - এক সঙ্গে আড্ডা মারি। রমানাথ রায়, শেখর বসুরাও আসেন। আসে নবীন প্রজন্ম। কবিতার টেবিল সুইনহো স্ট্রিট পত্রিকার। সকলেই কবি। আমি তাপস রায়ের ডাকে তাদের টেবিলে বসি। আমি আড্ডায় নিজেকে সমৃদ্ধ করি। সত্তর থেকে সতেরর সঙ্গে মিশতে পারি। দে'জ পাবলিশিং-এ শুভঙ্কর দে, অপুর ঘরে যেদিনই যাই আড্ডা হয়। পুলক চন্দ থাকেন। তিমিরকান্তি কাজ করতে করতে যোগ দেয় আড্ডায়। আর নলিনী বেরা ও সমীর চট্টোপাধ্যায় এলে তো জমে যায় আড্ডা।

এখন টেকনোলজি দিয়েছে নতুন আড্ডার জায়গা। ফেসবুক, হোয়াট'স অ্যাপ। সেখানে বসে বাংলাদেশের স্বকৃত নোমান, অঞ্জন আচার্য, তাপস রায়, বিধান রিবেরু, অদিতি ফাল্গুনীর সঙ্গে আড্ডা হয়, প্রশান্ত মৃধার সঙ্গে কথা হয়। কথা হয় আমেরিকা বাসী বাংলাদেশের লেখক কুলদা রায়ের সঙ্গে। দীপেন ভট্টাচার্য, অনামিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মত বিনিময় হয় অতি তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে। ইন্টারনেট, ফেসবুকের আড্ডায় কত বন্ধু পেয়েছি। কত রকম কথা জেনেছি। পরস্পরের এই মত বিনিময় খুব জরুরি এই জীবনের জন্য। আমি কুলদা, স্বকৃত, অদিতির লেখা ইন্টারনেটে পড়ি। খবর পাই সে দেশের। অভিজিৎ রায়ের হত্যার পর বাংলাদেশে কী হয়েছিল, সেই খবর। ওঁরাও খবর পান এই দেশের। আমি বন্ধুদের ছাড়া থাকতে পারি না। কয়েক বন্ধু চলে গেছে। মন খারাপ হয়। যাওয়ার বয়স হয়নি কারোর। আড্ডাটা ভেঙে গেল যে। কফিহাউসে আমাদের আড্ডা আছে। থাকবে। চল্লিশ বছর ধরে কফি হাউস যাওয়া। মনে পড়ে রামুদার কথা। কফিহাউসের পরিবেশক। মনে পড়ে একা টেবিলে নিমগ্ন নির্মাল্য আচার্য। মনে পড়ে অনেকের কথা। কফি হাউসে ঢুকলে মনে হয় তাঁরা আছেন ভীড়ের ভিতরে। কলরোলে যে মিশে আছে তাঁদের কথা।

কফিহাউস – একটি না লেখা বই

কফিহাউস একবার তুলে দিয়ে শপিং মল না কী করার কথা হয়েছিল। হাত বদল হয়ে হয়ে যে অবাঙালি ব্যবসায়ীর হাতে চলে গিয়েছিল, তিনি কফি হাউস তুলে দিয়ে বস্ত্র বিপনি কিংবা শাড়ির মল করবেন শোনা যাচ্ছিল। পরিবর্তিত হয়ে যাবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এই অ্যালবার্ট হল। এখানে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হয়েছে, সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেছেন। জীবনানন্দের 'জীবন প্রণালী' উপন্যাসে অ্যালবার্ট হলের কথা আছে। আমি তখন আজকাল পত্রিকায় একটি লেখা লিখেছিলাম কফি হাউস বাঁচানো নিয়ে, হারিয়ে গেছে সেই লেখা। আমরা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রয়াত অগ্রজ লেখক শৈবালদা। ছিলেন অনাথবন্ধু দে ও আরো অনেক অগ্রজ। তাঁরা বহুদিন ধরে কফি হাউসে আসেন। অনাথদা ছিলেন শৈবালদার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনাথদা এখনো আসেন। তাঁদের একটি টেবিল আছে জানালার দিকে, কিংবা না পেলে আশে-পাশে। হ্যাঁ, কফি হাউসের গেটে তখন একটি সভা হয়েছিল। সেই সভায় আমি অবক্তা বক্তৃতা করেছিলাম। শেষে বামফ্রন্ট সরকার অধিগ্রহণ করে কফি হাউস বাঁচিয়ে দেন। কফি হাউস ব্যতীত কলকাতা শহর ভাবতেই পারি না। কলকাতার কফি হাউস নিয়ে অন্য রাজ্যের কবি, শিল্পী সাহিত্যিকরা কত কৌতুহলী। ভোপালে ভারত ভবনে শুনেছিলাম, তাঁরা এমন এক আড্ডার জায়গা তৈরি করতে চান, করতে পেরেছেন বলে জানি না। বাংলাদেশের বন্ধুরাও একই কথা বলেন। আমি যা বলছি সব কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস নিয়ে। সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউস উঠে গেছে। শ্যামবাজারেও ছিল একটি। উঠে এখন হরলালকার কাপড়ের দোকান। এইটিকে তা করতে চেয়েছিল বেনিয়াবুদ্ধির ক্রেতা। আমরা আটকেছিলাম।

১৯৬৮-সালে আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছি, তারপরই কিংবা ১৯৬৯ সাল থেকে আমি কফি হাউস যেতে আরম্ভ করি বন্ধুদের সঙ্গে। তখন নক্সালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্সির ছেলেরা 'সংগ্রামপুর' (শৈবালদার গল্প) যাত্রা শুরু করেছে। শুনেছিলাম বিপ্লবের মন্ত্র উচ্চারিত হতো কফি হাউসেই। একবার পুলিশ আসার খবর পেয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নেমে এসেছিলাম। কফি হাউসের পরিবেশক - কর্মীরাই আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, কফি হাউসের অনেক স্মৃতি। লিখতে অনেক সময় লাগবে, স্মৃতি বিভ্রমে অনেকজনের কথা বাদ চলে যাবে হয়তো। তবুও লিখি। যতটা পারি লেখার কথা ভাবি, কিন্তু তা তো আনুপূর্বিক হবে না। আগের কথা পরে আসবে, পরের কথা আগে। কফি হাউসের পরিবেশক, কর্মী যাঁরা, তাঁদের অনেকের কথা মনে আছে। নাম মনে পড়ে রামুদা, ওয়াহেদভাই এঁদের। রামুদা মস্ত মানুষ ছিলেন। মোটা গোঁফ ছিল। মুখে হাসি ছিল। আমাদের ভালোবাসতেন। আমরাও রামুদাকে ভালোবাসতাম। আমি তখন চাকরি সূত্রে দীঘায় থাকি। ১৯৮০ সালের কথা। শৈবালদা গ্রীষ্মের ছুটিতে সপরিবারে গেছেন। বিকেলে ঝাউবনের ধারে পশ্চিমমুখী হয়ে নমাজে বসেছিলেন যিনি, শ্বেতশুভ্র দাড়ি, দীর্ঘকায়, তাঁকে দেখে দাঁড়ালেন শৈবালদা। তিনি নমাজ শেষে উঠলে শৈবালদা বললেন, ওয়াহেদভাই, তুমি এখানে? ওয়াহেদভাই ছিলেন কফি হাউসের কর্মী। তাঁকে আমি দেখিনি আগে, মানে কফি হাউসে। অবসরের পর তিনি তাঁর গ্রামে ফিরে এসেছিলেন। গ্রামের নাম রানিসাই। পূর্ব মেদিনীপুরের ঐ প্রান্তে। ওয়াহেদের সঙ্গে শৈবালদার কত কথা। নির্মল ব্রহ্মচারী, নিমাই ঘোষ, অনাথ বাবু ... আরো কারো কারো খোঁজ নিয়েছিলেন ওয়াহেদভাই। সকলেই ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনে শৈবালদার সহযাত্রী। তাঁদের যত পরামর্শ যত পরিকল্পনা ছিল কফি হাউসেই। আমি এসব চোখে দেখিনি। কানে শুনেছি। বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের ঘাটি ছিল কফি হাউস। হ্যাঁ, ওয়াহেদভাই আমার কাছে এরপরে এসেছেন অনেক। কফি হাউসের খবর নিতেন, শৈবালদার খবর নিতেন। আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। রানিসাই গ্রামে ওয়াহেদ ভাইয়ের বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজের কথা এ জীবনে ভুলব না। ৩৮ বছর তো হয়েই গেছে।

কফি হাউসে একজন খুব লম্বা মানুষ আসতেন। সামনেই তাঁর টেবল ছিল নির্দিষ্ট। তাঁর বন্ধুরাও আসতেন। মনে পড়ে যায়। তিনি কে আমি জানি না। কিন্তু তাঁকে বেশ মনে আছে। দুপুরে দেখেছি নির্মাল্য আচার্য এক্ষণের গালি প্রুফ নিয়ে বসেছেন। একা। পরে হয়ত যুগান্তর চক্রবর্তী এলেন। সুনীলদা কিংবা শক্তিদাকে আমি কফি হাউসে দেখিনি। কিন্তু সন্দীপনদার সঙ্গে দীর্ঘদিন আড্ডা দিয়েছি আফসার আমেদ, নলিনীকে নিয়ে। সন্দীপনদা তাঁদের হাওড়ার বাড়ির কথা বলতেন। আরো অনেক কথা। তিনি আমার 'হাঁসপাহাড়ি' উপন্যাসের এক প্যারাগ্রাফ পড়ে দিনের পর দিন সেই প্যারাগ্রাফ নিয়ে কথা বলতেন। প্রতিক্ষণ শারদীয়তে যোগেন চৌধুরী ছবি এঁকেছিলেন হাঁসপাহাড়ির। তিনি যোগেন চৌধুরীর ছবিগুলি আর উপন্যাসের এক প্যারাগ্রাফ নিয়েই সন্ধে কাটিয়ে দিলেন। বেশ মজাই লেগেছিল। এইসব নিয়েই কফিহাউস। সময়ে সময়ে আড্ডার মানুষ বদলে গেছে। রক্তকরবীর প্রদীপ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ ঘোষ, কল্যাণ মাইতি, জয়ন্ত জোয়ারদার, চন্দন ঘোষ এদের সঙ্গে কফি হাউসেই আলাপ। আর ছিলেন চিত্রকর প্রবীর সেন। আমাদের সে ছিল সোনার দিন। কফি হাউসে বসেই প্রদীপ তাঁর অন্বেষা প্রকাশনের বইয়ের পরিকল্পনা করতেন, চন্দন তার পত্রিকার সূচী ঠিক করতেন। কফি হাউস যে কত লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের দপ্তর। লেখা নেওয়া আর লেখক কপি বিতরণ সবই এখানে। সিদ্ধার্থ ঘোষ তখন অনুবাদ করতেন। ছোটদের জন্য সায়েন্স ফিকশন লিখতেন। একটা বইয়ের কথা মনে পড়ে, 'গ্যাবনে বিস্ফোরণ'। পরে সিদ্ধার্থ সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর নিয়ে বড় কাজ করেছিলেন। প্রস্তুতি পর্ব পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করেছিল সুকুমার শতবর্ষে। সে ছিল এক অমূল্য সঞ্চয়ণ। আমি প্রস্তুতিপর্ব পত্রিকায় একটি গল্প লিখেছিলাম, ভারতবর্ষ। সিদ্ধার্থ, কিংবা পুলক চন্দ লিখতে বলেছিলেন। খুব অল্প বয়সে চলে গেছেন এই মেধাবী বন্ধু, যাঁকে পেয়েছিলাম কফি হাউসেই। জ্যাক লন্ডনের গল্প অনুবাদ করেছিলেন সিদ্ধার্থ। শীর্ণকায় কল্যাণ মাইতি ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। অনুবাদ করতেন। তিনিও চলে গেছেন। জয়ন্ত জোয়ারদার নেই, চন্দন ঘোষ নেই। কফি হাউসেই আমার আলাপ এঁদের সঙ্গে। তখন মোবাইল ফোন কেন, ল্যান্ড লাইনও ছিল না কারো ঘরে। আমাদের ঠিকানা ছিল কফি হাউস। কফি হাউসে গেলেই দেখা হবে। কেউ না কেউ আসবে। এইসব কথা গত শতাব্দীর ৮০-র দশকের। আমি কফি হাউস ছাড়িনি। কিন্তু বন্ধুরা ছেড়ে চলে গেছে এ জীবনের মতো। অনেকে যেমন কফি হাউসে আসত, অনেকে আসত না। তুষার চৌধুরী এক দ্বিপ্রহরে আমার সঙ্গে কফি হাউসেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল বাসুদেব দাশগুপ্তর সঙ্গে। প্রায় ঘন্টা দুই স্থায়ী হয়েছিল সেই আলাপ পর্ব। কথোপকথন। বাসুদেবকে নিয়ে আমার কৌতুহল ছিল খুব। তখন রন্ধনশালা পড়া হয়ে গেছে। তুষারই দিয়েছিল বইটি। বাসুদেব আমার কয়েকটি গল্প পড়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁর অভিমত দিয়েছিলেন। সে হবে ১৯৭৭-৭৮ সাল। আমার প্রথম বইটি তাঁকে দিয়েছিলাম মনে হয়। অতঃপর তিনি যাত্রা করলেন অশোক নগরের উদ্দেশে। আর দেখা হয়নি। স্কটিশ চার্চ কলেজে যখন পড়ি, সবে কফি হাউস যেতে আরম্ভ করেছি, গিয়ে সিগারেট আর কফি নিয়ে বসেছি বন্ধুদের সঙ্গে, দেখি বড়দা তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে বসে আছেন। সিগারেট ফেলে দিয়ে কাঠ হয়ে বসে থাকলাম। দুপুরে গেলে তাঁদের দেখা যেত, ১৯৭০-এর কথা। ১৯৭৫-থেকে প্রভাতদার সঙ্গে সম্পর্ক। প্রভাতদা তেমন যেতেন কফি হাউসে তা মনে পড়ে না। তবে পবিত্র মুখোপাধ্যায় যেতেন। এখনো আসেন মাঝে মাঝে। আমি বাইরে চাকরি করতাম। হাওড়ায় নামলাম হয়তো বিকেলে বা সন্ধেয়। ব্যাগ হাতে কফি হাউসই প্রথম গন্তব্য। বন্ধুরা কারা আছে দেখি। আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরব। একদিন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে ব্যাগ সমেত ধরলেন কফি হাউসে। তিনি খুব একটা যেতেন না। সেদিন হয়তো একা লাগছিল, নিঃসঙ্গতার ভিতরে আমাকে পেয়ে নিয়ে গেলেন প্রতাপাদিত্য রোডে। পান ভোজন হলো। পরদিন সকালে বাড়ি ফিরলাম। শ্যামলদা বলেছিলেন, "তোকে ওখানেই পাব ভেবেছিলাম, মিলে গেল।"

শনিবারই কফি হাউসের সেরা আড্ডার দিন। সেদিন দুপুর থেকে মফস্বলবাসী পত্রিকা সম্পাদক, কবি, গদ্যকাররা আসেন। আমিও যাই। বিরাম নেই। এ ছাড়া আমাদের যাওয়ার দিন মঙ্গলবার। বৃহস্পতিবার কখনো কখনো। এখন নলিনী বেরা, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, জয়ন্ত দে, অলোক গোস্বামী, প্রবুদ্ধ মিত্র, নৃপেন

চক্রবর্তী, সমীরণ দাসদের নিয়ে আমাদের টেবিল। যেদিন সমীর চট্টোপাধ্যায় কলেজ স্ট্রিটে আসে, কফি হাউসে আসবেই। আমাদের টেবিলে। স্বপ্নময় আসে কম। ভগীরথ মিশ্র খুব কম। তবে সম্প্রতি এসেছিলেন। অন্যদিনে যদি যাই, নিয়মিত বন্ধুরা কেউ না থাকলেও কাউকে কাউকে পেয়ে যাইই। রণজিৎ দাস কিংবা মৃদুল দাশগুপ্ত বা কালীকৃষ্ণ গুহ মশায়। শনিবার সুইনহো স্ট্রিট পত্রিকার তাপস রায় বহুজনকে নিয়ে টেবিল আলো করে বসে থাকেন, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য, অনিন্দিতা বসু সান্যাল, শকুন্তলা, দিশা, সৌমিত্র চৌধুরী, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়... আরো কত কবি, সম্পাদক। আমাকে ওদের ওখানেও বসতে হয়। ভালোবাসার ডাক দেয় এমন। একটা সময় সরসিজ বসুর টেবিলে বসতাম। সরসিজ আমাদের পাড়ার ছেলে। আলাপ কফি হাউসেই। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যাকে প্রত্যেক দিন দেখা যায় সন্ধ্যা থেকে টেবিলে অনেককে নিয়ে বসে আছে। সোমক দাস আগে খুব আসত, এখন আসে কম। এলে ওর পত্রিকা পোয়েট্রি নিয়ে আসে। প্রদীপ ভট্টাচার্য আসতেন। জয়া মিত্রর সঙ্গে আমার আলাপ কফি হাউসেই। প্রদীপ তাঁর হন্যমান ছেপেছিলেন তখন। প্রদীপ নেই। গত ২০১৯-এর বইমেলার মাঠে নিজের প্রকাশনীর ভিতরেই ঢলে পড়েই মৃত্যু। সরসিজ সম্প্রতি ‘কফি হাউস সার্কেল’ নামে একটি পত্রিকা বের করেছে ওই টেবিলে বসেই। আমি লিখেছিলাম আমার প্রথম বই নিয়ে। সরসিজ তার ‘বকলম’ পত্রিকার যোগাযোগ কফি হাউসের টেবিলে বসেই করে। কফি হাউসে না গেলে মুরাকামী কিংবা মাহমুদুল হকের বই আদান প্রদান হয় না। শ্যামল না শীর্ষেন্দু এই নিয়ে বা সদ্য পড়া গল্প উপন্যাস নিয়ে তক্কো-বিতক্কো হয় না। এসব না হলে সাহিত্যের আড্ডা হয় কী করে? নলিনী তাঁর উপন্যাস গল্পের বাইরে কবিতা বের করেন ঝুলি থেকে। দিয়ে বলেন, পড়ুন দেখি। হ্যাঁ, একজনের কথা বলতে হবে। পরিতোষবাবু। পুরোন দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ঝুলি নিয়ে খড়দহ থেকে তিনি প্রতিদিন আসেন কফি হাউসে। এইটি তাঁর পেশা। কত বছর, কত দিন ধরে তাঁকে দেখছি। পরিতোষ বাবু আমাদের এই শহরের এই কফিবাড়ির মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

কফি হাউসে বন্ধুরা সব নানা টেবিলে থাকে। নবীন বন্ধুরা, কনিষ্ক, শাশ্বতী, অনির্বাণরা আলাদা টেবিলে বসে। নবীন প্রজন্ম এসে গেছে। প্রচুর কম বয়সী ছেলে মেয়ে। তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি। আমিই যেন টেবিলে টেবিলে বসে বসে এই বয়সে এসে পড়েছি। এক এক টেবিলে এক এক বয়স। বন্ধু বদল হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে টেবিল বদল করে ওদের সঙ্গে মিশে যাই। ওদের কথা শুনি। গল্প কবিতা সিনেমা... কী ভাবছে ওরা। দূর থেকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকি। এমন দিন হয়েছে, একা বসে আছি কোনো টেবিলে, দরজার দিকে তাকিয়ে আছি। কেউ এলে হাত তুলব। শ্যামলদা ঢুকলেন নাকি, সিদ্ধার্থ ঘোষ বা বাসুদেব দাশগুপ্তকে নিয়ে তুষার চৌধুরী? এমন মনে হয়। সত্যি মনে হয়। কফি হাউস হলো স্মৃতিপুঞ্জের আধার। কফি হাউস একটি না লেখা বই। এর ভিতরে কত গল্প, কত ভালোবাসা, নিন্দা, হিংসার জন্ম হয়, মৃত্যু হয়। বইটির পাতা উল্টে দেখি আমি যখন একা বসে থাকি একটি টেবিলে। কালো কফির কাপ সামনে। বাইরে মেঘ করেছে ভীষণ। বৃষ্টি নামল বলে।

লুঙ্গির বাহার

লুঙ্গির তুলনা লুঙ্গিই। এমন আরামের পরিধেয় আর নেই। লুঙ্গি ধরেছি হাফ প্যান্ট ছাড়ার পর। হাফ প্যান্ট ছেড়েছি পা দুখানি রোমশ হয়ে যাওয়ার পর। হাঁটুতে রোম, চোখের তলায় কালি, আর হাফ প্যান্ট মানায় না। শ্যামবাজারে পর পর লুঙ্গির দোকান। লুঙ্গি স্টোরই আছে কয়েকটা। শুধুই লুঙ্গি। মফস্বলের মানুষ আর.জি.কর. হাসপাতালে কাজ সেরে নতুন লুঙ্গি নিয়ে বাড়ি ফিরবে,তাই লুঙ্গির কত রঙ কত বাহার। টিউশনির টাকা পেয়ে সেখান থেকে লুঙ্গি কিনে এনে বেলা দশটা নাগাদ রোয়াকের আড্ডায় গেছি, বয়স ১৮-১৯, সবে ফার্স্ট ইয়ার। আয় করছি দুটি কিশোরকে পড়িয়ে। তো লুঙ্গি পরিহিত শ্রীমানকে দেখে বন্ধুরা অবাক। তাদের কেউ কেউ কেউ পায়জামা, কেউ কেউ হাফ প্যান্ট। আমিই লুঙ্গি। আমাদের হারুদা অনেক বছর অবধি হাফ প্যান্ট পরত। খুব কায়দাবাজ। চুলে টেরি, গালে পাতলা দাড়ি, রাজকুমার সিনেমা দেখে তার গল্প আরম্ভ করেছিল, কীভাবে চুমুর দৃশ্যে দুইটি টিয়া পাখিকে ব্যবহার করেছে পরিচালক। বলতে বলতে হারুদা আমাকে তিরস্কার করল, এসব পরে আড্ডায় আসবি না। আমি পরেছি তাতে হারুদার খুব অসুবিধে। তাকে আমি লুঙ্গি পরতে দেখিনি। অনেক দিন পরে পায়জামা। আমি তখন, সেই বেকারবেলায় লুঙ্গি পরে কয়েকদিন বাইরে গিয়ে বুঝেছিলাম এতে এলাকার কিশোরী কন্যাদের কাছে দাম কমে যাবে। হাসাহাসি করে সব। লুঙ্গি মানেই কর্তা। বুড়ো কর্তা। সুতরাং রাস্তায় লুঙ্গি পরা শেষ, কিন্তু বাড়িতে বন্ধ হয়নি। লুঙ্গির রকম আছে। চেক লুঙ্গি, প্লেন লুঙ্গি, সিল্কের লুঙ্গি, সিন্থেটিক সুতো মেশান লুঙ্গি, সরু পাড় দেওয়া লুঙ্গি...। কোনো লিনেনের লুঙ্গির গিট খুলে খুলে যায়, সে লুঙ্গিতে সিন্থেটিক সুতো মেশান। লুঙ্গির দাম কাপড়ের গুণমানে। আবার রঙে চেকে দামের হেরফের হয়। আমার এখন দুইখান লুঙ্গি বাটিকের ছাপওয়ালা। সে বেশ সুন্দর। একটি হলদে শাদা, অন্যট সবজে শাদা। আমার খুব পছন্দের। বাড়ির পোশাক ঐটি। গায়ে পাঞ্জাবি কিংবা সার্ট। হুঁ, লুঙ্গি সরল পোশাক। এত সরল আর হয় না। তার কোনো ডিজাইনের হেরফের নেই। লুঙ্গির পকেট নেই। জিপার নেই। শুধু বুক চিরে লম্বা একটা সেলাই আছে। লুঙ্গিকে অমন সেলাই করে একসূত্রে বাঁধা হয়। সেলাই না করে লুঙ্গি পরিধানও একটি স্টাইল। দক্ষিণ ভারতীয়রা পরেন। লুঙ্গি তাঁদের নিজস্ব পোশাক। লুঙ্গির উপরে শার্ট পরে মিটিঙে চলেছেন বড় সায়েব। লুঙ্গির উপরে শার্ট পরে চেম্বার আলো করে বসে আছেন বড় কর্তা। বর্মা (এখন মিয়ানামার) থেকে লুঙ্গি এসেছে এদেশে। যারা বলেন মুসলমান পুরুষের পরিধেয় এইটি, ঠিক বলেন না। বার্মিজ পরিধেয় এদেশে এলে বুদ্ধিমানের মতো বাঙালি মুসলমান তা নিয়ে নিল নিজের করে, আর মুসলমান নিল বলে হিন্দু নিল না। হিন্দু দাগিয়ে দিল লুঙ্গি মুসলমানের মুসলমানির এক চিহ্ন। কিন্তু এও তো সত্য, দরিদ্র মানুষের এত ভালো এবং নিশ্চিন্ত পরিধেয় আর হয় না। প্রয়োজনেই লুঙ্গি পরে হয়েছে ধর্ম নিরপেক্ষ। একযোগে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের পরিধেয়। চাষা মজুর, যাঁরা কায়িক শ্রমে বাঁচেন, জমিতে খাটেন, তাঁদের লুঙ্গি ভরসা। সে চাষা হিন্দু হন আর মুসলমান হন। দুটি কি তিনটি লুঙ্গিতে তাঁদের বছর কেটে যায়। লুঙ্গি ঘরে, লুঙ্গি বাইরে। লুঙ্গি পরে ধান কাটা, লুঙ্গি পরে বেয়াই বাড়ি যাওয়া। জামাই আসছে লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি গায়ে, শ্বশুর তাকে দামী লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি দিয়েছে ইদের বরাত। গাঁয়ের কথা এইটি, শহরের নয়। শহরের জামাই আলাদা। তার জিনস চাই, টি শার্ট চাই। সে জমিতে খাটে না যে লুঙ্গি মালাইচাকি অবধি ভাঁজ করে তুলে নিয়ে ছোট করে নিয়ে বর্ষা প্লাবিত জমিতে ধান্য রোপন করবে। কিংবা বৈঠা মেরে গাঙে ভেসে যাবে কাটা ধান নিয়ে। হ্যাঁ, শিখ ট্র্যাক ড্রাইভার লুঙ্গিতে স্বচ্ছন্দ। লুঙ্গি ভাসিয়ে ভাঙরা নাচেও সে স্বচ্ছন্দ।

দেশটায় ৯ মাস গরম, তিন মাস ঠান্ডা। গরমের দেশে লুঙ্গির মতো ভালো কী আর হয়। কতজনকে বোঝাতে চেয়েছি, লুঙ্গি হলো সন্ধ্যার খোলা জানালা, দখিনা হাওয়া বয় সেই জানালা দিয়ে। পা দুখানি,

কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি খোলা- মেলা বাতাস খায় লুঙ্গিতে। দরকারে আধ ভাঁজ করে মালাইচাকি অবধি তুলে নাও। আরো আরাম। বাজারের ব্যাপারিরা লুঙ্গির নিচে হাফ প্যান্ট পরে, সেই প্যান্টে চোরা পকেট। সেই পকেটে টাকা রাখে। খুচরো-খাচরা রাখে ট্যাঁকে। ট্যাঁক হলো কোমর। কোমরে টাকা রাখা লুঙ্গিতেই সম্ভব। ট্যাঁকের জোর আছে কি নেই তা লুঙ্গিই বলবে।

লিনেনের লুঙ্গির আলাদা আরাম। তার ছোঁয়া খুব নরম। একসময় খুব পরেছি। এখন মেলে কি মেলে না খেয়াল করিনি। গেরুয়া লিনেনের লুঙ্গি কিনে সেই লুঙ্গি দিয়ে পাজামা বানিয়ে পরতে দেখেছি এক অগ্রজ কবিকে। তাঁকে দেখে আমিও সেই কাজ করলাম, তাতে কি হলো ডুলুং নদীর পাড়ের মানুষজন অবাক। এ কী কাণ্ড! লুঙ্গি তার কাপড়েই যায় চেনা। পাজামা বানাই শার্ট বানাই, লুঙ্গিকে লুকোতে পারবে না কেউ। লুঙ্গির পরিচয় কাপড়েই। লুঙ্গিতে নাক সিটকানো মানুষ কম নেই। বউ চায় না স্বামী লুঙ্গি পরুক। বরং হাফ প্যান্ট, বারমুডা, নাভির কাছ থেকে দড়ি ঝুলবে তলপেট অবধি। ইস, লুঙ্গি ভাঁজ করে মালাইচাকির উপর পর্যন্ত তুলেছ কেন ভূত! সভ্যতা নেই। হাফ প্যান্ট কি গোড়ালি অবধি নামে? বলবে কে? পাজামার দড়ি নিয়ে সমস্যা। দরকারের সময়ে দড়িতে গিট লাগবেই। আর লাগলে সে গিঁট ছাড়ায় কার সাধ্য? গিট মধ্যরাতে হতে পারে, সময়ে অসময়ে হতে পারে। সিনেমা হল বা কফি হাউসের টয়লেটে হতে পারে গিটের গিটকিরি। আর পাজামার দড়ি পোক্ত না হলে, ফট করে ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই বর্মার রাজা দর্জিকে ডেকে নতুন কিছু বানাতে বলতে লুঙ্গির আবির্ভাব। শোনা যায় পাজামার গিট না খুলতে পেরেই লুঙ্গির আবিষ্কার। বর্মার রাজার ইচ্ছাতে লুঙ্গির আবির্ভাব। লুঙ্গি আবিষ্কার নিয়ে আমাদের বন্ধু লম্বু নিমু এই লিখেছিল,

পাজামার গিটকিরি, সয় না সয় না,
সময়ে সে নিজের কাছে, রয় না, রয় না।

পাজামার গিটের গিটকিরি সয় না তাই লম্বু নিমু লুঙ্গি ধরল। বর্মার রাজার মতো তারও হয়েছিল পাজামার দড়ি নিয়ে কঠিন সমস্যা। রাজার হলে প্রজার হবে না কেন?

সেলাই ছাড়া লুঙ্গি আছে দক্ষিণ ভারতে। লুঙ্গি তাঁদের জাতীয় পোশাক। শাদা পরেন বেশি। লুঙ্গি নিয়ে লুঙ্গি ডান্সেও তাঁরা প্রাণবন্ত। চেন্নাই এক্সপ্রেস সিনেমায় দীপিকা পাডুকন এবং শাহরুখ খানের লুঙ্গি ডান্স লুঙ্গির প্রমোশন ঘটিয়েছে। দক্ষিণ বাদে বাকি ভারত সেলাই মারা লুঙ্গি নিয়ে খুশি। গোল হয়ে ঘিরে থাকে, ঝটকা মেরে পরে নাও। কোন ব্র্যান্ড পরবে, অফিসার, ইসমাইল? ইসমাইল ভালো অফিসার নয়। অফিসার ভালো ইসমাইল নয়। যার যেমন পছন্দ। লুঙ্গি বলে ফেলাঝেলা কিছু নয়, তার হরেক রকম ব্র্যান্ড আছে। সিল্কের দামী লুঙ্গি পরে আনন্দ উৎসবে এসেছেন মহাত্মন তাও দেখেছি। ইদানীং লুঙ্গি নারীর পোশাকও হয়েছে। কিন্তু তা সমস্ত বছরের, দিন রাত্রির নয়। সাড়ে তিন হাত চওড়া আর পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা হলেই লুঙ্গি সব মানুষের উপযোগী। ভারতের সব প্রদেশেই লুঙ্গি পরেন সাধারণ মানুষ, শুধু শীত প্রধান অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে। শুধু ভারত কেন, বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার (বর্মা) থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, জর্ডান, সোমালিয়া-সহজ পোশাক লুঙ্গি সব দেশেই প্রিয়। বললাম যে সময়ে সাহায্য করতে লুঙ্গির তুল্য কোনো পোশাক নেই। কোমরে গিট দেবেন সহজ, আর তা না হলে বেল্ট পরা যায়। ঘরে আমি বেল্ট পরিনি কোনোদিন। আর বাইরে লুঙ্গি পরতে সঙ্কোচ। কিন্তু আমারই বয়সী সুমেধার বাবাকে রোজই রংজ্বলা লুঙ্গি আর টি শার্ট পরে বাজারে আসতে দেখি। তিনি তো লুঙ্গিতেই সদানন্দ। ক্বচিৎ দেখি প্যান্ট সার্ট, তিনি জামাইবাড়ি চলেছেন। প্রতিবেশী শৈলেনবাবু ব্রাহ্মণ। লুঙ্গি পরে উপবীতধারী তিনি খালি গায়েই বাজার যেতেন সকাল সকাল। তবে, শীতের দিনে লুঙ্গি শীত ঠেকাতে পারে না সত্য। পা দুখানি জমে যায়। লুঙ্গি তো আসলে কাপড়ের নিচে উদলা করেই রেখে দেয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাই কঠিন শীতের সময় লুঙ্গির নিচে ইনার পরতেই হয়। হ্যাঁ, লুঙ্গির ঘুম অনেক সময়ই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ক্যানিঙের এক সস্তার হোটেলে অনেক রাতে আশ্রয় নিয়ে যে ঘরটিতে আমাকে থাকতে দেওয়া হলো এক রাত্রের জন্য, সেই ঘরে আর এক

খাটে ধুমসো কালো এক মাছের ব্যাপারি উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন লুঙ্গি মাথায় তুলে। চোখ বোঁজা ব্যতীত উপায় ছিল না। সে ছিল ভাদ্র মাস। ঘরটিতে পাখা ছিল না। উফ, এখন যে চোখ বুঁজলেও দেখতে পাই।

মুসলমান পরিবারে বালকও লুঙ্গি পরে। ইদের দিন দেখি, নতুন চেক লুঙ্গি, শাদা পাঞ্জাবি আর ফেজ মাথায় পাঁচ বছরের বালক চলেছে বাবার হাত ধরে। আমার পুত্রটি যখন বালক ছিল, চেক লুঙ্গি এনে দিয়েছিলাম খুঁজে। দড়ি দিয়ে সেই লুঙ্গি কোমরে বেঁধে, হনুমানের মুখোস পরে, হাতে গদা নিয়ে সে ঘুরত। লুঙ্গি তার খুব পছন্দ হয়েছিল। গদাও। হনুমানের মুখোসও। হনুমান লুঙ্গি পরে ঘুরছে, হায়, তা যদি হতো তাহলে কত কিছুই না মিটে যেত। মিটত কারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু ঘরে লুঙ্গি পরলেও এখনো বিশ্বাস করে লুঙ্গি মুসলমানের পরিধেয়। সুতরাং বজরংওয়ালি তা পরেন কীভাবে, যতই তাতে বাহার খুলুক।

পুণ্যধাম উজ্জয়িনীর পুণ্যকথা

পুণ্যধাম উজ্জয়িনী। কবির নগর উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী নগর পুণ্যভূমি কেন না এই নগরে মহাকালেশ্বরের অধিষ্ঠান। এই পুণ্যধামে শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি লিঙ্গমূর্তি রয়েছে মহালেশ্বর মন্দিরে। এই লিঙ্গমূর্তিকে শিবের সাক্ষাত- মূর্তি মনে করা হয়। শিবের জ্যোতিরলিঙ্গের কাহিনি রয়েছে শিব পুরাণে। একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কলহে মত্ত হন কে তাদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে। তখন মহেশ্বর শিব ত্রিভুবন ভেদ করে এক অন্তহীন আলোকস্তম্ভ রূপে আবির্ভূত হন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই জ্যোতির্ময় আলোকলিঙ্গের উৎস সন্ধানে একজন যান আকাশে একজন যান পাতালে। আকাশ-পাতালে খোঁজ করেও কেউই লিঙ্গের উৎস সন্ধান করতে পারেন না। কিন্তু ব্রহ্মা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য বিষ্ণুকে বলেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন লিঙ্গের উৎস। বিষ্ণু মেনে নিলেন তা। শিব তখন আর এক জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করে মিথ্যা বলার জন্য ব্রহ্মাকে অভিশাপ দিলেন যে কোনো অনুষ্ঠানেই ব্রহ্মার স্থান হবে না। তিনি পূজিত হবেন না। আর বিষ্ণুকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, তিনি অনাদি অনন্তকাল পূজিত হবেন। জ্যোতির্লিঙ্গ হলো সত্যের প্রতীক। সত্যম শিবম সুন্দরম - এই বাক্যই যেন জ্যোতির্লিঙ্গে উদ্ভাসিত। শিবই সত্যের অংশ। শিবই সুন্দর। এদেশের বারোটি মন্দিরে জ্যোতির্লিঙ্গ শিব আছেন। গুজরাতের সোমনাথ মন্দির, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীশৈলমের মল্লিকার্জুন, উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর, উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী ওংকারেশ্বর, কেদারনাথ, মহারাষ্ট্রের ভীমশঙ্কর, বারানসীর বিশ্বনাথ, মহারাষ্ট্রের ত্র্যম্বকেশ্বর, দেওঘরের বৈদ্যনাথ, গুজরাতের দ্বারকার নাগেশ্বর, তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমের রামেশ্বর এবং মহারাষ্ট্রের আওরাঙ্গাবাদের জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তি। উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর শিবের মুখ দক্ষিণ দিকে। গর্ভগৃহে মহাকালেশ্বরের অধিষ্ঠান। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে মহাকালেশ্বর শিবই উজ্জয়িনীর রক্ষাকর্তা। পুরাণে কথিত আছে, এই নগরের নাম ছিল অবন্তিকা। এই নগর ছিল শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সুখ্যাত। আর ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। অবন্তিকার রাজা চন্দ্রসেন ছিলেন শিবের উপাসক। অবন্তিকা নগর একবার আক্রান্ত হয় বহিঃশত্রু দ্বারা। চন্দ্রসেন পরাস্ত হয়ে শিবের কাছে প্রার্থনা করেন বিপর্যয় থেকে মুক্ত হবার জন্য। তখন শিবের আবির্ভাব হয় মহাকালেশ্বর রূপে, তিনি অবন্তিকা নগরকে শত্রুমুক্ত করেন। সেই থেকে তিনিই এই পুণ্যভূমির রক্ষা কর্তা। অবন্তিকা নগরের আর এক নাম হয় উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনীর আর এক নাম আছে। বিশালা। উজ্জয়িনীর বড় উৎসব শিবরাত্রি। আর হয় কুম্ভ। মহাকুম্ভের সময় বৈশাখ। এখানে প্রয়াগ হরিদ্বারের মতো অর্ধ কুম্ভ হয় না। বারো বছর অন্তর পূর্ণ কুম্ভ। বৈশাখ মাসে সূর্য যখন মেষ রাশিতে, চন্দ্র তুলা রাশিতে এবং বৃহস্পতির অবস্থান সিংহ রাশিতে, তখন বারো বছর অন্তর সিংহস্থ। এই কুম্ভ স্নানের নাম সিংহস্থ। হরিদ্বারে কুম্ভের যে শাহি স্নান তা হয় দুপুরে, প্রয়াগে ভোরে, আর উজ্জয়িনীর শিপ্রা নদীতে কুম্ভের শাহি স্নান হয় গভীর রাতে। বৈশাখে এই পুণ্যধামে জলকষ্ট ভয়ানক। এমনি উত্তর পশ্চিমের এই মালব মালভূমির দেশে বছরে ১৪-১৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। বৈশাখে তাপমাত্রা হয় ৪৪ ডিগ্রি। তার ভিতরে সিংহস্থ কুম্ভ স্নানে সারা ভারতের পুণ্যারথীরা আসেন, শিপ্রায় জল নেই। শিপ্রা আসলে ছিল ক্ষিপ্রা নদী। তার সেই ক্ষিপ্রতা নেই। তবু সেই নদী মহাকালেশ্বরের নদী, মঙ্গলনাথের নদী, মহাকবি কালিদাসের নগরের নদী। আর এক নদী আছে এই নগরের উপকণ্ঠে। খান নদী। সেই নদীও বিশুষ্ক প্রায়। মেঘদূত কাব্যে বর্ণিত গম্ভীরা নদী আছে এই নগরে কাছেই। সবই গ্রীষ্মে হারায় গতিপথ।

উজ্জয়িনী নগর পুণ্যধাম, কেন না এই নগর ভুবন শ্রেষ্ঠ মহাকবি কালিদাসের নগর। আমি খুব অল্প বয়সে যখন উজ্জয়িনী নগরের কথা পড়েছি কালিদাসের মেঘদূতম কাব্যে, ভেবেছিলাম এ বুঝি কবি-কল্পনার নগর। এই নগরের অস্তিত্ব নেই এই ভুবনে। এখন মনে পড়ে অতি প্রত্যুষে, তখনো উষার আলো ফোটেনি, বিলাসপুর ইন্দোর এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে নেমেছি উজ্জয়িনীতে। মার্চ মাস। ভোরে বেশ ঠাণ্ডা। স্টেশনেই দাঁড়িয়ে

থাকত আব্দুল কিংবা ইসমাইলের বড় বড় শাদা ঘোড়ার টাঙ্গা। টাঙ্গায় চেপেই আত্মীয়গৃহে। আবার সেই টাঙ্গায় চেপে উজ্জয়িনী নগর পরিক্রমা ছিল এক অসামান্য অভিজ্ঞতা। আর নগর পরিক্রমায় প্রথম দর্শন মহাকালেশ্বর মন্দির। এখন যা রুদ্র সাগর নামের এক হ্রদ কিংবা জলাশয়ের তীরে, প্রাচীন ভারতে তা ছিল গন্ধবতী নদীর তীরে। মেঘদূতম কাব্যে কালিদাস গন্ধবতীর কথাই বলেছেন। উজ্জয়িনী যেতে এখন শিপ্রা এক্সপ্রেস হয়েছে, সরাসরি চলে যায় সেই ট্রেন। তখন ভোপাল, উজ্জয়িনী, ইন্দোর যেতে আহমেদাবাদ এক্সপ্রেসে ইন্দোর বগি থাকত। বিলাসপুর কিংবা নাগপুরে ইন্দোর বগিটি বিলাসপুর ইন্দোর এক্সপ্রেসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো। ৩৬ ঘন্টা লাগত হাওড়া থেকে উজ্জয়িনী। উজ্জয়িনী মন্দির নগরী। মহাকাল তো আছেনই। আছে কালিদাসের শিপ্রা নদীর তীরে মন্দির আর মন্দির। সন্ধ্যায় শিপ্রার তীরে রাম ঘাটে সাধুদের স্তোত্র উচ্চারণ এবং প্রদীপ হাতে আরতি দর্শন এক বিরল অভিজ্ঞতা। কেন বিরল, না তার ভিতরেই বহুদূর থেকে ভেসে আসছে মগরিবের আজান ধ্বনি। সব কিছুই শান্ত। সব কিছুই পবিত্র। শিপ্রা তীরে হাঁটু মুড়ে নমাজ আদায় বসেছেন ধর্মপ্রাণ প্রবীণ। শিপ্রা তীরে বড় গণেশের মূর্তি, চিন্তামণি গণেশ, সিদ্ধ বট, হনুমান মন্দির যেমন আছে, শিপ্রাতীরে রয়েছে মঙ্গলনাথের মন্দির। মঙ্গলনাথ হলেন মঙ্গল গ্রহ। প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির এই নগরেই বাস করতেন। তিনি অঙ্ক কষেই নাকি মঙ্গল গ্রহকে খুঁজে পেয়েছিলেন প্রথম। এই শিপ্রাতীর থেকেই লাল তারাটিকে তিনি রাত্রির আকাশ-মণ্ডলে দেখতে পান। কল্পনাই হয়তো। কিন্তু সন্ধ্যায় আপনি যখন মঙ্গলগ্রহের মন্দিরের সামনে বসবেন শিপ্রাতীরে, মনে হবে তাইই সত্য। না মঙ্গলনাথ নিয়ে এখানে ধুমধাম নেই। মঙ্গলনাথ তাঁর মন্দিরে একাই থাকেন। তাঁরও লিঙ্গ মূর্তি। সমুখে একটি মেষ। দিনে একবার পূজারী এসে পুজো করে দিয়ে যায়। দরজার চাবি তাঁর কাছে। খুব কাছেই থাকেন তিনি। মন্দিরের ভিতরে সিঁদুর চর্চিত লিঙ্গ দেবতা মঙ্গলনাথকে আমি দেখেছিলাম। তিনি সামান্যতে তুষ্ট। মুসুর আর অড়হর ডাল দিন, দিন একটি সূর্যমুখী ফুল, মঙ্গলনাথ গ্রহণ করবেন। উজ্জয়িনী নগরে জ্যোতিষ চর্চা চলে রমরম করে। জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা আর জ্যোতিষ চর্চা তো এক নয়। কিন্তু জ্যোতিষ চর্চা নাকি এই নগরে অনেক প্রাচীন এক অভ্যাস। যাক সে কথা, মনে পড়ে সেই এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যার কথা। শিপ্রাতীরে একাকী বসেই মনে হয়েছিল কিছু একটা কাছে এসে চলে যাচ্ছে। তা কি মন্দিরে অবহেলায় পড়ে থাকা দেবতা মঙ্গল গ্রহ? না, অন্য কিছু। আমার কাছে মঙ্গলময় কিছু আসছে, যা কিনা এই পুণ্যধামে এসে আমার অর্জন। মহাকালেশ্বর দর্শনে আমার অর্জন। সিদ্ধ বট, শিপ্রা নদী দেখে আমার অর্জন। কালিদাস একাডেমিতে সন্ধ্যায় সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তলম দেখাও ছিল আমার অর্জন। লোক বিশ্বাস শিপ্রা তীরে গড় কালিকা মন্দিরে কালিদাস শিবের আরাধনা করতেন। সেই মন্দির দেখাও ছিল আমার অর্জন। হ্যাঁ, আমি অর্জন করে ছিলাম পুণ্য। এই ধাম দর্শনের পুণ্য। নির্জন মঙ্গলনাথের মন্দির, শিপ্রা নদী তীরের সেই সন্ধ্যাই আমাকে দিয়েছিল ধ্রুবপুত্র উপন্যাস লেখার ভাবনা। তারপর সেই লেখার জন্য কতবার যে গিয়েছি ওই নগরে। উজ্জয়িনী নগর অতি পুণ্যধাম। ওই নগরের মাটিই পুণ্য। আমি তো লিখতে পেরেছিলাম ঐ দূর দেশের জনপদটিকে নিয়ে যা ছিল আমার কাছে এক অলীক নগরীই। কালিদাসের মেঘদূতম কাব্যে যক্ষ মেঘকে উজ্জয়িনী নগর ঘুরে উত্তরে হিমালয়ের দিকে অলকা পুরীর পথে যেতে বলেছিল। বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ স্মরণ করি।

জেনেছো, উত্তরে তোমার অভিযান; যদি বা পথ হয় বক্র,
ভুলো না দেখে নিতে উজ্জয়িনীপুরে সৌধসমূহের উপরিতল;
সেখানে সুন্দরী আছেন যাঁরা, তুমি তাঁদের চঞ্চল চাহনির
স্ফুরিত বিদ্যুতে না যদি প্রীত হও, হবে যে বঞ্চিত নিদারুণ।

(২৮ নং শ্লোক, পূর্বমেঘ)

অপরূপ বর্ণনা আছে এই পুণ্য ধামের। এই অবন্তী দেশে গ্রামবৃদ্ধেরা সন্ধ্যায় বসে বিশালা নগরীর পূর্ব গৌরবের কথা শোনায়। বলে বৎস্যরাজ উদয়ন এবং বাসবদত্তার প্রেমের কাহিনি। হে মেঘ তুমি চলতে চলতে ক্ষণিক বিশ্রামে যেও মহাকাল মন্দিরের মাথায়। মন্দ্র, গম্ভীর, শ্লাঘ্য নিনাদের পুণ্যফল অর্জন করবে

তুমি মেঘ। আমি তো মেঘের গর্জন শুনিনি ঘোর শ্রাবণে গিয়েও। মনে হয়েছিল মেঘদূতম কাব্য যেন কবির বৃষ্টির প্রার্থনা মন্ত্র। বৃষ্টি নেই, তাই বৃষ্টির স্মৃতিকে ধরে রাখা। মালব মালভূমি আসলে অনাবৃষ্টির পৃথিবী। আর অনাবৃষ্টি, জলহীনতার বিরুদ্ধে মানুষের উৎসব যেন সিংহস্থ।

শিপ্রাতীরেই আছে ভর্তৃহরি গুম্ফা। এই গুম্ফা-গুহা নিয়ে যে কাহিনি আছে, তা না জানলেই নয়। ভর্তৃহরি ছিলেন উজ্জয়িনীর রাজা। তিনি প্রাচীন ভারতের কবি ভর্তৃহরিই হবেন অনুমানে। রাজমহিষীর সঙ্গে রাজার বৈমাত্রেয় ভাই বিক্রমের অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনে রাজ্যপাট ত্যাগ করে তিনি এই গুম্ফায় আশ্রয় নিয়ে ২৪ বছর উপাসনা করেন গোরক্ষনাথের। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা হলেন। আসলে তখন যিনি সিংহাসনে বসতেন, বিক্রমাদিত্য উপাধি তাঁরই হতো। উজ্জয়িনী নাথ যোগীদেরও তীর্থক্ষেত্র। উজ্জয়িনীতে সূর্যঘড়ি আছে। আছে পাঠান আমলের কেল্লা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ছিল যে শাদা ঘোড়ায় টানা টাঙ্গা, তা এখন নাকি নেই। অটোয় চেপে মহাকাল দর্শন হয় না। ফুলওয়ালারা বেশিরভাগ দেখেছিলাম মুসলমান। টাঙ্গাওয়ালারা তো নিশ্চয়ই। সে বড় সুখের পুণ্যধাম ছিল উজ্জয়িনী নগর। এখন যাইনি কতদিন। জানি মহাকালেশ্বর রক্ষা করেন। তিনি আছেন। তিনি উজ্জয়িনী নগরের সকল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেন। আমি ভাবি দেবতার কোনো ধর্ম নেই। ধর্ম নিয়ে দেবতার মাথা ব্যথা নেই। সব আছে মানুষের।

নতজানু

গৃহস্তের বাড়ি - প্রবেশ নিষেধ। বেলগাছিয়া থেকে হাঁটাপথে ঘুঘুডাঙা দিয়ে দমদম নেত্র সিনেমায় যেতে যেতে কত দেখেছি। তখন কৈশোর পার হয়েছি। অবাক হয়ে ভেবেছি তার অর্থ। পরে কেউ বুঝিয়ে দিয়েছিল। নতজানু সেই গৃহস্তের বাড়ির পাড়া, কালীঘাট মন্দিরের চারপাশের কাহিনি। বালিকা মিছরি ওপাড়ার মেয়ে, সে চক দিয়ে দরজায় এই কথা ফুটিয়ে তুলছিল। মুকুট এপারের ভালো পাড়ার বালক। মুকুট এই উপন্যাসের সেই এক প্রোটাগনিস্ট যে রাস্তার দুপারে যেতে যেতে বড় হতে থাকে। মিছরি ভালো পাড়ায় আসে। বালিকা এবাড়ি ওবাড়ি যায়। আশ্চর্য এক শৈশব যাত্রার কথা লিখেছেন জয়ন্ত দে তাঁর নতজানু উপন্যাসে। বেশ্যাপাড়ার ছেলে মেয়ে আর ভালো পাড়ার ছেলে মেয়ে একসঙ্গে বড় হয়ে উঠছে, এ কাহিনি কবে কে লিখতে পেরেছে?

মাতৃমন্দিরের ঘৃত প্রদীপের পিলসুজের নিচে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার কালীঘাট আর প্রদীপের অনুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত মুখচ্ছবি নিয়ে নতজানু উপন্যাস। এই নগর নিয়ে যে গল্প পড়েছি মতি নন্দীর তা উত্তর কলকাতা, এই নগর নিয়ে, নগর কলকাতার ছোট এক জনপদ নিয়ে, আর এক সেই উত্তাল এবং হিংস্র এক সময় নিয়ে উপন্যাস রচনা তেমন হয়েছে বলে জানা নেই। একটি শহর তার আলো, অন্ধকার-উত্তাপ ও হিমশীতলতা নিয়ে বাংলা উপন্যাসে ধরা থাকবে, তাইই তো স্বাভাবিক। কলকাতা শহর বা এই শহরের কোনো এক অঞ্চল আমাদের উপন্যাসে রয়েছে রক্ত-মাংস নিয়ে এমন উদাহরণ দেওয়া সহজ নয়। কলকাতা নিয়ে তেমন উপন্যাস কই যেখানে সাধারণ, খুব সাধারণ, নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন মানুষ, দুঃখী মানুষ নিম্ন বর্গের মানুষ, নিরুপায় মানুষ ধরা পড়েছে? শহর হয়েছে প্রধান চরিত্র? নতজানু উপন্যাস আসলে এই নগরের সেই আখ্যান, সেই ভয়ানক সময়ের ইতিহাস, যা ক্রমশ ধূসর হয়ে আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছিল। মানুষ যা মনে রাখতে চায় না, তা স্মৃতি থেকে অবলুপ্ত হতে থাকে ধীরে ধীরে। আমরা কি সত্যই ভুলে যেতে চাই গত শতকের সত্তর দশকের সেই উত্তাল সময়ের কথা। আক্রমণকারী আর আক্রান্তের কথা? এই উপন্যাস পাঠের পর এমন প্রশ্ন জেগে উঠেছে আমার ভিতরে। বড় কথা, এর পটভূমি ইতিহাস-বিধৃত এক অঞ্চল যা এই শহরের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অনেকটাই সংপৃক্ত। কালীঘাটের কথা আমি প্রেমেন্দ্র মিত্রতে পেয়েছি। বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, সংসার সীমান্তের কালীঘাট আর জয়ন্ত দের কালীঘাট আলাদা হয়েও এক, এক হয়েও আলাদা। প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঐ দুই গল্প আমাদের ছোট গল্পের অসীম শক্তিকে চিহ্নিত করে। জয়ন্ত যে কালীঘাটের ছবি এঁকেছেন তাঁর এই বৃহৎ উপন্যাসে তা নিশ্চিত ভাবে আমাদের উপন্যাসের ইতিহাসে উচ্চারিত হতে থাকবে ক্রমাগত। এই উপন্যাস না পড়লে এই শহরকে চেনা হবে না সত্য। নতজানু উপন্যাস লেখা হয়েছে কালীঘাট মন্দিরের সেবাইয়েত এক হালদার পরিবার নিয়ে। যে মন্দির ধার্মিক হিন্দুর কাছে এক পবিত্র বিশ্বাসের স্থল, সেই মন্দির ঘিরে যে ক্লেদ তার উজ্জ্বল উদ্ধার এই নভেল। হালদার পরিবারের বালক মুকুট যে সময়ে বড় হয়ে ওঠে সেই সময় ছিল ভুলে না যাওয়ার সময়। আমরা সেই সময়ে যুবক। যৌবন ছিল সন্দেহের আধার। জয়ন্ত সেই সময়কে উদ্ধার করেছেন নিপুণ কথন শৈলীতে। এমন সত্য এখানে উচ্চারিত যা ছিল অশ্রুত। চেনা শহর আর এই প্রাচীন জনপদ অচেনা হয়েই বারবার ধরা দিয়েছে আমার কাছে। পড়তে পড়তে বিস্মিত হয়েছি কতবার। এ কোন শহর, চার্লস ডিকেন্সের সেই সেই মস্তান, অনাথ বালকদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার অন্ধকার জগতের শহর, অলিভার ট্যুইস্টের শহর? কিংবা ভিক্তর হুগোর সেই পরাজিত মানুষের জীবনোপখ্যান যা পড়েছিলাম লা মিজারেবল উপন্যাসে, সেই সব মানুষের অন্য উপাখ্যান। আমাদের শহর নিয়ে লিখেছিলেন যুবনাশ্ব, পটলডাঙার পাঁচালি উপন্যাসে। জয়ন্তর উপন্যাসে অনেক বড় করে ধরা পড়েছে এই শহর আর সেই ভয়ানক সময়, গত শতাব্দীর ৭০ দশকের

আরম্ভের কয়েক বছর। সেই সময়কে আমরা ভুলেই গিয়েছি প্রায়। নাহলে আমাদের সাহিত্যে তার ছায়া নেই কেন তেমন করে? এই উপন্যাসে আছে, যুব কংগ্রেস মজুত উদ্ধারে নেমেছে, কলকাতায় পাতাল রেলের কাজ আরম্ভ হলো, তাই হকার উচ্ছেদ হলো, রেশনে সব কিছুই অমিল, চাল, গম, চিনি, কেরসিন, সি পি আই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল, রেলের থার্ড ক্লাস উঠে গেল... সব শুনে শ্রীনাথ বলে, 'যেখানে যাই হোক আমাদের মায়ের রাজত্ব ঠিক আছে'। মা হলেন কালীঘাটের মন্দিরের মা। মন্দির আর তার চারপাশই এই আখ্যানের চালিকাশক্তি। উপন্যাসের খুটিনাটি থেকে সময়ের ইতিহাস রচনা করা যায়। নতজানু সেই প্রেক্ষিতে অসাধারণ। মন্দির কমিটিতে ঢুকছে কংগ্রেসি লোকজন। মন্দিরের কত আয়, পার্টি তো ঢুকবেই। সেই পার্টির যুব সংগঠনের নেতা শ্রীনাথেরই পুত্র দেবু। কংগ্রেসি রাজত্ব, ৭২-এর ইন্দিরা কংগ্রেস, ৭৫-এর এমার্জেন্সি, সেই সময়ের কত কাহিনি, সব ভুলে গেছি। মানুষ বিস্মৃতিপ্রবণ, লেখকই সেই হারিয়ে যাওয়া সময়কে উদ্ধার করেন উপন্যাসের পাতায়। হকার্স ইউনিয়ন হাত বদল হয় মৃৎশিল্পী যতনের বড়দার কাছ থেকে। যতনের বড়দা মনে প্রাণে বামপন্থী। সে বামপন্থী পার্টি ছেড়ে দিয়ে বেইমান হয়ে গেল, অথচ না ছাড়লে উপায় ছিল না। তার সংসারের অন্ন বন্ধ হয়ে যেত। হকার বড়দা জায়গাই পেত না ফুটপাথে পশরা নিয়ে বসার। এই রাজনৈতিক দখলদারি তো বন্ধ হয়নি। কিন্তু এই ইতিহাস কেউ লেখেনি। না উপন্যাসে, না সিনেমায়। কোথাও না।

কালীঘাট মন্দির আর পোটোপাড়া ঘিরে আবর্তিত এর কাহিনি, তবুও এই কাহিনি যেন উত্তর দক্ষিণ, দুই কলকাতার চরিত্র ধরে ফেলে বারবার। হকার, মাস্তান, রাজনৈতিক দলের যুব সংগঠন, দেহোপজীবীনির পাড়া, তাদের জীবনের দৈনন্দিনতা নিয়েই এই উপন্যাসের কাহিনি। আতঙ্ক ধরানো সেই সব দিন রাত্রির কথা ভুলিনি এখনো। জয়ন্ত লিখতে পেরেছে। আর কেউ পেরেছেন কি না সাহিত্যের এমন সত্যের কথা উচ্চারণ করতে, আমার জানা নেই। রাস্তার এপারের ভদ্রপাড়া, রাস্তার ওপারের দেহোপজীবীনিদের খারাপ পাড়া, ভদ্রপাড়া আর খারাপ পাড়ার সীমারেখা, সীমারেখা পেরিয়ে আসা কিশোর কিশোরী, মন্দির, পান্ডা, মন্দির নিয়ে রাজনীতি, ১৯৭২-থেকে যুবশক্তির উত্থান, রাজনৈতিক হত্যা, ক্ষুধা, রক্তপাত, ক্ষুধার্ত বালক বালিকা মিছরি, ফিটন, বেশ্যার কন্যা জুঁই, হালদার পরিবারের মস্তান পুত্ররা, শ্মশান, আদিগঙ্গা, পোটোপাড়া, গঙ্গার ওপার, পুরনো কলকাতার এক প্রাচীন অঞ্চলের পটভূমিতে এই উপন্যাস, সময়কে যেমন ধারণ করেছে, সময় উত্তীর্ণ হয়ে, সময়ের ছায়া থেকে বেরিয়ে সময়কে অতিক্রম করে জীবনের চিরকালীন মহত্বে পৌছেছে বারবার। মুকুটের জেঠা শ্রীনাথ মন্দির পরিচালনা সমিতির প্রধান। ধর্ম পরায়ণ সৎ ব্যক্তি। শ্রীনাথের বড় ছেলে দেবু যুব রাজনীতির আশ্রয়ে থাকা মস্তান, বাবাকে সরিয়ে মন্দির কমিটি দখল করতে চায়। অনেক টাকা সেখানে। তার জন্য সে বাবাকে প্রকাশ্যে নেংটা করে দিতেও পিছু-পা হয় না। হিংস্রতায় মুড়ে যাওয়া জীবনের কথা জয়ন্ত যেভাবে নিয়ে আসতে পারেন তাঁর আখ্যানে, তা বড় সহজ কিছু নয়। সত্য এই। এই সত্যকে এড়িয়ে, ভুলে গিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে তা হবে না। সত্য পোড়ার ভস্ম তোমাকে ঢেকে দেবে। তুমি জ্বলে পুড়ে যাও। শ্রীনাথের ছেলে দেবু কী না পারে, পার্টির নামে বিধবার দোকান দখল করে নিয়ে নিজ দখল কায়েম করে। তার আর এক ভাই উমা এক দেহোপজীবীনি শশীর বাবু হয়ে থেকে তারই বড় হয়ে ওঠা মেয়ে জুঁইকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে চায়। মুকুটের এক বন্ধু আছে রঞ্জাবতী। বড় ঘরের মেয়ে, আদি গঙ্গার ওপারে থাকে। রঞ্জাবতী যেন সকল আলো নিয়ে জন্মান এক কন্যা। সূর্যমুখী ফুল। আর জুঁই বেশ্যার মেয়ে। সকল অন্ধকার তাকে ঘিরে থাকে। রঞ্জাবতী জেনে গেছে তার পরিচয়, সে আর যায় না তার বাড়ি। মুকুট এসেছে জুঁইএর কাছে, রঞ্জাবতীরা বাড়ি নেই, কোথায় গেছে তাকি জানে জুঁই? জুঁই বলে সে যায় না ওদের বাড়ি। সে জেনে গেছে বেশ্যার মেয়ে বেশ্যাই হয়, তার কোনো ভালো বন্ধু হয় না। এ পাড়ার মস্তান পিন্টু যতই বলুক জুঁইকে বিয়ে করবে, তা হয় না। হবে না। জুঁই কি তার অনুচ্চার ভালোবাসা নিয়ে মুকুটের সঙ্গে মেশে? নাকি সে পিন্টুকে শেষ অবধি ভালোই বাসে। এই উপন্যাসে মিছরি এবং জুঁই দুই কিশোরী। মিছরি বেরতে পারে ক্লেদাক্ত অন্ধকার থেকে, জুঁই পারে না। জুঁইকে পিন্টু বলে, ভালোবাসে। জুঁই বিশ্বাস

করে, আবার করেও না। জুঁই মুকুটের সামনে উদোম হয়ে মুকুটের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়ে, সে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে না পিন্টুকে। জানে পিন্টু তাকে বিয়ে করলেও বেশ্যা পাড়ার গলিতে ছেড়ে দিয়ে আসবে একদিন। জুঁই তার মাকে বলবে, নথ ভেঙে লাইনে নামবে। পিন্টুকে দিয়েই নথ ভাঙাবে। পিন্টু তার ভেড়ুয়া হয়ে থাকবে, পিন্টুর কাছে সে পয়সা নেবে না, তবে ওকে বিয়েও করবে না। জুঁই পাগলের মতো হাউহাউ করে কাঁদে, ও পারুল মাসি, এই দ্যাখো মুকুটকে আমি বাবু বানাচ্ছি...। এমন সব অকল্পনীয় অনেক মুহূর্ত আছে এই উপন্যাসে যা বাংলা উপন্যাসে দেখিনি বলতেই হয়। আমাদের এই শহর আমাদের উপন্যাসে নিঃশ্বাস ফেলল কই, শ্বাস নিল কই?

দেখিনিই তো, তথাকথিত খারাপ পাড়া থেকে ভাই বোন মিছরি আর ফিটন মুকুটের জানালার সামনে তার খাবারের ভাগ নেওয়ার জন্য প্রতি সন্ধ্যায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। অভুক্ত ভাই বোন ওপারের খারাপ পাড়া থেকে এপারে আসে খাদ্যের সন্ধানে। মুকুট এইসব দেখতে দেখতে, এই সব মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে যেতে বড় হচ্ছে। একটা অঞ্চল তার শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। তার ক্লেদ আর প্রতিমা গড়ার মাটির গন্ধ ভেসে উঠেছে আখ্যানজুড়ে। লেখক যেন পোটোপাড়ার প্রতিমা শিল্পীর মতোই কাঠামো খড় মাটি কল্পনা, ভালবাসা, জীবনের প্রতি মুগ্ধতা নিয়েই নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাস-প্রতিমা। নিরুপায় কিছু মানুষের এই কাহিনি চিনিয়ে দিয়েছে সেই চল্লিশ বছর আগের নৈরাজ্যের সময়, আমাদের জানা আর চেনা মূল্যবোধের সঙ্গে সময়ের নৈরাজ্যের ভয়ানক অমিল। পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে আসে। মুকুটের দিদি, শ্রীনাথের কন্যা, দুই মস্তানের বোন পুতুল যে উৎকল যুবকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে হারিয়ে যায়, সেই পন্ডাদা তো বিবাহিত পুরুষ। পুতুলের খোঁজ কেউ করে না। আবার খুনে মস্তানের বোন যে তুলতুলকে বিয়ে করে আনে দেবু, তার ভিতরের আগুন যেন শীতার্তের উষ্ণতা। কী ভালো অঙ্ক জানে বউদি। মুকুট সেখানে শ্বাস নিতে পারে। প্রায় ভিখিরি মেয়ে মিছরির সঙ্গে মুকুটের ছিল অনুচ্চারিত ভালবাসা। লেখার গুণে, বিশ্লেষণে দুই কিশোর কিশোরীর সম্পর্ককে সোনার জলে লিখেছেন লেখক। মুকুট এবং মিছরির সম্পর্কে ধীরে ধীরে নির্মাণ করেছেন জয়ন্ত। মিছরি বাস্কেটবল খেলতে রাজ্যদলে সুযোগ পায়। এইটুকুই যা প্রদীপ শিখায় উদ্ভাসিত মুখ। এই মুকুট কিন্তু পথের পাঁচালির অপু নয়, এই বালক হিংস্র এক সময়ে জন্ম নিয়ে ইতিহাসের অংশ হয়ে যাচ্ছে। এমন চরিত্র আমি পাইনি অন্য কোথাও। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলে কোঠার সেপাই উপন্যাসে যেমন ঢাকা শহরকে চেনা যায়, নতজানুতে কলকাতা। আখ্যানে কিছুই মেলে না। কিন্তু চিলেকোঠার সেপাই যেমন পূর্ব পাকিস্তানের সেই সময়কে ধারণ করে ঢাকা শহরকে চেনায়, নতজানুও সেই সময়ের কালোছায়ায় ঢাকা এই শহর, কালো সময়কে ধারণ করা কলকাতা শহরকে চিনিয়েছে। দুই পারের দুই উপন্যাস দুই শহরের আখ্যান, যেমন ছিল অলিভার টুইস্ট লন্ডন শহরের। পুত্রের লোভ আর হিংস্রতার কাছে পরাজিত শ্রীনাথ আত্মহননে যায়। কী ভয়ানক সময় ঘনিয়ে এসেছিল যে সেই বছর ৪৫ আগে। বাংলা উপন্যাস নিয়ে হতাশ পড়ুয়া যাঁরা উচ্চারণ যোগ্য একটিও সমকালীন বাংলা উপন্যাসের নাম খুঁজে পান না, এবং হাড়-হিম করা অলীক আখ্যানে মগ্ন, তাঁরা পড়ুন না পড়ুন, আমাদের এই সময়ে উপন্যাসের মতো দুরূহ শিল্পে নিমগ্ন হয়েছেন যে নবীন উপন্যাসকাররা তাঁদের চিনে নিতে এই বই যথার্থ।

শরৎচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের পর শরতবাবুই দ্বিতীয়জন যিনি আমাদের ভাষার উপন্যাসকে মর্যাদা পূর্ণ জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারপরে বাংলা উপন্যাস তার লিখনের শৈলী খুঁজে পেল। বড় বড় ঔপন্যাসিকরা এলেন। শরৎচন্দ্র সাহিত্যের যে সত্যকে বিশ্বাস করতেন, তা ছিল অতি আধুনিক। সময় থেকে এগিয়ে। আমি তাঁর উপন্যাসের পাঠক, গল্পের পাঠক, এ কিছু নতুন কথা নয়। ভারতে যতগুলি ভাষা আছে সব ভাষায় তিনি অনূদিত। ভারতের মানুষ জানে না শরৎচন্দ্র তাদের ভাষা, হিন্দি, গুজরাতি, মৈথিলি বা তেলেগু, তামিলের লেখক নন। তিনি এতই পঠিত নানা ভাষায়, নানা ভাষার মানুষ বিশ্বাসই যেন করে না শ্রীকান্ত তাদের জীবনের তাদের ভাষার উপন্যাস নয়। বিশ্বজনীনতা একে বলে। যে কারণে আমি হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি' পড়ে দূরের মনে করি না, সেই কারণেই শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, পল্লী সমাজ, চরিত্রহীন, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ সমগ্র ভারতীয় সমাজের লেখা হয়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি প্রবন্ধে লিখছেন, "মানুষ তার সংস্কার ভাব নিয়েই ত মানুষ; এবং এই সংস্কার ও ভাব নিয়েই প্রধানত নবীন সাহিত্য-সেবীর সহিত প্রাচীনপন্থীর সংঘর্ষ বেধে গেছে। সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটু বাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়ে কোনও সাহিত্যিকের সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার। পড়বামাত্র মন তাঁর তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে...।" তিনি বলছেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ যখন করেছিলেন, সমাজ তাকে নেয়নি। হিন্দুর মনের ভিতরে তা প্রবেশ করেনি। অনেক গ্লানি এবং নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরকে। কিন্তু সেই সময়ের কোনো সাহিত্য-সেবী বিদ্যাসাগরের পক্ষ অবলম্বন করেননি। হয়ত তাঁরা বিধবা বিবাহর পক্ষে ছিলেন না, কিংবা তাঁদের ভয় ছিল, পাঠক নেবে না। সমাজ-রুচির বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য হয়নি তাঁদের। ফলে এতবড় ঘটনা সামাজিকভাবে মূল্য পেল না, সাহিত্যের ভিতর দিয়ে তা গৃহস্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল না। ভাবতে পারল না অন্তঃপুর। কিন্তু তাঁরা যদি উদাসীন না থাকতেন, তাঁদের সাহিত্যের কারণে নিন্দা গ্লানি তাঁদেরও সহ্য করতে হতো সত্য, পাঠকের কাছে সৌন্দর্য তখন সৃষ্টি হত না, কদর্য হতো, কিন্তু ৫০ বছর বাদের সেই কদর্যতাই হয়ে উঠত সৌন্দর্যময়। সাহিত্যের সেই রূপে মুগ্ধ হতো ভবিষ্যতের পাঠক। শরৎচন্দ্র বলছেন, "এমনই তো হয়, সাহিত্য সাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। সে জানে আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়; অনাগতের মধ্যে তারও দিন আছে; হউক সে শতবর্ষ পরে কিন্তু সেদিনের ব্যাকুল, ব্যথিত নর-নারী শত লক্ষ হাত বাড়িয়ে আজকের দেওয়া তার সমস্ত কালি মুছে দেবে।"

সাহিত্য নিয়ে এই আশ্চর্য ব্যাখ্যা যে কোনো নবীন লেখককে নতুন পথে যাওয়ার সাহস জোগাবে। আমাকে জুগিয়েছিল। পেরেছি কি পারিনি সে প্রশ্ন অবান্তর কিন্তু শরতবাবুর এই পথকেই সাহিত্যের পথ বলে মেনে নিয়েছি অবনত মস্তকে। কেমন সে পথ, শ্রীকান্ত উপন্যাসের অন্নদাদির কথা ভাবুন। ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু ঘরের কন্যা। দুই বোনের বড়টি বিধবা। ছোট, অন্নদার সঙ্গে আশ্রিত যুবকের বিবাহ হলো। একদিন আশ্রিত যুবক, অন্নদার স্বামী তার বিধবা দিদিকে হত্যা করে নিরুদ্দেশ হয়। কেন হত্যা, তা বলেননি অন্নদা। অনেকদিন পরে স্বামী আসে সাপুড়ের বেশে। তার সঙ্গে পালায় অন্নদা, ভালোবাসা ছিল। স্বামী তখন মুসলমান। তাতে কী হয়েছে, নিজের ধর্ম না ত্যাগ করে অন্নদা শাহজীর সঙ্গে গঙ্গার তীরে জীবন কাটিয়ে তো দিল। স্বামী শাহজীর মৃত্যুর পর কবর দিয়ে অন্নদা শাঁখা নোয়া ত্যাগ করে, সিঁথির সিঁদুর মুছে দেয়। ভাবুন এক সঙ্গে স্বামী স্ত্রী হয়ে বাস করছে, একজন হিন্দু, আর একজন মুসলমান। শরতচন্দ্র একশো বছর আগে যা

ভেবেছিলেন, ভাবতে পেরেছিলেন, তা আমরা এখন কি ভাবতে পারি। ধর্মে ধর্মে কী বিদ্বেষ! হ্যাঁ, প্রায় এই রকম এক ঘটনা আমি শুনেছি বাংলাদেশের এক পরিবারে। স্বামী কনিষ্ঠা কন্যাকে নিয়ে ইসলাম কবুল করেছেন। স্ত্রী এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা হিন্দুই রয়ে গেল। স্বামী মারা গেলে ইসলাম মতে জানাজা কবর ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। স্ত্রী শাঁখা সিঁদুর ত্যাগ করে যথাবিহিত শ্রাদ্ধের কাজ করেন। অসামান্য এই জীবন। সমাজের পুঞ্জীভূত অন্ধকার এবং আর্ট, দুইয়ের ভিতরে শরতবাবুর আশ্চর্য যাতায়াত। সমাজের কথা লিখতে গিয়ে শিল্পের দিক অবহেলিত হয়নি বলে এত বছর ধরে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা কমেনি, বেড়ে গেছে। বেড়েই গেছে। ক্রমশ বেড়েছে কারণ তাঁর অনেক কথাই সমকালের থেকে এগিয়ে ছিল, আজ যা পড়ে মুগ্ধ হচ্ছি, অন্নদাদির কথা যেমন, তখন নিশ্চয় তত মুগ্ধতা ছিল না। নভেল পড়লে যে ছেলে গোল্লায় যায় এই কথাটি বাল্যকালে শুনেছি খুব। এখন অন্নদাদির কথা যত ভাবি, মুগ্ধতা যায় না। এই রকম স্রোতের বিপক্ষেই যাওয়াই তাঁর উপন্যাস, পল্লী সমাজ, চরিত্রহীন, গৃহদাহ আর শ্রীকান্ত তো নিশ্চয়ই। আমি ভাগলপুরে সেই গঙ্গা, সেই বট যার ঝুরি ধরে ইন্দ্র বিপুল জলোচ্ছ্বাসে ভরা গঙ্গায় নেমে গিয়েছিল, তা দেখেছি। তখন বাংলা উপন্যাসে ভারতবর্ষ আসত। শরতচন্দ্রের পর দুই বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ী, সকলের লেখায় তা ছিল। পরে তা অনেকটা হয়ে যায় ড্রয়িংরুম নভেল, কিন্তু শরতচন্দ্রের দেবদাস তার মুখ। ব্যতিক্রম তো নিশ্চয় আছে। দেশ, গ্রাম, সমাজ সব নিয়ে ব্যতিক্রম আছে। বড় বড় ঔপন্যাসিক পেয়েছি আমরা যাদের লেখায় মহাপৃথিবী ধরা পড়েছে।

এবার অন্য একটি প্রসঙ্গে আসি, আর্ট, শিল্প। শরৎবাবু আর্ট বলতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। শ্রীকান্ত উপন্যাসে পিয়ারী বাঈ হারিয়ে গেল শ্রীকান্তর জীবন থেকে। চিঠি দিয়ে উত্তর আসে, তার ভিতরে পাটনায় পিয়ারীর বাড়ি যাওয়ার আমন্ত্রণ ছিল না। পিয়ারীর স্মৃতি মলিন হয়ে আসে। তারপর এক সন্ধ্যায়, সেদিন ছিল দোল পূর্ণিমা, খোলা জানালার বাইরে পূর্ণ চন্দ্র, জ্যোৎস্না। চন্দ্রাহত হয়ে শ্রীকান্ত আচমকা বেরিয়ে পড়ে পাটনার টিকিট কেটে রেলগাড়িতে চেপে বসে। পিয়ারীকে মনে পড়েছে যে। কিন্তু নেমে পড়ল পাটনার আগে 'বাড়' স্টেশনে। পকেটে দুয়ানি আর দশ পয়সা। সেখানে দেখা বর্ধমানের মেয়ের সঙ্গে, বিয়ে হয়েছে এতদূরে। তার দিদিরও বিয়ে হয়েছিল এখানে। ক'দিন আগে গলায় দড়ি দিয়েছে। বাবার নাম গৌরী তেওয়ারি, নিবাস রাজপুর, বর্ধমান। তাদের বর বর্ধমানে পাওয়া যায় না, তাই এত দূরে বিয়ে দিয়ে মা বাবা খালাস। খোঁজ নেয় না। দরিদ্র ঘরের মেয়ের এমনই হয়। এই মেয়েও মার খায় শ্বশুরবাড়ি। শ্রীকান্ত একটি চিঠি লিখে দেয় গৌরী তেওয়ারিকে। মেয়ের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে, আর এক মেয়ের কষ্টের কথা লিখে। কী হয়েছিল জানে না। কিন্তু সনাতন হিন্দু সমাজের রীতিনীতি নিয়ে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন এখানে তা আজও প্রাসঙ্গিক। কেবল মাত্র টিকে থাকার ভিতরে কি জীবনের সার্থকতা। এই সব আচার বিচার নাকি হিন্দু ধর্মকে টিকিয়ে রেখেছে। একশো বছর আগের কথা আর এই সময়ের কথা কি আলাদা? এতে কি আর্ট ক্ষুন্ন হয়েছে? শরৎচন্দ্রের উপন্যাস রচনার একশো বছর পার হয়েছে ২০১৭-তে। গ্রন্থাকারে শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯১৭।

বর্ণ গন্ধ রূপের মায়ায় বিজড়িত এক আশ্চর্য লেখক

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শতবর্ষ পার হয়ে গেছেন নিঃশব্দে। কয়েক বছর আগে, গত ২০১২-র ২০শে আগস্ট পার হয়ে গেছে সেই দিন। আমি যেন দেখতে পাই কলেজ স্ট্রিট থেকে মহাত্মা গান্ধি রোড ধরে শতবর্ষ পার করা লেখক একা একা হেঁটে চলেছেন শিয়ালদহের দিকে। বেলেঘাটা পার করে পূর্ব কলকাতার কোথায় যেন তিনি থাকেন। মাঝে মাঝে বাড়ি বদলান। খোলার ঘর, নিম বুনো আম, জারুল, নানা লতা গুল্মে ভরা একটি আশ্রয় তাঁর। সেখানে নানা পাখি, ফড়িং, কাঠবেড়ালি আর সবুজ পাতারা এক বৃদ্ধের সঙ্গে দ্যাখে মায়ার স্নান বিলাস। আমি সেই গিরগিটি গল্পের কথা বলছি। বৃদ্ধের ছিল সৌন্দর্যপ্রিয়তা। সে দেখত রূপ। আর তার চোখের ভিতর দিয়ে মায়া দেখত নিজেকে। বৃদ্ধ যে তাকে দ্যাখে তা কি মায়া জানত না? গাছের পাতা, শালিখ, ফড়িং-ও তাকে দ্যাখে সেই কুয়োতলায় স্নানের সময়। বৃদ্ধের দেখা সেই রকম। নদী ও নারী, বনের রাজা, মঙ্গল গ্রহ, সমুদ্র, চোর, সামনে চামেলি, তারিনীর বাড়ি বদল, খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর, রাইচরণের বাবরি... কত গল্পের কথা বলব। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আমাদের সাহিত্যে ছোট গল্পের এক বিরল শিল্পী। আমাদের মনের আলো অন্ধকার, যৌনতা ও রূপ অরূপের, সৌন্দর্যের নানা অনুষঙ্গের রূপকার। তাঁর গল্প পড়ে জীবনের অতিসূক্ষ্ম মুহূর্তগুলিকে আমরা অনুভব করতে পারি। স্থুল কাহিনির রূপকার ছিলেন না তিনি। বাংলা সাহিত্যে তাঁদের দাপটই তো বেশি ছিল সেই সময়। তার পরিবর্তন খুব বেশি হয়েছে বলে জানা নেই। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প ব্যর্থ মানুষদের নিয়ে। আবার তারাই জীবনের রূপ-অরূপকে চিনতে পারে। অনুভব করতে পারে। “সামনে চামেলি” গল্পের ক্রাচ বগলে সেই যুবকটির কথা মনে করুন। সে রূপ, রূপের আকর্ষণে সেই নির্জন পথে একা একা হেঁটে যেত। তাকে তো ভিখিরি ভেবে ব্যালকনি থেকে পয়সা ছুঁড়ে দিয়েছিল সেই রমণী। এমন অনুভূতিপ্রবণ লেখক আমাদের ভাষায় খুব কমই এসেছেন। ১৯৭৫-৭৬ এ, সেই আমাদের আরম্ভের দিনে তাঁকে আমি দেখেছি কলেজ স্ট্রিটে। অধুনালুপ্ত পুস্তক প্রকাশনী নামের এক প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার কনকবরণ মিত্র ছিলেন তাঁর গভীর অনুরাগী। সেখানে কোনো কোনো বিকেলে এসে বসতেন তিনি। তাঁর সন্তানবৎ আমরা তাঁর সামনে বসে থাকতাম। তাঁর নতুন গল্পের কথা শুনতাম। সাহিত্যের নানা কথা পছন্দ অপছন্দের কথা তিনি বলতেন। নানা লেখকের কথা। আমাদের হয়তো জিজ্ঞেস করতেন কী দেখছি, লেখার কথা ভাবছি কী রকম। এখন সমস্তটাই অলীক মনে হয়। এই জীবনে কি ঘটেছিল তা? এই যে অনেকদিন বাদে আবার পড়লাম ‘রাইচরণের বাবরি’। এতকাল বাদে পড়তে পড়তে কি মনে হচ্ছে না তিনি মৃদু গলায় আমাকে বলছেন, আমি যা দেখিনি তা অনুভব করতে পারিনি, তা লিখিওনি, অনুভবের বাইরে পারিনি লিখতে। কল্পনার ও তো একটি পরিসর থাকতে হবে।

শুনতে শুনতে ‘সামনে চামেলি’ গল্পের কথা, তা থেকে ‘রাইচরণের বাবরি’ গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। হ্যাঁ, একটা কথা না বললে নয়, কলেজ স্ট্রিটে ৫০ বছরের পুরনো প্রকাশকের ঘরে যখন দেখি না বিক্রি হওয়া পুরনো বই-এর ধুলো, আচমকা তাঁর ‘ছাতা’ গল্পটি মনে পড়ে যায়। সেই ভাগীরথি প্রকাশনী, ঠিক দুপুরে খরিদ্দার নেই দোকানে, তখন ‘মেঘলা আকাশ’ বই-এর লেখকের আগমন। বই তার চলেই না। প্রকাশনীর কর্মচারীর পুরনো ছাতা নিয়ে এই অসামান্য গল্প...। আমি দেখতে পাই মন-গহনে বিচরণ করা সেই লেখককে। বাণিজ্যিকভাবে অসফল এক লেখকের কথা ছিল সেই গল্পে। কিন্তু গল্পটি তাঁর নয়, গল্পটি সেই ভাগীরথি প্রকাশনীর কর্মচারী গোলকের। গোলকের নয়, তার ছাতার। ছাতাটি বহুকালের পুরনো, কতবার যে রিপেয়ার হয়েছে, তার বাঁট, তার কাপড়, এটা ওটা কতবার যে বদলেছে গোলক তার কোনো ঠিক নেই। এই ভাবে বদলাতে বদলাতে আসল ছাতাটি আছে কিনা সন্দেহ। সেই ছাতা গোলকের প্রাণ।

ছাতা নিয়েই বই পাড়ায় সে পরিচিত। বই-এর বিক্রিবাটা নেই, নিঝুম বসে আছে গোলক। তখন লেখক মুরারি মাইতি ধানবাদ থেকে এসেছেন আট বছর আগে ছাপা তাঁর মেঘলা আকাশ নামের বই-এর খোঁজ নিতে, কতটা বিক্রি হল, নতুন বই আবার ছাপবেন কিনা প্রকাশক। লেখক ভাল ব্যবহার পান না গোলকের কাছে, কত নামী দামী লেখকের বই বাজারে কাটছে না। শহর, বইপাড়া অশান্ত, মিটিং মিছিল লেগেই আছে। বোমা পড়ছে সবদিনই প্রায়। সেই সময়, ১৯৭০-৭১ এর কলেজ স্ট্রিট আর বইপাড়ার চেহারাটি রয়েছে গল্পে। লেখক বই-এর খোঁজ নিচ্ছেন, তখনই বাইরে ভীষণ শব্দ, বোমা পড়ল বোধহয়। কৌতুহলে ছুটে বেরিয়ে গেল গোলক, তেমন হলে তো ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে। না, টায়ার ফাটার শব্দ। গোলক খবর নিয়ে ফিরে এসে দেখে লেখক নেই। বুকটা ধক করে উঠল। সে দেওয়ালে ঝোলানো তার শার্টের নীচে রাখা সেই পুরনো ছাতাটি দেখল আগে। আছে কিনা, না লোকটা নিয়ে গেল। ধুলিমলিন মেঘলা আকাশ, আর সব না কাটা বই-এর চেয়ে গোলকের কাছে বহুবার রিপেয়ার করা ওই ছাতাটির দাম বেশি।

পুস্তক প্রকাশনীতে যেতেন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়। সেই সময় তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশ করেছিলেন কনকবাবু। তখন আমি সদ্য চাকরি পেয়ে দূর পশ্চিম সীমান্ত বাংলা - মেদিনীপুর, বিহার আর ওড়িশার সংযোগস্থলে গোপীবল্লভপুর থানার এক গ্রামে। কলকাতায় এলে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না। ফেরার দিন সন্ধেয় বঙ্গ বিহার ওড়িশার সংযোগস্থল জামশোলা ব্রিজে নেমে প্রবেশ করতে হত ভিতরে। আমি কলকাতায় বেড়ে ওঠা যুবক, আমার ওই যে যাওয়া আর সেই আদিবাসী অধ্যুষিত এই গল্প অগ্রজ আর বন্ধুদের কাছে করতাম ফিরে এসে। একদিন পুস্তক প্রকাশনীতে গিয়ে দেখি তিনি। কী আশ্চর্য! বসে আছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কনকদা পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রণাম করে তাঁর মুখোমুখি। তাঁর পুত্র তীর্থংকরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সদ্য। পরে হয়েছিলাম অভিন্ন হৃদয়। সেই তো প্রথম দেখা। সেই তো কথা বলা। তাঁর অনেক গল্প তখন পড়া হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেই 'ছিদ্র' গল্পটি নিয়ে খুব আলোড়ন হয়েছিল। অশ্লীল অশ্লীল বলে সাহিত্যের কিছু গার্জেনরা গোলযোগ শুরু করে দিয়েছিলেন। গিরগিটি গল্প নিয়েও তাই হয়েছিল। ক'দিন আগে পুজো সংখ্যায় পড়েছি 'সামনে চামেলি' নামের এক আশ্চর্য সুগন্ধে ভরা গল্প। সুগন্ধের কথা বললাম, তাঁর লেখার ভিতরে বর্ণ, স্পর্শ, গন্ধ – সব পাওয়া যায়। সামনে চামেলিও ছিল এক ব্যর্থ মানুষের গল্প। বিষাদময়। কিন্তু তার ভিতর থেকেও বুঝি এক সুগন্ধ বেরিয়ে আসে।

"সেই একটা রাস্তা। ভারি সুন্দর। আপনারা দেখেছেন কি! খুব নির্জন। হয়ত দেখেছেন, মনে নেই। তার মানে যতটা মন দিয়ে দেখার দরকার, ততটা মন ছিল না। যে জন্য রাস্তাটা ভুলে গেছেন। এই হয়। কেন না চলতে চলতে দেখা, আর দেখবার জন্য থমকে দাঁড়ান এক কথা নয়। (সামনে চামেলি)"

সে ছিল একটা নির্জন রাস্তা আর সেই রাস্তায় ক্রাচ বগলে সে হাঁটে। দুঃখী, বঞ্চিত আর ব্যর্থ মানুষের কল্পনা আর আকাঙ্খার গল্প। খুব বড় লেখক, আমার পিতৃতুল্য লেখক জিজ্ঞেস করতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তখন তিনি শিশুর মতো। আমরা যারা ওই পুস্তক প্রকাশনীতে যেতাম, শচীন দাস, সমীর চট্টোপাধ্যায়, কখনো কবি তুষার চৌধুরী এবং পবিত্র মুখোপাধ্যায় – সকলেই তাঁকে পড়েছেন। তাঁর নানা লেখা নিয়ে আমাদের নানা কৌতুহল নিরসন করতেন হয়ত কখনো, কিন্তু বারবার প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন। আমার মনে আছে আমি তাঁকে শুনিয়েছিলাম আশ্চর্য এক অভিজ্ঞতার কথা। গ্রামীণ যাত্রাদল আসছে শীতের ধানকাটা মাঠ ভেঙে, সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে। হিরোইনের কোলে দুধের বাচ্চা। কোন ভোরে বেরিয়েছে ধ-ডাংরি যাত্রাদল। বেলা বারোটার পর এসে পৌঁছল। হিরোইনের মাথার চুলে খড়কুটো, বাচ্চা কাঁদছে। রাস্তার দুপারে দাঁড়িয়ে গাঁয়ের চাষাভুসো মানুষজন দেখছে তাকে। কে যেন হেঁকে উঠে ডাকল আমাকে, হিরোইন হিরোইন দেখুন স্যার... তিনি মগ্ন চোখে তাকিয়ে আমার দিকে। আমি কুণ্ঠিত গলায় বললাম, আপনি এইটা নিয়ে লিখবেন?

হাসলেন তিনি, বললেন, 'তুমি দেখেছ, অনুভব করেছ, তুমি লিখতে চেষ্টা করো, আমি তো এসব দেখিনি।'

অনেক বছর পরে আমি সেই গল্পটি লিখেছিলাম, 'বাদশা ও মধুমতী'।

খুবই নিমগ্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর লেখা তাঁরই মতো। এখনো মনে হয় তাঁর কোনো পূর্বসুরী বাংলা সাহিত্যে ছিল না। আর তাঁর মতো আধুনিক লেখকও বাংলা সাহিত্যে বিরল। কবি জীবনানন্দের অসম্ভব অনুরাগী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গভীর নিমগ্ন-মর্বিড লেখার সঙ্গে পরে জীবনানন্দের অনুভূতিময় গদ্যের কোথাও বুঝি মিল আছে, কিন্তু সেইসব গদ্য খুঁজে বের করে ছাপা যখন শুরু হয়, তখন তিনি প্রয়াত। সেই গত শতাব্দীর ৩০-এর দশকের শেষে 'নদী ও নারী' গল্প দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। ১৯৭৯-তে প্রয়াণের সময়ও অসম্ভব সক্রিয়। তাঁর গল্পের জন্য আমি অপেক্ষা করে থাকতাম। মনে পড়ে কত গল্পের কথা।

রাইচরণের বাবরি ছিল খুব বাহারের। সে একটা দরজির দোকানের মালিক। একটা পা মেসিন, খুপরি ঘর, শিয়ালদার রাস্তা যেখানে বউবাজারের রাস্তায় বেঁকেছে, সে ভীড় জমজম জায়গায় বাবরি দুলিয়ে রাইচরণ সেলাই করে (হ্যাঁ, সেই রাস্তার বাঁক এখন অন্তর্হিত, দৈত্যাকার ফ্লাইওভারবিহীন সেই পুরোন কলকাতা আছে এই সব গল্পে)। বাবরি নিয়ে রাইচরণের খুব গর্ব। তার বাবরি দেখে পাড়া-প্রতিবেশী মুগ্ধ। পথ চলতি মানুষ মুগ্ধ। সেলাই মেসিনে পা চলছে খলিফার, তার মাথার কালো কুচকুচে থাক থাক বাবরি দুলছে। ব্যস্ত-সমস্ত পথচারীর চোখ পড়ে গেলে দাঁড়াবেই। তারপর আলাপ করবার উদ্দেশে ভিতরে প্রবেশ করে হয়তো সেলাইয়ের অর্ডার দেবে। তা হয় ও। বাবরি তাকে খরিদ্দার এনে দেয়। বাবরি নিয়ে এত গর্ব রাইচরণের, কিন্তু তার বউ দেখতে পারে না ওই চিতাবাঘের জঙ্গল। রেগে বলে,বটি দিয়ে চুলের গোড়া সুদ্ধ কেটে দেবে। একদিন সুযোগ পেলে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পুড়িয়ে দেবে। রাইচরণ হাসে। সে বাবরিকে পরিচর্যা করে স্নানের আগে। বাঁ হাতের তেলোয় এতখানি তেল গবগব করে ঢেলে সামনে আরশি নিয়ে আধ ঘন্টা ধরে তেল মাখায় বাবরিকে। মানদা বলে, কী হবে ওই বাবরি দিয়ে, তেল খরচ করে, তার কতদিনের সাধ শশীর বউয়ের মতো একটা স্কার্ট পাড় শাড়ির, হলো কই? রাইচরণ চুপ করে থাকে। সত্যিই তো, তার যদি বাবরি নিয়ে এমন আহ্লাদ থাকে, মানদারই বা ঐ স্কার্ট পাড় শাড়ির শখ থাকবে না কেন? তাদের ছেলেমেয়ে নেই। রাইচরণ জানে তার বাবরি তার দোকানের হাল ফেরাবে। বাবরি তো খরিদ্দার আনে তার দোকানে। হ্যাঁ, তা হয়। একদিন সেই নিরিবিলি দোকানে একটি ফিটফাট বাবু এসে ঢুকল। বাবু অর্ডার দিল না, কিন্তু কথায় কথায় রাইচরণের ঠিকুজি জেনে নিয়ে বলে, এইসব দর্জির কাজ তাকে মানায় না, দোকানে বসে কল চালাতে হিমসিম খাচ্ছে রাইচরণ, অথচ ওই চুল দিয়ে সে দেশজোড়া নাম কিনতে পারে। থিয়েটার কোম্পানির ম্যানেজার লোকটি ১০০ টাকা মাস মাইনের প্রস্তাব দিল তাকে। শুনে রাইচরণ হতভম্ব, তার সাতপুরুষে কেউ যাত্রা থিয়েটার করেনি, সে পারবে না। কিন্তু ম্যানেজার নাছোড়বান্দা। পরেরদিন আসবে বলে গেল।

রাইচরণ যাবে না ঠিকই করেছিল, কিন্তু মানদাকে কথাটা বলেই সে ভুল করল। মানদা বলল, না গেলে রাইচরণ ঘুমোলে তার চুল নিকেশ করে দেবে সে। একশো টাকা কে দেয়? খলিফাগিরি করে কত হয় রাইচরণের? অগত্যা যেতে হয় ১০০ থেকে বেড়ে ১২৫ টাকা মাস মাইনেতে। দোকানে তালা ঝুলিয়ে রাইচরণ গেল। রাইচরণের বাবরির এত দাম তা সে কি জানত? সে থিয়েটার কোম্পানির নতুন এক পালায় এক ডাকাতের রোল পেয়েছে। রাইচরণ ধন্ধে পড়ে। সে তো ডাকাত হয়ে নামে মঞ্চে, কিন্তু সে তো সত্যিকারের ডাকাত নয়? ম্যানেজার বলল, তা হবে কেন, তাকে মঞ্চে উঠে বইয়ের কথা কটা বললেই হবে।

আসলে সব মিথ্যে। ডাকাতের সাজ-পোশাক, কথাবার্তা, লুঠতরাজ—সব। দর্শকও জানবে তাই। তারা শুধু সাময়িক ভাবে ধরে নেবে যেন সত্যি এক ডাকাত তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাইচরণ ছেড়ে এল কাজ। কেন না, তার সবটাই যখন মিথ্যে বলে ধরে নেবে দর্শক, যেখানে সাজ-পোশাক, হাব-ভাব, কথাবার্তা সব মিথ্যে বলে জানবে দশক, বাবরিটা আলাদা ভাববে কেন? ভাববে নিঘঘাত ওটা একটা পরচুলা। তাতে তার সাধের বাবরির মান যায়। বাবরি তার অতি যত্নের। তাকে সে অসম্মান হতে দেবে কেন? ১২৫ টাকা

মাস মাইনের দামী কাজ ছেড়ে রাইচরণ ফিরে এল তার সেলাই মেসিনে। ওই টাকার চেয়ে তার বাবরির দাম তার কাছে অনেক বেশি। রাইচরণ কি শিল্পী? শিল্পী তো নিশ্চয়। সে তো রূপ-অরূপ চেনে। চেনে সৌন্দর্য। শিল্প। মনে মনে সে সত্যিকারের আর্টিস্ট। বাবরি তার যত্নে রাখা পরম ভালবাসার জিনিস। সৃষ্ট শিল্প যেন। তার অপমান সে সহ্য করে কী করে?

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন রূপ আর সৌন্দর্যে মুগ্ধ এক লেখক। অন্তরের রূপ আর বহিরের রূপ, দুই-এর কথাই বার বার ফিরে এসেছে। আর সেই রূপের সাক্ষী যারা, তারা তো একেবারে ব্যর্থ, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অসফল মানুষ। আবার গিরগিটি গল্পটির কথা মনে করি না কেন, বুড়োটা প্রতিদিন অপেক্ষা করে থাকে মায়া কখন আসবে কুয়োতলায়। বুড়োটা একেবারে ক্ষিন্ন জীবন যাপন করে, মায়াদের পাশের খোলার ঘরে থাকে। এ বাড়ির উঠোন যেমন ফাঁকা, কুয়োতলাটাও। মায়া চেয়েছিল এমনিই বোধহয়। কুয়োতলার চারদিক, এই উঠোনের এদিক ওদিক নানা গাছগাছালি। বর্ষা ঋতু বলে উঠোনের ডান পাশের নিম গাছটি পাতা ও ফলে ভরে গেছে। পাকা নিমফল একটি দুটি মাটিতে পড়ছে...। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ছিলেন প্রকৃতির রূপ মগ্নও। কুয়োতলায় একা একা স্নান করে মায়া। তার রূপ দেখে গাছগাছালি, পাখিরা, টিয়া বুলবুলিরা। তাতে কি হয়েছে, মায়া এই নির্জন কুয়োতলায় নিরাবরণ হতে পারে। আগে যেখানে ছিল ভাড়ায়, সেখানে পারত না। কুয়োতলায় মেয়েদের কি ভিড়। সেখানে একটি মেয়ের গা থেকে কাপড় সরে গেলে অন্য মেয়েরা সন্দেহভরা চোখে দেখত। মায়া এই নির্জন কুয়োতলায় নিরাবরণ হয়ে সুখে গায়ে জল ঢালার পর আচমকা টের পায় শুকনো পাতার উপর দিয়ে কে যেন হেঁটে আসে। একটা হাড়ি হাতে করে বুড়ো ভুবন সরকার অদূরে পেয়ারা গাছের গা ঘেসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পাঁকাটির মত সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর, শনের মত পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ফ্যাকাশে চোখ... এমন যার চেহারা, সে যদি কখনো মায়ার ধারে কাছে আসে, কি পাশ কাটিয়ে চলে যায়, পুরুষ বলেই মনে হয় না। মনে হয় মৃত নিষ্প্রাণ সহস্র ক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটি।

সেই বুড়োর সঙ্গে মায়ার কথা হয় একটি দুটি। বুড়োর সঙ্গে মায়া নরম মনে কথা বলে। অস্থিসার সেই বুড়ো একদিন বলে, দিদিকে দেখলে তার ওই ডালিম চারাটির কথা মনে হয়। কোন ডালিম চারা? লেখক লিখছেন, "লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটু খানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল।...।" নতুন গাছ, যৌবন লেগেছে গায়ে। বুড়ো গাছগাছালি, প্রকৃতির মত দেখে যুবতী মায়াকে। মায়ার সঙ্গে কথা বলে ধন্য হয়। মায়াও গোপনে টের পায় বুড়ো তার রূপে মুগ্ধ। তার রূপ দেখে বুড়ো, যেমন দেখে গাছগাছালি, পাখিরা, হাজার পাতার চোখ নিয়ে নিম গাছটি, ফড়িং, প্রজাপতি, কাক, বুলবুলি, শালিক যখন মায়ার হাত দেখছে, পা দেখছে, পিঠ, কোমর, ভুরু, চোখ, চুল, নখ – সে তো রাগ করে না, খুশি হয়। বুড়ো তো তেমনিই কেউ। দেখে, তাই মনে হয় বেঁচে আছে। বুড়ো যেন আয়না। গল্প থেকে শেষটুকু উদ্ধৃত করি, 'এই জংলা ছিটের সায়াটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলছেন না তো, কেমন দেখাচ্ছে?'

খসখসে গলায় ভুবন হাসল।

'বলব, বলছি, ওটা পরনে দেখে তখন থেকেই তুলনাটা আমার মনের মধ্যে কেবল নাড়াচাড়া করছে। চিতাবাঘিনী, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘষা কোমর দিদির।'

'তাই নাকি, ঘরে গিয়ে আয়নায় দেখব তুলনাটা ঠিক হল কিনা।'

'কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখকে কি দিদির বিশ্বাস হয় না?'...

মায়া বলেছিল, 'বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন?'

গিরগিটি গল্প যৌনতার নয়, সৌন্দর্যের। এমন সৌন্দর্যের গল্প আমাদের সাহিত্যে আর নেই। আমরা এমন গল্প পড়তে অভ্যস্ত ছিলাম না। আমরা কাহিনির নানা ঘোরপ্যাঁচে অভ্যস্ত। মনের অতলে প্রবেশ করতে

আমাদের খুবই অনীহা। আমরা রূপ-অরূপের খোঁজ রাখিনা, তাই গিরগিটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই সম্পাদককে নিরূপায় হয়ে কিছু অংশ বাদ দিতে হয়। তবু তিনি ছেপেছিলেন সাহিত্যের সত্যকে চিনে। এই কথা তাঁর কাছ থেকে শুনেছি ভারবি থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প প্রকাশিত হওয়ার পর। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন মূল পাঠ, তাঁর মূল গল্পটি ছাপা হল না এডিট করা অংশ ছাপা হল। হ্যাঁ, এডিট করা গল্প শ্রেষ্ঠ শারদীয়ায় ছাপার পর গেল গেল রব উঠেছিল। অশ্লীল বলে তাঁকে দুষেছিল। এই চিৎকার তাঁর ছিদ্র গল্পের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। খুব লেগেছিল গড়পড়তা পাঠকের। এতটা সত্য কি সহ্য করা যায়! গল্প এগোতে এগোতে যে ওই সব দুর্জ্ঞেয় জায়গায় পৌঁছতে পারে তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। ভারবি প্রকাশিত সেই শ্রেষ্ঠ গল্পটি তিনি স্বাক্ষর করে দিয়েছিলেন আমাদের। বইটি আমার কাছে রয়েছে। কতদিন আগের কথা এসব। বইটিতে কী করে ঘুণ ধরল তা আমি জানিনা। আলাদা করে রেখে দিয়েছি। আমার ঈশ্বরের ছোঁয়া রয়েছে যে।

শতবর্ষে নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলাদেশের তরুণ বন্ধু, লেখক স্বকৃত নোমান ফরিদপুর গিয়েছিল নরেন্দ্রনাথ মিত্রর গ্রামে শতবর্ষ উদযাপনে ২০১৬-র ৩০শে জানুয়ারি। সেই উদযাপনে নরেন্দ্রনাথের পুত্র অভিজিৎ মিত্র গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত হয়ে। স্বকৃত নোমান আমাকে ছবি পাঠিয়েছিল আন্তর্জালে। সমস্ত রাত ধরে অনুষ্ঠান, গল্প পাঠ, কবিতা পাঠ, স্মৃতি চারণ, আলোচনা নিয়ে শতবর্ষ উদযাপন। সারারাত সেই গ্রাম জেগেছিল। সারা দেশ থেকে বহু সাহিত্য অনুরাগী শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন এই মহৎ সাহিত্যিককে। আমাদের এখানে ২০১৬-য় নরেন্দ্রনাথ একশো বছর অতিক্রান্ত হন এক বিস্ময়কর নীরবতার ভিতর দিয়ে।

আমি আমার কৈশোরে, সদ্য যৌবনে এই বড় লেখককে দেখেছি। একই অঞ্চলে আমাদের বসবাস। তাঁর গল্প পড়ে বড় হয়েছি। যদি লিখতে শিখে থাকি, তাঁকে পড়েই অনেকটা। মাঘে জন্ম নরেন্দ্রনাথের। এই সেই মাঘ মাস। আর তখনো ছিল এই মাঘ মাস, তখনো কোনো এক পল্লীর গাছি মোতালেফ রসের কলসি নামিয়ে আনছে খেজুর গাছ ছুলে। ঘরে রূপসী বউ ফুলবানু, তার হাতে রসের জ্বাল ভাল হয় না। পুড়ে যায় গুড়, ধরে যায়। মোতালেফ ভেবেছিল অমন সুন্দর বিবি, তার হাতের জ্বালে খেজুর রসের গুড়ের স্বাদ কত না সুন্দর হবে। মোতালেফ কী করেছিল, যার হাতে হতো গুড়ের অপূর্ব সোয়াদ সেই অতি সাধারণ, কুরূপা মাজুবিবিকে তালাক দিয়েছিল জীবন রসের ভিয়েন সুস্বাদু করতে। তালাক দেওয়ায় মাজুবিবি চলে গিয়েছিল নাদির শেখের বিবি হয়ে। এক রসের লোভে আর এক রসের কুম্ভ বুঝি ভেঙে দিয়েছিল মোতালেফ। বেওয়া মাজুবিবিকে সে শাদি করেছিল রসের সিজিনে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির জন্য। মাজুবিবি ছিল এই কাজে শিল্পী। তার হাতের গুড় হয় অমৃত। সেইবার গুড় বেচে প্রচুর টাকা লাভ করে মাজুবিবিকে তালাক দিয়ে সুন্দরী ফুলবানুকে ঘরে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফুলবানুর পণের টাকা জোগাড় করার জন্যই না মাজুবিবিকে শাদি করা। টাকা উঠে গেলে আর মাজুবিবিকে রাখবে কেন সে? ফুলবানু রূপসী বটে, কিন্তু রস জ্বাল দেওয়ায় আনাড়ি। পরের সনে মোতালেফের গুড়ের খ্যাতি গেল। আগের সনের গুড় আর এই সনের গুড়ে আকাশ পাতাল পার্থক্য। হাটের লোক ছ্যা ছ্যা করতে লাগল। মোতালেফ নিজেও তো শিল্পী। মরমে মরে গেল। ফুলবানুর সঙ্গে তার পীরিতি গেল। শুধু বাহিরের রূপ আর জেল্লা নিয়ে সে কী করবে? সে মাজুবিবির কাছে রওনা হলো। ভিটেয় ফুলবানু বসে কাঁদে। এ এক অপরূপ প্রেমের গল্প। রস-এর মতো গল্প বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। গিয়েছে সেই মাঘ মাস, সেই মাসে গোটা দেশ ছিল উৎসবে মত্ত। রসের কারবারি মোতালেফ মিঞার কথা ভুলে গেলাম আমরা? রসের উৎসব, সাহিত্যের উৎসব, লিটারারি মিট, সেখানে চিত্র তারকা থেকে ইংরেজিতে লেখা কুলীন ঔপন্যাসিকের ভীড় ছিল। চিত্র তারকা তাঁর জীবন দর্শন বলছেন। কেউ কেউ কত বই বিক্রি হয় তার হিসেব কষছেন। এরই ভিতর নিঃশব্দে তিনি ১০০। বড় খারাপ লেগেছিল। এমনই নিঃশব্দে শতবর্ষ পার করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২০১২-এ। নরেন্দ্রনাথের তাঁর মতো বড় ছোটগল্পের লেখক এই উপমহাদেশে জন্মাননি। আমাদের বিস্মরণ সীমাহীন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে দেখতে দেখতে আমি বড় হয়েছি। ধুতি আর খুব সম্ভবত শাদা আর্দির পাঞ্জাবি পরা নরেন্দ্রনাথকে আমি দেখেছি পাইক পাড়ার দিক থেকে হেঁটে আসছেন বেলগাছিয়ার রাস্তায়, একা একা, নিজ মনে। তাঁর রস, শ্বেতময়ূর, পালঙ্ক, এক পো দুধ, টিকিট, চিলেকোঠা, হেড মাস্টার, চোর, চাঁদ মিঞা, বিলম্বিত লয় - এই সব গল্পের সঙ্গে তখন পরিচয় হচ্ছে ধীরে ধীরে। কত তুচ্ছ ঘটনা, কত তুচ্ছ মুহূর্ত থেকেই না তিনি গল্প বের করতে পারতেন। আর সেই গল্প হত কী অনুভূতিময়। পাঠক আপনি টিকিট গল্পটির কথা স্মরণ করুন। ছেলেটির অভ্যাস প্রতিদিন বাবা বাড়ি ফিরলে টিকিটটি সংগ্রহ করা। ট্রামে টিকিট ফাঁকি দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল বাবা। বাড়ি ফিরে শিশু সন্তানের হাতে ধরা পড়ে যায় ট্রামের টিকিটে দুপয়সা বাঁচিয়ে তৃপ্ত বাবা। মধ্যবিত্ত,

নিম্নবিত্তের মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারতেন নরেন্দ্রনাথ। ‘চোর’ গল্পটির কথা মনে করি, অমূল্য সামান্য এক দোকান কর্মচারী। ঘরে নতুন বউ রেনু। অমূল্যর হাত সাফাই-এর অভ্যাস। দোকান থেকে স্নো, পাউডার, চিরুনি নিয়ে আসে লুকিয়ে। বউ রেনু তা পছন্দ করে না। অমূল্য বিয়ের পর রেনুকে নিয়ে কলকাতা দেখাতে কিংবা সিনেমায় যেতে ট্রামের ভাড়া দেয় না ফার্স্ট ক্লাসে চেপে। ঘাড় কাত করে কিংবা আবোলতাবোল গল্পের অভিনয় করে ট্রামের টিকিট ফাঁকি দেয়। রেনুর ভয় করে। যদি ধরতে পারে কন্ডাক্টর? কী অপমানই না করবে। অমূল্য হেসেই উড়িয়ে দেয়। তা আবার হয় নাকি! ফার্স্ট ক্লাসে ওঠাই তো ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার জন্য। সেই অমুল্যই তাদের ভাড়াটে বাড়ির দোতলা থেকে রেনুকে কাঁসার বাটি সরিয়ে আনতে উপদেশ দেয়। রেনু লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যায়। ওপরের মাসিমার কাছে যায় সে। সেই ফ্ল্যাটের বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আসে রেনু। সে কি পারে? অমূল্য যখন তাকে আদর করে, রেনুর গা ঘিনঘিন করে। ইস, অমূল্য কেন ভাল হয় না। এর ভিতরেই অমূল্যর চাকরি যায়। দোকানের বুড়ো ক্যাশিয়ার তার বউয়ের জন্য অমুল্যকে সাফাই করতে বলেছিল স্নো পাউডার, অমূল্য তা না করায় মালিকের কাছে সাতকাহন করে লাগিয়ে সে তার চাকরি খেয়েছে। কী হবে? এই গল্পে অভাবী রেনুই শেষ পর্যন্ত অমূল্যর পথ অনুসরণ করে উপরতলা থেকে একটি ঘড়ি চুরি করে আনে। অমূল্য বলেছিল বটে, কিন্তু শেষ অবধি যে রেনু তাই করবে, তা সে ভাবেনি। প্রেমের মুহূর্তে রেনুর কঙ্কন-ক্বণিত মৃণালভুজ তার কাছে শ্রীহীন কলঙ্কিত হয়ে যায়। মনের বিচিত্র যে রূপ তা নরেন্দ্রনাথের গল্পে বারবার ঘুরে এসেছে। তিনি শুধুমাত্র কাহিনিকথক ছিলেন না, ছিলেন জীবনদর্শী।

শ্বেতময়ূর গল্পে দাদার বন্ধু জার্মান যুবক কদিন অতিথি হয়েছিল তাদের বাড়ি। কিশোরী মেয়েটি জানে না সেই যুবকের মনে প্রেমের সঞ্চার হয়েছে তার প্রতি, যেমন হয়েছিল তারও। যাওয়ার দিন সেই জার্মান যুবক নিজের ভাষায় তার যে আবেগ প্রকাশ করল তা কিশোরী মেয়েটির মন দুমড়ে দিল। প্রেমের ভাষা কেউ চিনতে ভুল করে না। একজন জার্মান, অন্যজন বাংলায় কথা বলে যাচ্ছিল। বাংলা ভাষায় এমন প্রেমের গল্প আমরা খুব কম পড়েছি। আমি বলছি অন্য এক গল্প “রানু যদি না হত”র কথা। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অসামান্য গল্প বলিয়ে। তাঁর মতো গল্প কথক আমাদের সাহিত্যে আর আসেননি। নরেন্দ্রনাথের গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি যেন আকাশ থেকে গল্প নামিয়ে আনতেন। তিনি যেন প্রাচীন কালের গ্রামবৃদ্ধের মতো শোনাতে পারতেন কতকালের পুরোন সব কাহিনি। বৎসরাজ উদয়ন আর বাসবদত্তার কাহিনি। নিরূপায় মানুষ, দুঃখী মানুষ, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ মানুষ তাঁর গল্পের মানুষ।

হেডমাস্টার গল্পের কথা মনে করি। দেশভাগের পর হিন্দু ছাত্ররা ওপার থেকে এপারে চলে আসায় পূর্ববঙ্গের সাগরপুর এম.ই. ইস্কুলের হেড মাস্টার মশায়ের ছাত্র কমে গিয়েছিল খুব। দেশভাগের পর তিনি ঠিক করেছিলেন ওপার থেকে আসবেন না, কিন্তু আসতে বাধ্য হন, ইস্কুল চলছিল না। যা ছাত্র ছিল, তাদের সকলের কাছ থেকে বেতন আদায় হয় না। বুড়ো হয়েছেন। কলকাতায় এসে তাঁর দিন চলবে কী করে পরিবার নিয়ে? পঞ্চাশোর্ধ হেড মাস্টার মশায় সওদাগরী অফিসে চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছেন। গ্রামের ছাত্রর অফিসে এসে তার কাছেই চাকরি প্রার্থনা করছেন। একটি মেয়ের বিয়ে হয়নি, তিনটি নাবালক পুত্রও আছে। কত বড় সংসার, কী করে চলবে? হেড মাস্টার মশায়কে তার ব্যাঙ্কে ক্লার্কের চাকরি দিয়েছিল ছাত্র নিরুপম। হেড মাস্টার মশায় খুব ভালো ইংরিজি পড়াতেন। তাঁর ছাত্ররা কৃতী। তিনি তাঁর এতকালের অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। গল্পটি এত হৃদয় গ্রাহ্য, এত মানবিক যে পড়তে পড়তে স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হয়। পার্টিশন আমাদের জীবনকে কত রকম ভাবে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছিল তা নরেন্দ্রনাথের গল্পে ধরা যায়। মানুষের বেঁচে থাকার ভিতরেও যে নির্মমতা তৈরি হয়েছিল, তা তাঁকে না পড়লে ধরা যায় না। নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প জীবিকার কথা বলেছে। পার্টিশন জীবিকা বদল করে দিয়েছিল। মেয়েদের ঘর থেকে বাইরে এনেছিল জীবিকার খোঁজে(অবতরনিকা, যা সত্যজিৎ রায়ের মহানগর সিনেমা)। কত আধুনিক ছিলেন তিনি।

“রানু যদি না হত” এই শহরের এক সতের বছরের মেয়ে রানুর গল্প। এই শহর মানে এই ২০১৬-র শহর তো নয়। সেই শহর আমার ছোটবেলার। ষাটের দশক হতে পারে। পঞ্চাশের দশকও হতে পারে গত শতাব্দীর। তারপর পৃথিবী অনেকখানি পথ পার হয়েছে। পুরনো ধ্যান ধারনা বদলে গেছে অনেক। নরেন্দ্রনাথ তাঁর চারপাশের মানুষের মুখ আঁকতেন নানা রঙে। আমি বার বার মৃদুভাষী, আত্মমগ্ন এই লেখককে দেখে আপ্লুত হয়েছি। রানুর গল্পটি এক আত্মমগ্ন মেয়ের গল্প। নিতান্ত মধ্যবিত্ত কেরানি বাবার কন্যা রানু। কলেজে পড়ে। মা থাকে প্রায়ই অসুস্থ। রানুকে সব দেখতে হয়। সে তো মা বাবার প্রথম সন্তান। তার পরে আর এক বোন বুলু, দুইটি বালক ভাই। নরেন্দ্রনাথ যে নিম্নবিত্তের সংসার আঁকেন, সেই সংসারেই আমরা বড় হয়েছি। এই বয়সে তাঁর গল্প পড়তে গেলে সেই কলকাতা সেই ছোটবেলাকে দেখা যায়। বিস্মৃতি স্মৃতিতে ফিরে আসে।

রানুর মায়ের অসুখ, জ্বর। বুড়ো ডাক্তার বলেছে বিকেলে এসে মিকশ্চার নিয়ে যেতে। ডিসপেন্সারিতে মিকশ্চারের শিশি রেখে রানু কলেজে গেল, ফিরল সাড়ে চারটে নাগাদ সেই বুড়ো ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে। ডাক্তার বিকেলে থাকে না। থাকে যে কম্পাউন্ডার সেও বুড়ো। এই ডিসপেনসারি তাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর, এর চেয়ার টেবিল থেকে সমস্ত ফার্নিচার পুরোন। এখানে যে কেন আসে বাবা মা বার বার। বুড়ো ডাকতারের বুড়ো কম্পাউন্ডার নেই। তার টেবিলে রানুর রেখে যাওয়া শিশিটি রয়েছে। রানু বসে আছে। ডিসপেনসারিতে আছে বুড়ি ধাই সারদা। হতাশ বিরক্ত রানু যখন চলে যাবে ভাবে, ধাই বুড়িকে সেই কথা বলতে সে রানুর হাত ধরে ফেলে। আর একটু বস। কম্পাউন্ডার এসে যাবে। বুড়ি বলে, তার হাতেই জন্ম হয়েছিল রানুর। সে-ই খালাশ করেছিল তাকে। জানে রানু তা। বাড়িতেই শুনেছে সে কথা। কিন্তু এর পর বুড়ি যা বলে তার জন্য রানু প্রস্তুত ছিল না। বুড়ি বলছে, রানু তো জন্মাত না, শুধু মেয়েমানুষের জান বলে আসতে পেরেছে। সে আবার কেমন কথা? রানু কৌতুহলী হয়। বুড়ি কথাটা ভাঙতে শুরু করে ধীরে ধীরে। সেই সতের বছর আগে এক দুপুরে এই ডাক্তারখানায় রানুর ঠাকুরদা এল হাঁপাতে হাঁপাতে। কী হয়েছে, না তার তিন মাসের পোয়াতি বউমা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার বোধহয় সব্বোনাশ হয়ে গেল। ডাক্তার আর ধাই ছুটল সেই বাড়ি। দেখল সত্যি। ধাই তো সব বোঝে। ডাক্তার চিকিৎসা করে বাঁচাল বউকে আর তার পেটেরটাকে। কিন্তু হল কেন অমন? ডাক্তারের জেরায় রানুর বাবা গোপনে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, তার চাকরি নেই, বউকে সে পড়াবেও ভেবেছে, এখন সন্তান হলে খুব অসুবিধে হয়ে যাবে ভেবেছিল, সন্তানটিকে নষ্ট করতে চেয়েছিল সে।

রানু জানল, সে না আসতেও পারত। তাকে মা বাবা চায়নি সে আসুক, তবু সে এসে গেছে। রানু কেমন শূন্য হয়ে গেল। এ পৃথিবীতে তার না আসবার, না থাকবার কথাই তো সবচেয়ে বেশি ছিল। এই যে সন্ধেবেলায় এমন আলোয় ভরা লোকজনভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এই চলবার কোনো কথা ছিল না।

প্রতিদিনের অভ্যাসে বাড়ি ফেরা রানু আজ বিরক্ত বাড়ির উপর। মায়ের কাছে গেল না অভিমান আর রাগে। তাকে চায়নি মা বাবা। এই গল্প ক্রমশ নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারের দীনতার ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাবা হেমাঙ্গ বাড়ি ফিরে রানুর কাছে খোঁজ নেয় তার কী হয়েছে যে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে? তারপর হেমাঙ্গ বেরোয় টাকা ধারের জন্য হাতিবাগানের দিকে। মাসের শেষ যে। রানুর দুই ভাই, বাড়ির দুই বালক খাওয়া নিয়ে বায়না করে। শুধু ডাল ভাত খেতে চায় না। রানুর পরের বোন বুলু জেরবার। রানুর মা, অভাবী সংসারের অসুস্থ গৃহিনী অপারগ স্বামীর প্রতি অভিযোগ জানায় নিজের মনে, খেতে দিতে না পারলে জন্ম দেওয়া কেন? মায়ের আক্ষেপ, ভাই দুটির না মেটা ক্ষুধার বাস্তবতা রানুকে ধীরে ধীরে নিজের সত্তার কাছে ফেরায়। সে ঘরের অন্ধকার থেকে বেরোয়। তাদের শোয়ার ঘর আর রান্না ঘরের মাঝখানে একফালি উঠন। তার উপরে তারায় তারায় ভরা আকাশ। রানু অনুভব করে, সে না এলে এই বিরাট আকাশ আর বিপুলা পৃথিবীর হয়তো কিছুই এসে যেত না। কিন্তু সে যখন কোন না কোন ভাবে একবার এসে পড়েছে, তখন এর

চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে। এই গল্প ফিরে ফিরে পড়ি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র নীরবতার ভিতরে ১০০-পার হয়ে গেছেন। তিনি হৃদয়ে জড়িয়ে থাকুন।

সিন্ধুতীরে ফেরা-শ্যামলবাবু

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে কী বলব। কী লিখব তার সৃষ্টিশীল জীবনের বিস্তার নিয়ে, তার আন্দাজ নেওয়া কঠিন হয়ে গেছে আমার পক্ষে। গত তিরিশ বছর ধরে যে লেখককে পড়ছি নিবিষ্ট হয়ে, বছর চব্বিশ যাকে দেখেছি খুব কাছ থেকে তাঁর এই অসম্ভব মৃত্যু নিশ্চিতভাবে আমাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকিয়ে দিয়েছে। মানুষ কত নিরুপায়। মানুষ আর একটা অবিকল মানুষ তৈরি করতে যাচ্ছে, স্মৃতি হারানো মানুষের ব্রেন-সেলে নতুন ভ্রূণের মস্তিষ্ক কোষ স্থাপন করতে শিখেছে নাকি, কত রকম মারণাস্ত্র, যুদ্ধ বিমান, মারণ গ্যাস, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছে, খাদ্যের প্রয়োজনে চার ঠ্যাংওয়ালা মুরগি তৈরি করছে কী মহান জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিদ্যা প্রয়োগ করে, আবার জাপানে গরু ষাঁড়ের ঘাড়ে, হিপে ইলেকট্রিক জার্কার বসিয়ে তাদের গায়ের মাংসে যাতে ফাইবার না গড়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করছে সুস্বাদু মাংসের প্রয়োজনে— এত সব করেও কিনা একটা প্রবল ভাবে বেঁচে থাকতে চাওয়া, বেঁচে থেকে সৃজনকর্মে বিভোর হয়ে থাকতে চাওয়া একটা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে না। সারিয়ে তুলতে পারে না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দশ লক্ষ বছর আগে' নামের আখ্যানটি যদি কেউ এই সময়ে আবার পড়ে নেন তবে এইসব প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। 'দশ লক্ষ বছর আগে' নামের ক্ষুদ্র উপন্যাসটি পড়তে পড়তে এখন আচমকা আমার মনে হচ্ছে শ্যামলবাবু কি টের পেয়েছিলেন তাঁর জাগতিক জীবনের ভবিতব্য? এমনই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন তিনি? নাকি এ আমার নিতান্তই কষ্টকল্পনা। কিন্তু প্রাণরহস্যের, জীবনজন্মের যে আশ্চর্য কাহিনি লিখেছিলেন শ্যামল বাবু তাঁর অসুখের কয়েকমাস আগে, তার তুল্য অন্তর্ভেদী, হৃদয়বিজড়িত, এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্নেভরা কাহিনী আমি বহুদিন পড়িনি। বহুকাল।

হৃদয়বেত্তা এবং যুক্তির ভিতরে নাকি দ্বন্দ্ব প্রবল। হৃদয় যখন বিস্তারিত হয়, যুক্তির জাল তাতে ভেসে যায়, আবার যুক্তির জাল যখন ছেয়ে ফেলে সব, হৃদয় নাকি তাতে চাপা পড়ে যায়— 'দশ লক্ষ বছর আগে' নামের আখ্যানটি পড়তে পড়তে ভাবছি হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছে যে কাহিনি, তার ভিতরে শ্যামলবাবুর দুই নবীন বিজ্ঞানী, স্বামী স্ত্রী, আলাপে বসে বলছে—"আমার মনে হয়— আমরা সায়ান্টিস্ট সেজে যা কিছু করছি তার অনেকটাই চলে যাবে— যাচ্ছে ব্যবসায়— মানুষের ভোগে— আরও রুটি মাংস খাব— আরও আরও— আরও বেশি ভোগ করব— এই বিলাসে— এই ডলারে। এর ভেতর বিজ্ঞান কোথায়? গবেষণা কোথায়? প্রাণের জিন এপাশ ওপাশ সেপাশ করে দিয়ে যা করতে চলেছি— তার অনেকটাই তো চলে যাচ্ছে-যাবে যুদ্ধের কাজে। কে বলতে পারে যাবে না?

(দশলক্ষ বছর আগে পৃঃ ৩০)

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমি শেষ থেকে স্মরণ করছি। তিনি যেভাবে ২০০০ সালে বসে ফিরে যেতে পারতেন দশলক্ষ বছর আগের অতিকায় ডায়নোসরের যুগে, সেই সূত্র ধরেই শ্যামলবাবুর শেষ ছোটগল্প 'সে' থেকে আমি না হয় পিছিয়ে গেলাম কুবেরের বিষয় আশয়, রাখাল কড়াই, চন্দনেশ্বরের মাচানতলার সময়ে যখন বাতাস ছিল আলোয় ভরা, আলোও ছিল আলোর মতন, মদন বদন নামের নিরন্ন দুই ভূমিহীন যুবক, একটি কুকুর, একটি হুলোবিড়াল, দুটি রাজহাঁস, একটি গাইগরু ও তার তাগড়াই বলদ বাছুর, গোটা আটেক পাতিহাঁস, কোম্পানি বাঁধের ভিতরে গর্তে বাস করা বিষধরদের নিয়ে খোলা মাঠের ভিতরে দালান কোঠা বানিয়ে দুটি বালিকা-কন্যা আর বউ নিয়ে সাপুড়ে মহম্মদ বাজিগর বা গো-বদ্যি বিরজা ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করে ঈশ্বরীতলায় বাস করা অনাথবন্ধু।

এই সময় থেকে সেই সময়ে ফেরা মানে শ্যামলবাবুর দশ লক্ষ বছর আগে নামের ক্ষুদ্র উপন্যাসটির চরিত্র, সেই জন্মসূত্রে আইরিশ কিন্তু বহুকাল আমেরিকাবাসী টিচবোর্ন পরিবারের জেনেটিক বিজ্ঞানী কন্যা এলসা

টিচবোর্নের সংহতি কলোনিতে গভীর রাতে দেখা কোটি কোটি বছর আগে নিশ্চিহ্ন ডায়নোসরের কাছে ফিরে যাওয়া যেন। কে কার উত্তরাধিকার বহন করছে, ডায়নোসর থেকে কে হয়ে গেছে পাখি, কে হয়ে গেছে বাঘডাঁশা নামের অতিক্ষুদ্র এক প্রাণী কিংবা পথের সেই কুকুর-জাল কণ্ঠি, চিনে নেওয়া কঠিন, কিন্তু শ্যামলবাবু সেই দুর্জ্ঞেয় পথের খোঁজেই যেন বেরিয়েছিলেন ওই ক্ষুদ্র আখ্যানে। প্রাণের বিবর্তনে সময়ের ভূমিকাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন বাংলা ভাষার এই লেখক। নতুন করে পড়তে পড়তে মনে পড়ে যাচ্ছিল অতি সম্প্রতি সুখ্যাত বিজ্ঞানী দীপঙ্কর হোম মহাশয়ের একটি বক্তৃতার কথা। একটি ঘরোয়া সভায় বিশ্বখ্যাত এই বিজ্ঞানী যে কথা বলেছিলেন, তারপর যে যে কথা উঠে এসেছিল লেখক শিল্পীদের কাছ থেকে, তার থেকেও যেন অনেক বেশি প্রশ্ন উঠে আসে 'দশ লক্ষ বছর আগে' পড়লে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণাগারটি জাপানের কোবে শহরে। চৌষট্টিজন বিজ্ঞানী মানে চৌষট্টিটি মেধাবী মানুষ। চৌষট্টিজন সমস্তদিন একটিও কথা বলে না, তাদের কোনো বিনোদন নেই, নিঃশব্দে গবেষণাগারে দিন কাটায়, নিঃশব্দে ফিরে এসে ঘুমিয়ে নেয়। শুধু আমেরিকার এলসা আর কলকাতার সংহতি কলোনির পরিতোষ কুণ্ডু নিজেরা কথা বলতে পারে। বলতে হয়। তাদের প্রেমের পর পরিণয় হয়েছে। কলকাতায় এসেছিল এলসা। মধ্যরাতে সংহতি কলোনির বাড়ির দোতলা থেকে পেছন দিকের ঝোপ জঙ্গল এবং শুকনো পড়ে থাকা পুকুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা এক অতিকায় প্রাণীকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়েছিল সে। সে নিজেই প্রাণের রহস্য উন্মোচনে ব্রতী, সে নিজেই দেখেছে কোটি কোটি বছর আগে নিশ্চিহ্ন প্রাণ ডায়নোসরকে শুকনো জলাশয়ের গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে। আসলে ওই গর্তে বাস করে একটি অদ্ভুত প্রাণী, উদবেড়াল নয়, বাঘরোল নয়, খটাশ নয়, কিছুটা কুকুর কিছুটা বিড়াল বা বাঘের মতো, যাকে কিনা পাশের বাড়ির পাগলা রাখাল মাস্টার বলে বাঘডাঁশা। এ এক এমন প্রাণী যা ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি থেকে, যেভাবে প্রায় মুছে গেছে বাঘরোল, বনবেড়াল এবং শিয়াল খটাশও। এলসা ওই বাঘডাশার গর্ত থেকেই বেরিয়ে আসতে দেখেছিল অতিকায় ডায়নোসরকে— এ কি মাইক্রো বায়োলজি, জিন-প্রযুক্তি জানা, প্রাণের রহস্য উদ্ধারে বিভোর, কৃত্রিম প্রাণ সৃজনে নিমগ্ন এলসা কুণ্ডু (টিচবোর্ন)-র শুধুই বিভ্রম? কল্পনা! নাকি অন্তরের সত্য দর্শন? সে তো জানে তার গবেষণা শেষ অবধি মানব কল্যাণে কতটা যাবে, কতটা যাবে যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে, ব্যবসা আর ডলার উৎপাদনে। পড়তে পড়তে কত মাত্রা যে উদ্ভাসিত হয়ে যায় নতুন আলোর মতো। আচমকা মনে হয় লেখক কি নিজেকে চিনে নিতে চেয়েছিলেন সৃষ্টির আদিরহস্য উন্মোচন করে। ভ্রূণের স্মৃতিতে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কী আশ্চর্য এই আখ্যান। জলধর কুণ্ডুর স্মৃতি আচমকা নষ্ট হয়ে যায়, মনের ভিতরে জেগে ওঠে বিচিত্র পাপবোধ। সেই জলধরকে তার পুত্রবধূ এলসা জাপান থেকে উড়ে এসে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায়, তার মরে যাওয়া ব্রেন সেল রিপ্লেস করবে তাজা ব্রেন সেল দিয়ে। তাজা ব্রেন সেল আসবে সদ্যসৃষ্ট ভ্রূণ থেকে। সেই ভ্রূণ দেবে এলসা নিজে। তার গর্ভে তখন এসে গেছে প্রাণ, যে প্রাণ বয়ে নিয়ে যাবে জলধর কুণ্ডুর বংশধারাকে। এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি তখন এক ঐশ্বর্যময় আখ্যানে পৌছে যায়। এই আখ্যানটিতে শ্যামলবাবু পৌঁছেছেন কুবের সাধুখার কদমপুর, মেদন মল্লর চর থেকে অনাথবন্ধুর ঈশ্বরীতলা থেকে, বিদ্যাধরীর মরা খাত থেকে কলকাতার উপকণ্ঠের সংহতি কলোনি হয়ে জাপানের কোবে শহরের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণাগারে—প্রাণ উৎপাদনের কারখানার হিমশীতল নৈঃশব্দে। ঈশ্বরীতলার রূপো কথা, কুবেরের বিষয় আশয় বা আর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস গঙ্গা একটি নদীর নাম-এ কুকুর, বিড়াল, পশু পাখির নানারকম উপস্থিতি। তাদের ভাষা বোঝে যেন অনাথ কিংবা হাজরা হালদার। পশুপাখি এমন কি গঙ্গার অতল তলে ভেসে আসা গাভীন ইলিশও স্বপ্নের ভিতরে মানুষের ভাষায় কথা বলে, প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীকীট পতঙ্গের সম্পর্কটি খাদ্য খাদকের। একে অন্যকে খেয়ে বেঁচে আছে, এই নির্মম সত্যটি উদঘাটন করতে করতে শ্যামলবাবু পৌঁছে যান সৃষ্টির রহস্য উদ্ধারে।

'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসে বজ্জাত নামের একটি হলো বেড়াল ছিল। সেই বেড়ালটি পাখির ছানা খেতে,পাখির ডিম চুরি করে খেতে উঠে যায় হরিতকি গাছটিতে, নিঃশব্দে। শ্যামলবাবুর বর্ণনায় :

“এই বজ্জাত নেমে আয়!

বজ্জাত তখন একটা উঁচু ডালের পাতার ঝুপসিতে ঢাকা পড়ে গেছে।

দশ গোনার সময়ও পেরোয়নি। ডালপালার ভেতর থেকে বজ্জাত ফ্যাঁস মত একটি আওয়াজ করল।

আহারে! চোখ বুজে ফেলল শান্তা। কোন পাখির প্রাণ গেল!

এবার অনেক জোরে। ডালপালার ভেতরে গা ঘষটানোর আওয়াজ। শান্তা দেখতে দেখতে একেবারে স্ট্যাচু হয়ে গেল। বজ্জাত ঘুরতে ঘুরতে ধপাস করে নীচে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে একপাল ঘনকালো মাছি নেমে এল। সাদা বজ্জাতকে মাছিরা ঢেকে কালো করে ফেলল। তারই ভেতর একবার বোধহয় একটু পাশ ফেরার চেষ্টা করল বজ্জাত।

(ঈশ্বরীতলার রূপোকথা)

ইলিশ আর গঙ্গা নিয়ে যে উপন্যাস “গঙ্গা একটি নদীর নাম” সেখানে আছে ‘সন্ন্যাসী কাঁকড়া’ আর শীতল পাটি মাছের কথা। তারা সব ওৎ পেতে থাকে ইলিশের ডিম খেয়ে নেওয়ার জন্য।

“গঙ্গার পেটের ভেতর যেখানটায় যেখানটায় মাটির থাক ভাগ হয়ে চাকমতো হয়ে আছে সেখানটায় গাভিন ইলিশের দল বুড়বুড়ি কেটে ডিম ছাড়ছে। ওরা জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে এসেছে। ভাটির টানে ভোর রাতে পেটখালি করে সাগরে ফিরে যাবে। পেট খালাসের সময় ইলিশের পেটে ব্যথা হয় নিশ্চয়। জলের নীচে অন্ধকারে রাস্তা চিনে চিনে আসা। অন্ধকারের নিজের একটা আলো আছে। সে আলো জেগে ওঠে ইলিশের চোখে মণিতে। ভারী পেট নিয়ে নড়াচড়া এক অস্বস্তি। সবাই তো সেখানে হাঁ করে আছে খাবার জন্যে। দূর থেকে বিটকেল সব মাছ আসে। কোনোটা আবার খানিক মাছ খানিক কিম্ভূত শরীর নিয়ে ওদের হাঁমুখে পড়ে যাওয়ার বিপদ সব সময়। আড়াল আবডালের জন্য ঝাঁক ধরে ইলিশেরা কখনো যায় হলদি নদীর মুখে নয়াচরের তলার দিকে। চরটা ওপর ওপর দেখনসই। ওপর দিকে ঠিকই আছে। কিন্তু ঘূর্ণি স্রোতে জলের নীচে নয়াচরের পায়ের দিকটা প্রায় ফোপরা। ওখানে পেট খালাস করে ডিম ছাড়া যায়। কিন্তু সন্ন্যাসী কাঁকড়াগুলো, শীতলপাটি মাছ ওৎ পেতে আছে।”

(গঙ্গা একটি নদীর নাম)

জন্ম মৃত্যু, বেঁচে থাকা সবই যেন একই সূত্রে গেঁথে গেছেন শ্যামলবাবু। ‘কুবেরের বিষয় আশয়’ থেকে ‘গঙ্গা একটি নদীর নাম’— সমস্ত গল্প ও উপন্যাসে। সময় কম নয়। পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে হয়ত এরই ভিতরে।

“গঙ্গা একটি নদীর নাম”-এ আছে এক ভয়ানক মৃত্যুর কথা। মাছমারা হাজরা হালদার ভুটভুটি, জাল সব ভাড়া করে গঙ্গায় ইলিশ ধরতে ভেসে যায়। সঙ্গে যে আছে, সেই মুকুন্দর এই প্রথম জলযাত্রা, তাও রোখে পড়ে। ভুটভুটিতে চাল ডাল নুন তেল কেরসিন আর বরফ, সঙ্গে কাঠের গুঁড়োতে ভরা বস্তা। ভাসতে ভাসতে বড় লালমোহন ভেটকি, পায়রাচাঁদা, বড় গাঙের সাপ, আড়ট্যাংরা ধরা পড়েছে। তারা আছে ভুটভুটি নৌকোর খোলে। তারপর এক সময় ধরা পড়ে ইলিশ। সেই ইলিশ ধরার বর্ণনা বড় ভয়ঙ্কর। ইলিশের নীচে চাপা পড়ে যায় ভেটকি পায়রাচাঁদা। কাঁচা ইলিশের চাপে বরফ গলে যায়। জল থেকে ছিটকে ইলিশ পড়েছে ইঞ্জিনে। যন্ত্রপাতি সব চাপা পড়ে গেছে ইলিশে। এক একটা ইলিশ এক একটা বড় নোট। পচন ধরল ইলিশে। ভুটভুটি বিকল। সমুদ্রে ভাসছে তা। সঙ্গী মুকুন্দর উন্মাদ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তার ভয় সে আর ফিরতে পারবে কিনা। ইলিশগুলো নিয়ে ফিরতে পারলে সংসারের হাল ফিরত হাজরা হালদারের। পচা ইলিশ করে তুলল তাকে বিপন্ন। বড় গাঙকে পচা গলা ইলিশ ফিরিয়ে দিয়ে কোনো রকমে বেঁচে ফিরতে চায় সে। বেঁচে থাকা টিকে থাকা যে কত কঠিন কাজ তা শ্যামলবাবুকে পাঠ করলে ধরা যায়। কাঠের গুঁড়ো, বরফ, জাল, নৌকো নিয়ে ইলিশ ধরতে বেরিয়ে বরফ গলে যায়, মাছের দেখা মেলে না। আবার বরফ যখন শেষ, তখন আসে রূপোলী ইলিশের ঝাঁক। কে কীভাবে টিকে যায়, টিকে থাকতে কাকে কতটা কী করতে হয় তার আশ্চর্য বিবরণ আছে এই উপন্যাসে। টিকে থাকা আর না টিকতে পারা এইই তো তাঁর অনুসন্ধান।

ফিরে যাই ঈশ্বরীতলার রূপোকথায়।

ঈশ্বরীতলা...তে পাতিহাঁসের ঘরে সাপ ঢুকে ফণা তোলে। দুটি হাঁস ভয়েই মারা যায়। নিরুপায় ভীতু প্রাণ। বাওড় থেকে নদীর আমলের পেল্লাই মহাশোল ধরতে ব্যাঙের গর্ত খুঁড়ে ব্যাঙ খুঁজে বেড়ায় মদন বদন। মহাশোল লোভে পড়ে ব্যাঙ খাবে। তারপর মহাশোলটিকে খাবে মানুষ। অনাথের চাষ করা ধান খেয়ে ফেলে মাংসল ঢেউ তোলা ক্রিমি-মাজরা পোকা। কী ধান হয়েছিল যে—লকলকে সবুজ, চওড়া পাতা তার। তখন গর্ভথোড়ে দুধ আসার কথা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে সব ফোঁপরা হয়ে গেছে কে বুঝবে? ক্রিমিরা সময় সময় সুযোগ মতো নেমে পড়েছিল কাজে। অনাথবন্ধু ধানের মোটা গোছের যেখানেই হাত দেয় সেখান থেকেই শ্বেত প্রজাপতির দল উড়ে যায়। এই প্রজাপতিদের যাদের বাঁ পাখনায় একটা করে কালোফুটকি- তারা মাদী, মাজরা পোকা- ঢেউতোলা ক্রিমির জননী। মাজরা পোকাও তাহলে ধানের থোড় খেয়ে শাদা প্রজাপতি হবে। ধান বাঁচল না। বাঁচল না বটে, কিন্তু ওই ঢেউতোলা ক্রিমি, যা থেকে জন্ম হবে প্রজাপতির তাদের মারতে বিষ ছড়ানো হবে ধানের গায়ে। এই মৃত্যু-কীট পতঙ্গ থেকে না-জানা প্রাণী মানুষের অভিজ্ঞতা এসে পৌঁছয় সংহতি কলোনির শুকনো পুকুর পাড়ের গর্তে বাস করা এক অদ্ভুত প্রাণীতে। কেউই টেকে না, বাঁচেনা, বালি ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অতিকায় ডায়নোসর, এরপরেও বেঁচে থাকে বাঘডাঁশা, লুকিয়ে থাকে এই ভূমণ্ডলে। তার ভিতরেই জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ার এলসা টিচবোর্ণ প্রত্যক্ষ করে ডায়নোসরের শেষ চিহ্নটিকে।

পৃথিবীটা খাদ্য-খাদকের, দখলদারির, দখলকারের, নারী পুরুষের। জমি মাটি এবং নারী দখল করতেই কুবেরের যাত্রা জীবনের এই পথে। জমি মাটি দেয় ফসল। ফসলের কামনা কি লুকিয়ে থাকে না দখলের প্রবল ইচ্ছার ভিতরে? আর নারী দখলের ভিতরেও তো লুকিয়ে থাকে যেন ওই একই সূত্র। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এইভাবে ভেবেছেন, জাগতিক পৃথিবীকে দেখেছেন। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসটি লোভের, দখলের এবং আশ্চর্য এক স্বপ্নপূরণের আকাঙক্ষার দীর্ঘ আখ্যান। আমাদের গল্প উপন্যাসে যে এক চতুর কাহিনী সবসময়ই বয়ন করা হয়, যার আরম্ভ থাকে, শেষ থাকে, ফলে পাঠকের তাকে অনুসরণ করতে অসুবিধে হয় না, দরকারে মুখে মুখে কাহিনীটি বলে নিলেও চলে, কুবেরের বিষয় আশয় উপন্যাসটিতে সেই কাহিনী বয়ন তো নেইই, বরং আছে জমি মাটি নারী প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে আত্মস্থ করার তীব্র প্রয়াস। জমি কেনাবেচা করতে করতে কুবের সাধুখাঁ জমি মাটির মায়ায় বশীভূত হয়। জমি কেনাবেচা করতে করতে তার হাতে টাকা আসে। টাকা নাড়াচাড়া করতে করতে কত কী! আবার জমি তো শুধু বেচা কেনা নয়, তা থেকে ফসল তোলা যায়। মেদন মল্লর চরে চাষবাসে টাকা ঢেলে বসে কুবের। তাকে ভদ্রেশ্বর স্বপ্ন দেখায় সে কালে কালে চকদার হয়ে উঠবে, কিয়ৎকালের মধ্যে তার মতো চাষী এই ভূমণ্ডলে আর কেউ থাকবে না।

কুবের সাধুখাঁর ভিতরে খাদক হয়ে ওঠার লোভ যেন জন্ম নিতে থাকে। কিন্তু তার এই জগতকে দেখা তো শুধুই দেখা নয়। তার দুচোখে ক্লান্তিহীন বিস্ময়। সেই বিস্ময় বোধই এই আখ্যানটিকে গভীর জীবনবোধের কাছে নিয়ে যায়। কুবের সাধুখাঁ সামান্য মানুষ, দু চার পয়সা আয় করাই তার কাছে ছিল সমস্যা। নিম্নমধ্যবিত্তের ভাঙাচোরা জীবন ছিল যার সম্বল, মনের ভিতরে এক পাপবোধকে নিরন্তর লালিত করে থাকে যে কুবের সাধুখাঁ, সেই অতি সাধারণ কুবের নিজভূমি ত্যাগ করে নেমে পড়ল জমি কেনাবেচার কারবারে। নিজের চারপাশের গণ্ডি মাড়িয়ে বাইরের বিপুলা পৃথিবীর ভিতরে নেমে এল যেন কুবের। জমি থেকে টাকা হয়। টাকা থেকে আরো জমি। নেশা আর লোভ বাড়ে। চাষবাসে নেমে পড়ল সে মেদনমল্লর চরে গিয়ে। চাষবাস ফসল থেকে সে চকদার, গাঁতিদার হয়ে উঠতে লাগল যেন, জমির পরিমাণ, দখল নিয়ে যে স্বত্ব, স্ট্যাটাস। দখল করল পরস্ত্রী। আর কী বাকি থাকে তার? প্রকৃতির মতো সীমাহীন হয়ে ওঠে যেন তার আকাঙ্ক্ষা। কদমপুরে নগর বসাতে চায়, মেদন মল্লর চরে বড় ফসল ফলিয়ে, চাষা খাটানো চকদার।

বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনের ঘেরাটোপ থেকে কুবের যেমন বেরিয়ে পড়েছিল মেদনমল্লর চরে, তেমনি বাংলা উপন্যাসও নতুন পথে যাত্রা করেছিল যেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে।

"কুবেরের বিষয় আশয়" উপন্যাসে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রকৃতি মগ্নতায় মুগ্ধ করেন। মেদনমল্লর চরে পড়ে থাকা ভাঙা দুর্গ, সরেস কুমারী মৃত্তিকা, চাষবাস, নদীনালা, নদী সরে যাওয়ায় জেগে ওঠা পয়স্তি জমি, চরভরাটি জমি, নদী ভরাটি জমি মিলিয়ে যে অনিঃশেষ প্রকৃতিকে লিখে ফেলেন, সেই প্রকৃতিতে এই তো মরতে মরতে টিকে আছে অদ্ভুত প্রাণী বাঘডাঁশাটি। তাকে যেন কুবেরের বিষয় আশয়-এর ভিতরেই অনুভব করা যায় অন্যভাবে। আমি বলতে চাইছি, 'দশলক্ষ বছর আগে' আখ্যানের বীজ যেন কুবের সাধুখাঁ, অনাথবন্ধু বসু (ঈশ্বরীতলার রূপোকথা) বা রাখাল কড়াই গল্পের ক্ষীরোদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে রাখা।

রাখাল কড়াই গল্পে কাঠের কারবারি ক্ষীরোদ চলে বিদ্যাধরীর বাদা মাড়িয়ে গরাণবেড়েতে গাছ কিনতে। সেই গাছ কত বড়, না চার মানুষেও তার বেড় পায়না। সে এক জঙ্গুলে, বুনো তেঁতুল গাছ যার বয়সের গাছপাথর নেই। তিনখানা বড় করাত ভাড়া করে ক্ষীরোদ সেই গাছ একদিন কেটে নেবে। ঠিক করেছে গরাণবেড়ের লোকজন লাগিয়ে তিনদিনে কুড়োলে কুড়োলে কেটে পুরো গাছটা খান কয়েক গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে চলে আসবে। যেতে যেতে ধানক্ষেতের ভিতরে বিদ্যাধরী নদীর কথা শোনে ক্ষীরোদ। তিনমাইল চওড়া নদী এখন ধানক্ষেত। ক্ষীরোদ পৌঁছয় গরাণ বেড়ে। ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়েই সেই বিপুল বৃক্ষকে প্রত্যক্ষ করে। এক একখানা ডালে শেয়ালদার আধখানা প্লাটফর্ম যেন জুড়ে যাবে। তো গাঁয়ের মানুষ সেই গাছ না দেওয়ার কত ছলই না করে। তেঁতুল গাছের শরিক বুড়ো বলে, তাদের খুড়ো মশায়ের বাপের লেজ ছিল। তিনি নাকি এগাছ থেকে ওগাছে লাফাতে পারতেন। পাকা বাড়ির মেঝেয় চড় মেরে দাওয়া ফাটিয়ে দিতেন। তিনি মরেননি। শেষ বয়সে নাকি একা একাই করাতি নদী পার হয়ে সুন্দরবনের দিকে হেঁটে চলে গেছেন-আর ফেরেননি। তা ঐ তেঁতুল গাছে তাঁর চিতার জন্য একটা ডাল রাখা আছে। তিনি মরলেই তো লাশ চিতায় দিতে হবে। তাঁর নাম পোড়ো গায়েন। তিনি যে তালডোঙায় চেপে চলে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের গভীরে, সেই তালডোঙায় চেপেই ফিরবেন। ফিরবেন বটে, কিন্তু নদী তো মরে গেছে। করাতি, বিদ্যাধরী শুকিয়ে কাঠ। আড়াইশো বছরের বুড়ো পোড়ো গায়েন তো আর হেঁটে ফিরতে পারবে না।

কিন্তু পোড়ো গায়েন ফিরবেই। তাকে ফেরাবে বলেই না তেঁতুল গাছে তার চিতার কাঠটি সংরক্ষিত রেখে তার নাতিপুতি বুড়োরা বসে আছে। পোড়ো গায়েনের ফেরা না ফেরা নিয়ে যখন কথা চলতে থাকে তখনই গাছের উপর থেকে নেমে এল কালো একটি সরীসৃপ, খড়িচোঁচ।

তেঁতুল গাছটিকে রেখে দেওয়ার জন্য, কাঠের কারবারি ক্ষীরোদ পাকড়াশিকে ফেরত পাঠানোর জন্য কোনো এক পোড়ো গায়েনের নাতিপুতিদের কতই না ছল। ছল করেই না পোড়ো গায়েনের কথাটা তৈরি করা। আবার তৈরিই বা কী করে বলি? এমন কিংবদন্তী তো অতবড় গাছকে ঘিরে গড়ে উঠতেই পারে। এ হয়ত গরাণবেড়ের মানুষের বিশ্বাস। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, হ্যাঁ-নার ভিতরের সমস্ত সীমারেখাকে তছনছ করে দিতে পারেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। পড়তে পড়তে মনে হয় তালডোঙায় করে সেই আড়াইশো বছর আগে সুন্দরবনের গভীরে ভেসে যাওয়া পোড়ো গায়েন কি আত্মগোপন করে নিজেকে রক্ষা করেছিল? যার লেজ ছিল, যে কিনা এ গাছ থেকে সে গাছে লাফাতে পারত। সেই পোড়ো গায়েনের লুকিয়ে পড়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় ছিল না বাঁচার। সংহতি কলোনির পুরনো পুকুরের গায়ের গর্তে যে বাঘডাঁশাটি নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই কি তাহলে পোড়ো গায়েন? প্রাণ তো এই ভাবেই থেকে যায় অন্য প্রাণের ভিতরে। এক একটা সময়ে পৃথিবীতে এক এক প্রাণের ঢেউ এসেছে, তা নিঃশেষও হয়েছে, ডায়নোসররা বিলুপ্ত হয়েছিল হয়ত বালির ঝড়ে-প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে না পেরে-কিন্তু তার ছায়া তো বাঘডাঁশার ভিতরে গভীর রাত্রিতে প্রত্যক্ষ করে এলসা টিচবোর্ন(কুণ্ডু)। পোড়ো গায়েনকে আমি যেন দেখতে পাই সেই বাঘডাঁশার ভিতরে। এলসা টিচবোর্নের দেখা সাহিত্যের সত্য, আমার অনুমানও সেই সত্যেরই আর এক রূপ।

"রাখাল কড়াই" গল্পের ক্ষীরোদ ভয় পেয়ে বাদার ধানক্ষেত ধরে পালিয়ে যাচ্ছিল গরাণবেড়ে থেকে! গরাণবেড়ের বুড়োদের কথা তার সত্য মনে হয়েছিল। ফেরার পথে সে দ্যাখে বিদ্যাধরীর মরা সোঁতায় জল আছে। মরা বিদ্যাধরীকে সে বেঁচে উঠতে দ্যাখে যেন। তা কি আর সত্যি হতে পারে? কিন্তু ভীত ক্ষীরোদ পাকড়াশির মনের ভিতরে তেমন এক সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়। পোড়ো গায়েন ফিরতে পারে এমন অসম্ভবের ইঙ্গিতে কাহিনি অনিঃশেষ হয়ে যায়। এই অনিঃশেষতা শ্যামলবাবুর গল্প, উপন্যাসে দিয়েছে বহুমাত্রা। "দশ লক্ষ বছর আগে" নামের ক্ষুদ্র আখ্যানটিতেও।

আমি আর একটি গল্পের কথা বলছি। "সে" নামের গল্পটি দু'হাজার সালে লেখেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কোনো লেখাই আগের লেখার মতো নয়। যে অনিঃশেষতা তার আশ্চর্য উপন্যাস— কুবেরের বিষয় আশয়, ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, চন্দনেশ্বর জংশন, স্বর্গের আগের স্টেশন বা রাখাল কড়াই, চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়, হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী, দখল, পরী ইত্যাদি গল্পগুলিকে কিংবদন্তীর মতো করে গড়ে তুলেছে আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতায়, সেই অনিঃশেষতাও শেষ কথা নয়। শ্যামল বাবু তাকেও ভেঙে দিতে পারেন। "সে" গল্পের বড় পিসেমশাইটির জন্ম ১৮৪৩-এ। তাঁর চোদ্দবছর বয়সে সিপাহী বিদ্রোহ। সেই মানুষটি ছিলেন প্রবল শক্তিমান। ওপার বাংলার বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী মোরেলগঞ্জ নিবাসী বড় পিসেমশাই এখনো কাহিনি কথকের পরিবারে কিংবদন্তীর মত বেঁচে আছেন। তাঁর বড়ছেলে মোহিনীদা এক রাতে পাড়ি দিতেন তিরিশ মাইলের উপর, স্রেফ পায়ে হেঁটে, কথকতা করে বেড়াতেন। বেঁচে থাকলে বড় পিসেমশাই-এর বয়স হতো ১৫৭ বছর। এখন তিনি কোথায়? এই গল্পের কাহিনিকথক, ধরা যাক তিনি শ্যামলবাবুই, ১৫৭ বছর বয়সী পিসেমশাইকে এই শহরে পেয়ে যেতে থাকেন। লোকটা তাঁকে বারবার যেন বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে থাকে। এর নাম কি যাদু বাস্তবতা? কল্পনার এই সীমাহীনতা তো শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় পাঠে বারবার প্রলুব্ধ করে। বারবার বিপদে কাহিনিকথকের পিছনে এসে দাঁড়ান যেন মোরেলগঞ্জের বড় পিসে, শ্যামলবাবু দেখতে পান মর্তমান কলার সাইজের পায়ের আঙুল, বুড়ো কাতলা মাছের আঁশের মতো নখ। এক এক সময়ে তার এক একরকম ছদ্মবেশ। বাসের ভিতরে ছাইরঙের ভেলভেট স্যু পায়ে ঢ্যাঙা একটি মানুষ, গায়ে তার স্পোর্টস গেঞ্জি, পরনে রিংকল-ফ্রি প্যান্টুলুন। মধ্যবয়সী যুবক, বছর ৪০-৪৫ হয়ত হতে পারে। তার কি ১৫৭ বছর হবে? শ্যামলবাবু ভাবতে থাকেন। হতে পারে হয়তো। বাইরেটা আগাগোড়াই ছদ্মবেশ কি হতে পারে না? তো সেই লোকই কন্ডাক্টরের হাত থেকে টিকিটের টাকা বাঁচিয়ে দেয়-কাহিনিকথক টিকিট কাটেন না বাসে, তার অফিসে ক্লোজার, পি.এফ, গ্রাচুইটি কোনো টাকাই তিনি পাননি—একদল লোক ভাল দল পাকাতে পারে বলে তাদের জন্য গত বিশ বছরে দফায় দফায় মাইনে বাড়িয়ে আট হাজার কোটি টাকার বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে সরকার–বেশির ভাগ মানুষ ঘাড় নিচু করে আছে, ট্রেনে লজেন্স ফেরি করছে, বর্ডারে নুন পাচার করতে গিয়ে বি.এস এর হাতে চাঁদমারি হয়ে যাচ্ছে— কেন কাটবেন তিনি টিকিট? দু-আনার টিকিট দু'টাকায়। বড় পিসে তার পিছনে পিছনে আছেন। মেট্রো রেলের দরজা চলন্ত অবস্থায় খুলে গেলে মৃত্যু যখন অবধারিত বড় পিসে তাকে বাঁচান। তখন তাঁর ছদ্মবেশ ছিল আগের কালের জমিদারের মতো, ধুতি, পাঞ্জাবি, টিকোলো নাকের নীচে ঢেউ তোলা গোফ। তারপর ক্লান্ত শ্যামলবাবুকে বউবাজারে পিচ্ছিল রাস্তায় উঠতে হয় এক রিকশায়। রিকশাওয়ালা তাঁকে যেন বাঁচাল। তার আর সন্দেহ থাকে না রিকশাওয়ালাই বড় পিসে। এই ফ্যান্টাসি চলতে থাকে। বড় পিসে খারাপ মেয়ের হাত থেকে বাঁচাতে লোডশেডিং করে দেন, শেষ অবধি আশ্চর্য কিংবদন্তী ভেঙেচুরে যায় যখন পথের কচুরি বেচা, ভুট্টা বেচা দরিদ্র স্ত্রীলোকদের বাঁচাতে তিনি থানায় যান। বড় পিসে সঙ্গে আছে ভয় কী? তিনি গিয়ে পড়েন যার হাতে টাইগার নামের সেই আসামী পেটানো ডাণ্ডাবাজ লোকটির মস্ত চেহারা দেখে, পায়ের নখ দেখে, আঙুল দেখে তিনিই যে বড় পিসে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকে না। সেই টাইগার তাকে প্রহার করতে আরম্ভ করে। যাবতীয় কল্পনা, বিভ্রম চূর্ণ হয়ে যেতে থাকে যখন বড় পিসের মত মানুষটি তাঁর উপর নির্দয় অত্যাচার আরম্ভ করে। রীতিমতো পুলিশি অত্যাচার নেমে আসে পুলিশের অনৈতিক এবং নিষ্ঠুর

আচরণের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায়। লেখক যে কল্পনা, বিভ্রমের মায়াবী আলোয় ঢেকে দিয়েছিলেন দেড়শো বছরের পুরনো বড় পিসেকে, তা নিজেই শেষ করে দেন। যাদুকর যাদু শেষ করে দাঁড়াল যে শূন্য মঞ্চে। নিরুপায় মানুষের কথা কত রকম ভাবে বলা যায়। এ-ও এক ধরণ। শ্যামলবাবুর নিজস্ব ধরণ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প, উপন্যাসে বাস্তবতা বিভ্রম, কল্পনা পাশাপাশি থেকে মিলে মিশে গেছে। কোনটা বাস্তব কোনটা মায়া তা যেন ধরাই যায় না। আবার কল্পনা, মায়া, বিভ্রমই মূল বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায়। এক নিরুপায় প্রাণকে নানাভাবে দেখে নেওয়ার প্রবণতা তাঁর সব লেখায়। তা "সে" নামের গল্পটিতে যেমন তেমনি শাহজাদা দারাশুকোর মতো ভারত ইতিহাসের সেই আশ্চর্য মানুষটির হৃদয় উন্মোচনেও। আবার শ্যামলবাবুর নিরুপায় প্রাণ যে শুধু মানুষ তাই বা বলি কী করে? বাঘডাঁশাটি কি নিরুপায় নয়? সে অন্ধকার হলে গোপনে বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে। "সে" গল্পের কথা তো বললামই। ওই নিরুপায় মানুষটি তো বেঁচে থাকার নানা কৌশল খুঁজে বের করতে করতে বাঁচে। শেষ পর্যন্ত বাঁচতে কী আর পারে? রাখাল কড়াই-এর পোড়ো গায়েনের নাতিপুতিরা বুড়ো তেঁতুলগাছ নিয়ে বাঁচে। হাজরা নস্কর গরুর সঙ্গে খাবার ভাগ করে বাঁচে। পচা ইলিশ ফেলে দিতে দিতে গাঙের ভিতরে কোনো রকমে বেঁচে থাকতে চায় হাজরা হালদার। আবার বাঁচতে পারেনাও কেউ কেউ। ঈশ্বরীতলার হুলোবেড়াল, পাতিহাঁস, গাঙের ইলিশ। আর বালির ঝড়ে দশ লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হওয়া অতিকায় ডায়নোসর। কিন্তু সেই অতিকায় প্রাণী আবার তার জীবন কণিকা রেখে যায় আর এক প্রাণে, তা বহন করে যায় নানা প্রাণী, বাঘডাঁশাও বহন করে উত্তরাধিকার সূত্রেই হয়ত।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে অনেকভাবে দেখা যায়। আমি এই মুহূর্তে তাঁকে এই ভাবে দেখছি। নিরুপায় জীবন, নিষ্ঠুর জীবন, ব্যাপ্ত জীবনকে প্রকৃতির ভিতর থেকে তুলে নিয়ে আসতেন তিনি। মনে পড়ে যাচ্ছে "সে" গল্পের বড় পিসের ছেলে মোহিনী দাদাকে, যে কিনা একা খুলনা পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি হেঁটে চলে যেত নামগান করতে করতে। সে ছিল কথক ঠাকুর। দেশভাগের পর এপারে এসে ঘুমতে না পেরে গরুর দড়ি ধরে যাত্রা করেছিল পূর্ব বাংলার পথে। তারপর খরাদীর্ণ পুকুরপাড়ে গরুর সঙ্গে মরেছিল সেই কথক ঠাকুর। মনে পড়ে যাচ্ছে "সাক্ষী ডুমুর গাছ" নামের সেই তিক্ত জীবনের গল্পটিকে। শ্যামলবাবুর শিকড় ছিল মাটির অনেক গভীরে, মাথা ছিল আকাশে। ঠিক যেন সেই পুরনো তলগাছটির মতো। বিষয় আশয় তাঁর কম ছিল না। কুবের সাধুখাঁ তো তিনি নিজে। এই বিষয় আশয়ের স্বাদ আমাদের সাহিত্যে নতুন না হলেও, দেখাটা সম্পূর্ণ নতুন, দেখার ভঙ্গিও। এই নতুনত্বের সজীবতাই তার লেখা আলাদা করে দিয়েছিল সকলের থেকে, তা গল্প হোক, উপন্যাস হোক, বাজার সফরের মতো কেনাবেচার কথা হোক।

যে লেখক তার সমস্ত জীবন ধরে নিরুপায় প্রাণের কথা বলে গেছেন, তাঁর শেষ বছরটি বড় নিরুপায় হয়ে কেটেছিল। যেন বড় গাঙ-সমুদ্রে বিকল হয়ে ভাসা ভুটভুটিতে পচা ইলিশ নিয়ে হাজরা হালদার।

আচমকা আমার মনে হয় সেই পুরনো তেঁতুলগাছটিকে যেন বাণ মেরে দিয়েছিল প্রতিবেশী। পোড়ো গায়েনের নাতিপুতিদের কোনো শরিক। হতেই পারে, এমন বিশ্বাস নিয়েই তো পোড়ো গায়েনেরা বেঁচে থাকে। তাদের অগোচরে গাছটির গোড়ায় কেউ হয়ত ঢেলে দিয়েছিল বিষতেল। শেকড় শুকিয়ে গেল। শ্যামলবাবুকে দেখে তেমন মনে হতো। মানুষ বড় নিরুপায়। মানুষ সর্দি কাশির ঠিক ওষুধটা খুঁজে বের করতে পারেনি আর কিনা ক্লোনিং করে নতুন মানুষ তৈরি করতে যাচ্ছে। মানুষ বড় অসহায় তা যেমন শ্যামলবাবুর যে কোনো লেখা পড়লে টের পাওয়া যায়, তেমনি অনুভব করেছি ২০০০ সালের অক্টোবর থেকে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমার দূর নক্ষত্রের মানুষ বলে মনে হয়। মনে হয় সিন্ধু সভ্যতার কেউ। পুরুষপুর, গান্ধারে বসে তিনি যেন নির্মাণ করেছিলেন সভ্যতার এক মহৎ পর্ব। তাঁর লেখার ভিতরে যে আদিমতা তাতে যেন ছায়ায় ঢেকে যাওয়া সেই পৃথিবীর মানুষ বলেই মনে হয় আমার। এ শুধুই মনে হওয়া। শুধুই কল্পনা করা। আর কিছুই নয় হয়ত। কিন্তু এও সত্য, তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলি সময় থেকে

সময়ান্তরে হেঁটে বেড়ায়। প্রগাঢ় ইতিহাসবোধ, ঐতিহ্যচেতনা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। "গঙ্গা একটি নদীর নাম" উপন্যাসে চাঁদ হোসিয়ারির মালিক চাঁদ মহম্মদের ছেলে তাজ মহম্মদ রূপনারায়ণের কূলে বসেই যেন জেগে ওঠে পাঁচশো বছর আগের পৃথিবীতে, তার সঙ্গে দেখা হয় মনসামঙ্গল কাব্যের লেখক কবি বিপ্রদাস পিপলাই, ওলন্দাজ সার্ভেয়র ফান ডেন ব্রেক, পর্তুগীজ সার্ভেয়র জ্যাও দ্য বারোজ-এর সঙ্গে। কেউই কোনো সময়ে থেমে নেই। বিপ্রদাস মনসামঙ্গল লেখেন ১৪৯৫-এ, তখন নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিতের বয়স মাত্র দশ। ফান ডেন ব্রেক এদেশে আসেন ১৬৩০-এ, আর জ্যাও দ্য বারোজ ১৫৫০-এ, সবাই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় কথা বলে তাজ মহম্মদের সঙ্গে। তারপর তিন সময়ের তিন মানুষ তর্কে বসে আদি সপ্তগ্রাম, সরস্বতী নদীর প্রবাহ, ফাহিয়েনের বিবরণ-আমাদের নদ-নদীর ইতিহাস নিয়ে। সে এক আশ্চর্য লিখন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে তাহলে সিন্ধুতীরে হেঁটে যেতে দেখবে না কেন তাঁর এই মুগ্ধ পাঠক। তিনিই যেতে পারতেন একই সঙ্গে ১৪৯৫, ১৫৫০, ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার বছর আগের, তারও আগের পৃথিবীতে। গেছেনও সেই পথে হয়ত।

আগুন সব পোড়াতে পারে না

ছ'মাস হয়ে গেল। গত ৩রা জানুয়ারি অপরাহ্ন বেলায়, সূর্যাস্তের সময়, সূর্যাস্তের শীতার্ত পথে হাসপাতালের হিমঘরে যখন দিব্যেন্দুদাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমি মনে করতে চাইছি তাঁর সেই গল্পের কথা। মা আছেন বৃদ্ধাশ্রমে। মায়ের সন্তানরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে। সকলেই কৃতী। কী বেদনায় আবিষ্ট করেছিল সেই গল্প। এখনো ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। আমাদেরও বয়স হচ্ছে যে। মনে করতেই পারলাম না নামটি। হিমঘরে ঢুকে গেলেন তিনি, নামটি বলে গেলেন, 'মুখগুলি'। কত মানুষের মুখ তাঁর লেখায়। নিঃশব্দে চেয়ে আছে সকলে। মূকাভিনয়ের চরিত্ররা যেন।

ভাগলপুরের সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত যুবক ১৬ বছর বয়সে ছন্দপতন নামে একটি গল্প পাঠিয়েছিলেন কলকাতার প্রধান সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়র জন্য। সেই গল্প ছাপা হয়েছিল। ভাগলপুর বহু কৃতি ও শ্রেষ্ঠ মানুষের জন্ম দিয়েছে একসময়। উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর এবং দ্বারভাঙা ছিল কৃতি বাঙালির উপনিবেশ। তপন সিংহ, সুমিত্রা দেবী, ছায়া দেবী, কিশোরকুমারদের বিখ্যাত গাঙ্গুলি পরিবার ভাগল-পুরের। বনফুল বাস করতেন ভাগলপুরে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরেই গঙ্গাতীরে বড়বাসায় একটি বাড়িতে থাকতেন। তখন তিনি কলকাতার খেলাৎ ঘোষদের জমিদারির নায়েব। জমি বন্দোবস্ত দিতেই তাঁর ওখানে থাকা। শুনেছি পথের পাঁচালী লেখা হয়েছিল ভাগলপুরে বসেই। বড়বাসা। শরৎচন্দ্রের মামা বাড়ি ভাগলপুরে। শ্রীকান্ত উপন্যাস আরম্ভ হয় ভাগলপুরের গঙ্গায়। গঙ্গার উত্তাল স্রোতে ইন্দ্রনাথ বটের ঝুরি ধরে নেমে যাচ্ছিল। বিচিত্রা পত্রিকার উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল ভাগলপুরেই। দ্বারভাঙায় থাকতেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। পূর্ণিয়ায় সতীনাথ ভাদুড়ী। দিব্যেন্দু পালিত সাহিত্যের সেই পরিমণ্ডল থেকেই কলকাতায় এসেছিলেন লিখবেন বলে। অনিশ্চিত যাত্রা বলতে পারি। লেখক হতে এসে কতজন পারে সিদ্ধিতে পৌঁছতে? লেখক তো কেউ একদিনে হয় না। সমস্ত জীবন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। দিব্যেন্দুদা পেরেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে আলো আর ছায়া রেখে গেছেন তা থাকবে। নিশ্চিত থাকবে। নগর মননের এমন লেখক আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। তিনি নৈঃশব্দের কথাকার। গল্প বলি উপন্যাস বলি, নৈঃশব্দই যেন তার প্রধান উপাদান। কী আশ্চর্য পরিমিতি বোধ ছিল তাঁর। সেই সব কথা বলব। বলি সেই যুবকের কলকাতায় আসার কথা। পড়বেন। লিখবেন। কলকাতায় এলে হয়তো লেখার সুবিধে হবে। বাবা মারা গেছেন। দাদা একা চাকুরে। সমস্ত সংসারের ভার তাঁর উপর। তাঁরও একটি জীবিকার দরকার। দিব্যেন্দুদার কাছেই সব শোনা। শোনা সেই কঠিন দিনগুলির কথা। নিরাশ্রয় হয়ে কিছুদিন শিয়ালদা স্টেশনেও তাঁকে থাকতে হয়েছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি, শিয়ালদা স্টেশনে উদ্বাস্তুদের ভিড়। শিয়ালদা নর্থের টিকিট কাউন্টারের সামনে একটা খুব মোটা পুরু বেঞ্চি পাতা থাকত। সেইটাই ছিল আমার রাত্রে শোয়ার জায়গা। সেখানে রাতে শুতেন, কিন্তু খেতে পেতেন না। একদিন খাবার জোটেনি। খিদের জ্বালায় হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছিলেন দেখে এক উদ্বাস্তু বৃদ্ধা তাঁর কাছে এসে শালপাতায় তিনটে রুটি আর তরকারি দিয়ে বলেছিলেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে ভদ্রলোকের ছেলে। খাওয়া হয়নি। তুমি এটা খাও বাবা।' সেদিন তিনি সেই যুবককে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এসব কথা আমি ভাবছিলাম মেঘমল্লারের নিচে শায়িত দিব্যেন্দু পালিতের সমুখে বসে। অনাহার, অন্ধ হয়ে যেতে যেতে বুদ্ধদেব বসুর স্নেহে চোখের আলো ফিরে পাওয়া, সবই ঘটেছিল সেই নিঃশব্দ যুদ্ধের দিনগুলিতে। এসব আমি শুনেছি তাঁর মুখে। তাঁর জীবন গেছে নির্মম সত্যকে স্পর্শ করতে করতে। তিনি আদ্যন্ত নাগরিক মননের লেখক। আর তিনি মধ্যবিত্তকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন এমন এক আয়নার সামনে যে আয়নায় সে তার অন্তরাত্মা দেখে মুখ নিচু করে থাকে। তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু নয়। নিম্নস্বরে কথা বলা তার গল্প থেকে শেখা যায়। যিনি দেখেছেন অনেক তাঁকে উঁচু গলায় কথা বলতে

হয় না। অনুচ্চ কণ্ঠস্বর যে কত তীব্র হতে পারে, মিতভাষণ যে কত কঠিন সত্যকে উচ্চারণ করতে পারে, তা দিব্যেন্দু পালিতের গল্প আর উপন্যাস পড়লে শেখা যায়। নগর সভ্যতা মানুষের মনের যে জটিলতা যে অসহায়তা যে নিরূপায়তাকে ধারণ করে তা দিব্যেন্দু পালিতের গল্প আর উপন্যাসে রয়ে গেছে। সহযোদ্ধা, আমরা, অনুভব, ঘরবাড়ি, সোনালী জীবন, ঢেউ, বৃষ্টির ঘ্রাণের মতো উপন্যাস ও জেটল্যাগ, গাভাসকার, হিন্দু, জাতীয় পতাকা, ত্রাতা, মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ, মাড়িয়ে যাওয়া, ব্রাজিল, আলমের নিজের বাড়ি, মূকাভিনয়, মাইন নদীর জল, মুখগুলি, গাঢ় নিরুদ্দেশে-গল্পের পর গল্পের কথা মনে পড়ে। আপাদ মস্তক এক রুচিশীল স্নেহময় মানুষ, যত না লিখতেন, পড়তেন অনেক বেশি। সহযোদ্ধা উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। সেই যে ঘটনা ঘটেছিল সত্তর দশকের এক কালো সময়ে, একটি হত্যাকাণ্ড দেখে মানুষটি চুপ করে থাকতে পারল না, বিবেক তাকে সত্যভাষণে প্ররোচিত করল। পুলিশের জেরা, পুলিশি আতঙ্ক, তার নিজের উপর আস্থা নষ্ট করতে পারেনি, যা চোখে দেখেছে সে, তা অবিশ্বাস করবে কী করে? তার সাজানো জীবন নষ্ট হয়ে গেল। পুলিশ তাকে নিজের হেফাজতে নিল। হত্যাকাণ্ডে যে পুলিশই জড়িয়ে ছিল। সহযোদ্ধা উপন্যাসের একটি বাস্তবতা আমরা জানি। সাংবাদিক বিপ্লবী সরোজ দত্তের অন্তর্ধানেই লুকিয়ে ছিল সহযোদ্ধার সত্য, সেই ভয়ানক নিরুদ্দেশের কথা কীভাবে উপন্যাসে শিল্পিত ভাবে লিখে রাখা যায়, তা তিনিই দেখিয়েছিলেন। এমন উপন্যাস লিখে তিনি তাঁর দায় পালন করেছিলেন যেন। আর একটি উপন্যাসের কথাও মনে পড়ে, অন্তর্ধান। তপন সিংহ ছবি করেছিলেন। তারও এক বাস্তবতা ছিল এক কিশোরীর অপহরণ এবং তাকে খুঁজতে খুঁজতে তার বাবার অদ্ভুত মৃত্যু, ঘটমান বাস্তবতা এবং শিল্পের বাস্তবতাকে আমরা একসঙ্গে ছুঁয়ে থেকেছিলাম। নিশ্চুপ মৃদুভাষী মানুষ, কিন্তু ভিতরে যে কতটা আগুন ছিল, কোলাহল ছিল তা 'সহযোদ্ধা' পড়লে ধরা যায়। 'অন্তর্ধান' উপন্যাসে বোঝা যায়।

দিব্যেন্দুদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়র ঘরে। সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী। দুজনেই খুবই গম্ভীর মানুষ। আমাকে বললেন, পড়েছি লেখা, ভালো। এই পর্যন্ত। রমাপদ চৌধুরীর ঘরে যে আড্ডা হতো তা ছিল শুধুই সাহিত্যের। আমি চুপ করে অগ্রজ বড় লেখকদের কথা শুনতাম। অনুধাবন করতে চাইতাম তাঁদের কথা। কথা শুনতে শুনতে শেখা। দিব্যেন্দুদা আলব্যের কামু ও ফ্রানজ কাফকার কথা বলতেন। আউট সাইডার, প্লেগ, মেটামরফোসিসের কথা বললেন একদিন। তিনি অনুজপ্রতিম তরুণ লেখকদের বলতেন বিশ্ব সাহিত্য বদলে দিয়েছেন এই দুই লেখক, এঁদের পড়। পড়েছি তখন, খুব বেশি নয়, সামান্য, কিন্তু সামান্য পড়ে কথা বলার চেয়ে শোনাই ভালো। ১৯৮২-৮৩ হবে। তাঁর 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসটি বেরিয়েছে তখন। একটি আত্মহত্যার কাহিনি ছিল তা। বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল বধূটি। পড়ে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এরপর পড়ি 'ঢেউ'। তারপর 'সহযোদ্ধা'। সহযোদ্ধা আগেই লেখা, পরে পড়া। যা লিখেছেন এই কলকাতাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সে লেখা কখনোই নিরুপায় মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। নিরুপায় মানুষের কথা পাওয়া যায় তাঁর গল্পে, যে গল্পে নৈঃশব্দই প্রধান। মূকাভিনয় গল্পটির কথা মনে করি। মহারাষ্ট্রের গণেশ মানকড়ের একটি নাটকের দল আছে। তারা অভিনয় করে। কিন্তু তা মূকাভিনয়। প্রথম পুরুষে লেখা গল্প। কথক সেই মানকড়ের নাটকের দলে ছোট ছোট নাটক লেখে। মূকাভিনয় হয় সেই নাটকের। নাট্য অভিনয়ের পিছনে থাকে যে ধারাবিবরণ, তাও কথককে বলতে হয়। মানকড় ভালো বাংলা জানে না। কত আধুনিক এবং জটিল জীবন-ধর্মের কথা এই গল্প। কত নীরবতার গল্প। মূকাভিনয় এক প্রাচীন রোমান নাট্যশিল্প যা যে কোনো মানুষের কাছে অনায়াসে পৌঁছতে পারে। অভিনেতার অভিব্যক্তিই না বলা ভিতরের কথাকে যেন সমুখে নিয়ে আসে। মানকড়ের দল প্রচার নাটক করে গ্রামে গ্রামে গিয়ে। মূকাভিনয় করতে করতে তারা নিজেরাই যেন মূক হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রী নরেন্দ্র এবং রাধা, রাজেন্দ্র এবং পদ্মা...তাদের ভিতরেও যেন যোজন যোজন নীরবতা। এই গল্প শাসক এবং শাসিতের। কিংবা শোষক এবং শোষিতের। নীরবতা, মূক হয়ে থাকা মানুষের নীরব অভিব্যক্তি যে কত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে তা নিয়েই এই কাহিনি। পড়ার পর নীরবতাই যেন গ্রাস করে পাঠককে।

আমি সেই 'মুখগুলি'র কথা বলি। দিব্যেন্দুদার সব গল্পই যেন মুখগুলি। মূকাভিনেতাদের মুখ, কিশোরী মুন্নির মুখ (মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ), যার পা মাড়িয়ে দিয়েছিল অনিল, সেই শিশুটির মুখ(মাড়িয়ে যাওয়া)। মুখগুলি গল্পের মায়ের মুখ, মায়ের সন্তানদের মুখ। কোনো কোনো গল্প পাঠকের হৃদয়কে এমন ভাবে ছুঁয়ে যায় যে সে ভোলে না ভোলেনা কিছুতেই। আর দিব্যেন্দু পালিত যেন সময় থেকে সব সময়ই এগিয়ে ছিলেন কয়েক পা। মুখগুলি গল্প যখন বেরোয়, তখন ওল্ড এজ হোমের ধারণা তেমন স্বচ্ছ ছিল না আমাদের কাছে। সবে তা আসছে এই শহরে, শহরতলীতে। মা গেলেন ওল্ড এজ হোমে। বাবার মৃত্যুর পর মা তাঁর ছেলে মেয়েদের ভিতরে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন একটু একটু করে। ভাগ হয়ে কখনো বালিগঞ্জ, কখনো ভবানীপুর, কখনো বাগবাজার কখনো রিষড়ায় ঘুরে ঘুরে আশ্রয় পায়। কিন্তু তারপর ও মা হয়ে যাচ্ছিলেন ভার। মায়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছিল যে তা টের পেয়েছিল তাঁর পুত্র কন্যারা। তাই গোল টেবিলে বিচার হয়ে গিয়েছিল মা সুধা ওল্ড এজ হোমে যাবেন। সুধা কোনো অনুযোগ করেন নি। গভীর রাতে দিবাকরের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, সে মায়ের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি কুঁকড়ে শুয়ে আছে মা। মিলিত সিদ্ধান্তে মা সকাল হলে চলে যাবে। মা গিয়েছিল। মাকে সেখানে রেখে দিয়ে আসতে পেরে সবাই নিশ্চিন্ত। দিবাকর মাকে কিছু খাম পোস্ট কার্ড আর ড্রাইভারের কাছ থেকে চেয়ে তার সস্তার ডট পেনটি দিয়ে এসেছিল। সুধা চিঠি লিখবে। সুধার চিঠি আসে। সেই চিঠির কথা দিয়েই গল্প আরম্ভ। পরম কল্যাণীয় স্নেহের বাবা দিবাকর..., মা সকলের কুশল জানতে চেয়েছে, নাতি নাতনি, বৌমা। মা খবর দিয়েছে হোমের কৌশল্যাদি নামের একজন মারা গেছে। তাঁর ছেলে থাকে বিলেতে, মেয়ে বাচ্চা হবার জন্য হাসপাতালে। কেউ আসেনি। হোমের ওরাই তাকে কালো গাড়ি করে শ্মশানে নিয়ে গেছে। মা খবর দিয়েছে, রানি পরমেশ, মেয়ে জামাই, তাকে দেখতে এসেছিল। কমলালেবু আর আপেল এনেছিল। ছোট ছেলে ভাস্কর এসেছিল মাকে দেখতে। মায়ের ওল্ড এজ হোমে আর এক কন্যার চিঠি এসেছে। মা সেখানে বসেই বড়ছেলে দিবাকরকে অনুনয় করে, ছোটছেলে ভাস্করকে একটা ভাল চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার জন্য। মায়ের চিঠি পড়েই ধরা যায় মা ভাল আছে। হোমে সকলেই গিয়ে যোগাযোগ রাখছে মায়ের সঙ্গে আগের চেয়ে বেশিই। দিবাকর গিয়েছিল হোমে মাকে দেখতে। সারি সারি বেতের চেয়ারে বসে আছেন যাঁরা বেশিরভাগই বৃদ্ধা। বৃদ্ধও আছেন দু-একজনা। তাদের একজনকে মা বলে ভুল করেছিল দিবাকর। পরে ভুল ভাঙল। মায়ের ভিজিটর হয়ে সে বসেছিল ভিজিটরস্ রুমে। মায়ের সঙ্গে তার যে তেমন কোনো কথা ছিল না তা টের পেয়েছিল দিবাকর। মা বলেছিল, 'খুব ভাল আছি আমি, আমার জন্য ভাবিস নে।'

দিব্যেন্দু পালিতের এই গল্প ক্রমশ ডুবিয়ে নিতে থাকে আমাকে তাঁর মগ্নতায়। মায়ের সঙ্গে বেশি কথা বলতে পারে না দিবাকর। মায়ের অনেক জিজ্ঞাসা, হুঁ, হ্যাঁ করে উত্তর দিয়েই সে হোম ছেড়ে আসে। কদিন আগে কারা যেন মাকে কমলালেবু আপেল দিয়ে এসেছে। দিবাকর তাই কিছু নিয়ে যায় নি। মা একা আর কত খাবে। ফলগুলো পচবে। মায়ের চিঠি আবার আসে। এই চিঠিতেও হোমের আর একজনের মৃত্যু সংবাদ, গিরীনবাবু মারা গেছেন। ... মায়ের চিঠিতে আসলে সত্য যেমন থাকে, থাকেও না। তাঁর কাছে কেউ যায় না তেমন। দিব্যেন্দু পালিত আমাদের মুখের সামনে এক আয়না ধরেছেন। যে কথায় আরম্ভ করেছিলাম, তিনি হিমঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে গিয়েছিলেন, মুখগুলি। মনে রেখ কত মুখ। কত রকম মুখ। ফ্রেদেরিকো ফেলিনির একটি ছবি দেখেছিলাম চল্লিশ বছর আগে। অ্যামারকর্ড। কত মুখ দেখেছিলাম সেই ছবির এক এক দৃশ্যে। মনে আছে সেই মুখগুলি। মনে আছে নিঃসঙ্গ সুধা মায়ের কথা। মুখগুলি আমি ভুলতে পারিনি এখনো।দুপুরের খাবার পর মায়ের বুকে পেন হয়েছিল তারপর...। এই গল্পে যেন পুত্র দিবাকরও এক নিরূপায় মানুষ। মা নিরূপায় হয়েও সব কিছু মেনে নিয়েছে। ছেলেদের কথা ভেবেছে, পুত্র কন্যাদের নিষ্ঠুরতাকে আড়াল করেছে। আড়াল করে নিজের কল্পিত সুখ আহরণ করেছে। গল্পটি যতবার মনে করি আর্দ্র হয়ে পড়ি। গল্পের মুখগুলি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ভেসে ওঠে সারি সারি বেতের চেয়ার, অস্পষ্ট মুখগুলি তাকিয়ে আছে গেটের দিকে। গেট পেরিয়ে রাস্তা। ধুলো উড়লে মেঘ ঘনাত, সন্ধে হত তাড়াতাড়ি।

ওখান থেকে মায়ের মুখটি মুছে গেছে আজ। এই গল্প আমার স্মৃতি থেকে মুছবে না এক বিন্দুও। দিব্যেন্দুদা, লেখা আর বন্ধুতা নিয়ে আপনি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। লেখকের মৃত্যু হয় না। আমি এখন মুখগুলির পাতা খুলছি। খুলতে খুলতে আমার চোখ ভিজে যাচ্ছে। মুন্নির সঙ্গে সময় কাটাতে চাইছি। কী অপরূপ মুখ মুন্নির। মুখের ছবি তো শুধু মুখেই নয়। অভিব্যক্তিতে, জলের মতো সরল কথায়। আমি সেই অনিল যে মাড়িয়ে দিয়েছিল শিশুটির পা। অভিযুক্ত হয়েছিল শিশুটির উদ্ধত তর্জনীর সামনে। সেই মুখ সারাদিন তাড়িয়ে বেড়ায় অনিলকে। শেষে বাড়ি ফিরে নিজের সন্তানের পায়ের উপর জুতো তুলে দিয়ে তাকিয়ে দেখে তার মুখ।

গতবার মনে হয় শীত বেশিই পড়েছিল। হাড়ে কাঁপুনি দিয়েছিল যেন। তাই হয়তো চুল্লীর আগুনের দিকে অতি বিভ্রমে সারিবদ্ধ যাওয়া প্রিয় মানুষগুলির। দিব্যেন্দুদা, পিনাকী ঠাকুর, মৃণাল সেন, নীরেন্দ্রনাথ... পরপর সকলে চলে গেলেন। এখন ভয়ানক গ্রীষ্ম। চিতার আগুন যেন নেভেনি। মুখগুলি আর ফিরবে না, লকলক করে জ্বলছে। জ্বলুক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা থাকবে। আছে। আমরা পড়ছি। আগুন তা পোড়াতে পারে না।

প্রদোষে প্রাকৃতজন

[শিরোনামটি ঔপন্যাসিক শওকত আলির উপন্যাসের। তাঁর প্রয়াণ হয়েছে কিছু মাস আগে। এপারের লেখক, অনুজ প্রতিম আফসার আমেদের প্রয়াণকথা লিখতে গিয়ে তাঁর উপন্যাসের শিরোনামগ্রহণ বাংলাভাষার এই বড় লেখককে স্মরণ করা। প্রয়াত শওকত আলিকে আমার প্রণাম।]

আফসার এল আচমকা। আসার কথা তো ছিল না। তখন ভোরের আলো ফুটছে, না তখন বেলা শেষ হয়ে যাচ্ছে বলতে পারব না। প্রদোষকালে আলো মরে যায় অমন। প্রত্যুষের আলো অত বিষণ্ণ হয় না। আমি কোথায় ছিলাম বলতে পারব না। সেখানে আরো অনেকে ছিল। পরিচিত অপরিচিত। তাদের অনেকেই চেনে আফসার আমেদকে। আবার চেনেও না। আমি আফসারকে দেখে উল্লসিত। আমিই দেখতে পেলাম আফসার আমেদ আসছে। ফ্যাকাশে নীল একটা শার্ট আর পুরনো টেরিকটনের প্যান্ট। পায়ে রবারের জুতো। কাঁধে ব্যাগ নেই। এমন হতে পারে সে বাংলা একাডেমির উপরতলা থেকে নেমে আসছিল। আবার হতে পারে বাংলা একাডেমি যাওয়ার পথে আমাকে দেখে দাঁড়াল। আমি কি ওই প্রাঙ্গণের বট অশ্বত্থ কিংবা অনামি কোনো গাছের নিচে বসে ফোনে আফসারকে ডেকেছিলাম? আমার অভ্যাস ছিল তেমন। তখন আমার চাকুরিস্থল আলিপুর ছিল। দরকারে অদরকারে আড্ডা দিতে আফসারের কাছে চলে আসতাম। মোবাইল ফোন যখন নিইনি, নিচের রিসেপসন থেকে ইন্টারকমে ফোন করতাম, বাইরে আছি। সে নেমে আসত। তখন সে চারতলায় বসত। বাংলা বই রিভিউ ম্যাগাজিনের দায়িত্বে ছিল। পরে সে নেমে আসে নিচের তলায়। তখন গিয়েই বলতাম বাইরে আছি, তোমার টিফিন হয়ে গেছে? টিফিন করতে পারি আমরা। আফসারকে একদিন, সে অনেকদিন বাদে দেখেছিলাম হাঁটতে গিয়ে বেঁকে যাচ্ছে। এ কী! তোমার কী হয়েছে আফসার।

ডাক্তার দেখাচ্ছি অমরদা, কিছু টেস্ট করতে হবে।

কিন্তু এই আফসার সেই আফসার নয়। বেশ সুস্থ। সেই গত জুলাইয়ের মাঝামাঝি আমাদের শেষ দেখা। বেলভিউ নার্সিংহোমে আমি, নলিনী, সমীরণ দাস গেলাম। আর এসেছিল সন্দীপ নট্ট। নাসিমার সঙ্গে দেখা বেলভিউয়ে। মুখখানি ম্লান। সারাদিন বসে আছে। ওর ছেলে শতাব্দর সঙ্গে দেখা। ১৪০০ বঙ্গাব্দে তার জন্ম, শতাব্দ নাম সেই কারণে। আফসারকে দেখেছিলাম খুব শীর্ণ হয়ে গেছে। সেদিন সারাদিন ধরে ওর পেটে জমা তরল নিষ্কাশন করা হয়েছিল, শতাব্দ বলল। কিন্তু আমাদের দেখে চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। বেল ভিউয়ের খরচ কী করে চলবে? আমার সঙ্গে এক সন্ধ্যায় সমরেশ রায়ের কথা হয়েছিল। সমরেশদা বলেছিলেন, আফসার বেল ভিউ থেকেই ফোন করেছিল। বিপুল ব্যয় ভারের কথা সমরেশদা তুলতে আফসার বলেছিল, “বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে যে খুব।” খরচ সামলাতেই পিজিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তার শেষের কদিন কেটেছিল। পিজি হাসপাতালে বড় ডাক্তারের অধীনেই ছিল। কিন্তু শরীর জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, দিন ফুরিয়ে এসেছিল। বেঁচে থাকার প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে আফসার আমেদ, আমাদের যুগের বড় লেখক বিদায় নিয়েছে এই গ্রহ থেকে। এই গ্রহে কত ব্যবস্থা। প্যাকেজে কত ঝাঁ চকচকে চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা হয়। চিকিৎসা খরচের ব্যবস্থা ছিল না তার। বেঁচে থাকার ব্যবস্থা ছিল না ষাটে পা দেওয়া এই প্রতিভাবান লেখকের। সেই ব্যবস্থা বহুদিন ধরেই ছিল না। যেখানে চাকরি ছিল, সেখানে প্রবল অসম্মান ছিল। সেই অসম্মানের সাক্ষীও হয়েছি আমি এক-দুবার। তার চাকরি পাকা ছিল না। অবসরের পর কিছুই পায়নি। অভাব তার সঙ্গী। লিখতে এসেছিল। লিখতে লিখতে চলে গেছে। আরো লেখা ছিল, সেই কারণেই বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। সাহিত্য অকাদেমির কাছে আমার প্রস্তাব, পুরস্কৃত লেখকের চিকিৎসা-বীমা করে

দিন। সঙ্গীত নাট্য অকাদেমির এই ব্যবস্থা আছে। সাহিত্য অকাদেমির কেন থাকবে না? তাহলে আফসারের চিকিৎসার সামান্য জমা টাকা, অকাদেমি পুরস্কারে পাওয়া টাকা সব চলে যেত না।

যেখানে আরম্ভ করেছিলাম, সেখানে ফিরে যাই। সেই প্রদোষ কালে। দেখতে পেলাম আফসার আসছে। সেই আগের আফসার। কৃষ্ণকায় সেই মধ্যবয়সী। আমার অনুজ। বসল আমার কয়েক হাত দূরে। সেখানে অন্যরা ছিল। কিন্তু আফসার আমেদের আসা না আসায় তাদের কিছু যায় আসে না। বলল, অমরদা, আপনাকে দেখতে পেলাম।

কেমন আছ আফসার? কথার কথা। কেমন আছে সে মাটির নিচে। এসব কথা জিজ্ঞেস করার কোনো মানে হয় না। বলল, আছি, অমরদা আপনার মনে আছে সব?

কী মনে থাকবে?

আফসার চুপ করে থাকল, বলল, আপনার সেই বাড়ি!

তোমার সেই গল্প আত্মপক্ষ?

ম্লান মুখে হাসল। হ্যাঁ, ঘুরে এসেছি। সব বদলে গেছে। চিনতে কষ্ট হয়েছে।

আফসার একটি একটি গল্প লিখেছিল, 'আত্মপক্ষ'। তার কথা বলি। আমাদের সেই গল্পের কথা আফসার তুলল। আফসারের বাড়ি বাগনান শহর থেকে ভিতরে, বাইনান গ্রামে। কলকাতার কাছে কোনো আশ্রয় ছিল না। আর আমি তো জন্ম থেকেই ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা। আমরা কলকাতার কাছে সল্টলেক সংযুক্ত এলাকা, মহিষবাথান গ্রামে জমি কিনি একসঙ্গে। সামনে পিছনে, একই প্লট। আমি আগে বাড়ি করলাম। এবার আফসার আর আফসারের স্ত্রী নাসিমা গিয়ে উঠল আমার বাড়িতে। ওখানে থেকে নিজের বাড়ি করবে। কিন্তু সেখানে মসজিদের আজান শোনা যায় না। আত্মীয় স্বজন নেই কেউ। আর সেই ২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গাও ঘটে গিয়েছিল। নাসিমা বলল, বাগনানে ফিরে যাবে চেনা জায়গায়। আফসার চলে গেল। আমরা এক সঙ্গে থাকতে পারলাম না। আমিও নতুন বাড়ি প্রায় তৈরির মূল্যে বিক্রি করে দিলাম আফসার জমি বিক্রি করে দিতে। এরপর আফসার বারোমাস পত্রিকায় একটি গল্প লেখে আত্মপক্ষ। আমি পরের শারদীয়তে লিখি আফসারের গল্পের বিপরীতে একটি গল্প, হ্যাঁ বারোমাস পত্রিকাতেই। আফসারের গল্প অসম্ভব ভালো হয়েছিল। আত্মপক্ষ গল্পে বন্ধু অমরদার বাড়িতে পরিবার নিয়ে চলে আসে গল্প কথক। সেই মহিষবাথান, সংযুক্ত এলাকা। গল্প কথকের মনে হয়, তারা মুসলমান, হিন্দু এলাকায় বাড়ি করতে যাচ্ছে, ঠিক হবে কি? সহাবস্থানের ভিতরে যে প্রেম তাইই ছিল জমি কেনা সূত্র। অমরদার সঙ্গে সে জমি কিনেছে। ঠিক করেছে কি? বাগনানে আত্মীয়স্বজন সকলে থাকে, তাদের ছেড়ে একেবারে হিন্দু এলাকায় অমরদার নতুন করা বাড়িতে মুসলমান পরিবারটি থাকতে এসেছে। স্থানীয় মানুষ আসে, আলাপ করে, তারা সকলে হিন্দু। বউগুলিও হিন্দু। মুসলমান এখানে কেউ নেই। লেখক, কথকের বউ নাসিমা খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কি? হিন্দু বন্ধুর পরিবার রেখে গেছে কালী ঠাকুরের ছবি, ধুপ-ধুনো, দেবীর গলার মালা শুকিয়ে গেছে। নাসিমা ওই ছবি, ধুপ ধুনো মালা নিয়ে কী করবে? সে তো হিন্দুত্বে বিশ্বাস করে না। ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী। কালী ঠাকুরের ছবি তার ঘরে রাখবে কী করে? সেই ছবি অন্যঘরে খাটের তলায় রেখে দিল। তাতে অনুতাপ হলো স্বামীর। ওঁদের পুজোর দেবী, তাঁকে অনাদরে রাখা কি ঠিক? কিন্তু নাসিমা যে চায় না তার সমুখে কালী ঠাকুরের ছবি থাকুক। নাসিমা যে রাখতে চায় না। আফসারের মনে হয় অমরদা বিষয়টি বুঝবেন। কিছু মনে করবেন না। সমস্যা তার বউ নাসিমার। গভীর রাতে নাসিমাই স্বামীকে জাগিয়ে তোলে, তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আগে এমন হয়নি কখনো। ঘুমতে পারছে না সে। পরদিনও সে অস্থির। তার অস্থিরতা যায় না। চোখে অকারণে জল আসছে। নতুন জায়গা বলে হয়তো। কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছে না নাসিমা। ফজরের আজানে তার ঘুম ভাঙেনি, তাই মন খারাপ। অথচ তার দুই সন্তান কেমন মিশে যাচ্ছে প্রতিবেশি বাড়ির সমবয়সীদের সঙ্গে। নাসিমা অবশ্য সারাদিনে স্বাভাবিক হয়ে এল কিছুটা। তা দেখে নিশ্চিন্ত লেখক। কেন নাসিমার উদ্বেগ গেছে, সারাদিনে তার মনে হয়েছে গত সন্ধ্যায় যে সে কালী ঠাকুরকে খাটের তলায়

চালান করেছিল, তার জন্য পাপ হতে পারে। অন্যের ঠাকুর দেবতাকে অনাদর করেছে বলেই রাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন সে দেবীকে তার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে আনে। নিজে ঝেড়ে মুছে যথাস্থানে স্থাপন করে ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। আফসার সেই মহিষবাথান থেকেই আসছে। আমি বললাম, আফসার আমাদের উপর তোমার অভিমান আছে? আমরা সেভাবে তোমার পাশে দাঁড়াতে পারিনি। কীভাবে দাঁড়াব তাও বুঝতে পারিনি। আমাদের কারোরই সেই সঙ্গতি নেই যা নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াতে পারি।

আফসার বলল, সব ভুলে গেছি অমরদা।

আমি চুপ করে থাকলাম।

আফসার বলল, হেরে গেছি অমরদা।

আমি মাথা নিচু করলাম। পরাজয় আমাদের তা বুঝতে পারছি।

লেখাটুকু বাদ দিয়ে সারাজীবন শুধু হেরেই গেছি।

আসল জায়গায় জিতেছ আফসার।

যাতে না লিখতে পারি, তার ব্যবস্থা ছিল। কথাটা আফসার বলল, না আমার মনে হলো, তা আমি বলতে পারব না। আফসার বলেনি। সে ভুলে গেছে সব। কথাটা উড়ে এসেছে সন্ধ্যার নতুন অন্ধকার থেকে। আমার ভালোবাসার মানুষ, বহুদিনের সঙ্গী, প্রিয় লেখক বন্ধু হেরে গিয়েছে। অসুখ তাকে শেষ করে দিল। হ্যাঁ, প্রাকৃতজনের যাওয়া এমনই হয়। হায়!

***

‘সেই নিখোঁজ মানুষটা’ উপন্যাসের জন্য আফসার গত ডিসেম্বরে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলে। সাত মাসের ভিতরে প্রয়াণ। কোনো সুখ স্বস্তি ওর জীবনে ছিল না। যে সরকারী প্রতিষ্ঠানে ২৪/২৫ বছর চাকরি করেছে তারা পাকা করেনি চাকরি। উদ্দিষ্ট পোস্টে অনভিজ্ঞ মানুষকে নেওয়া হয়েছে ওকে নেওয়া হয়নি। অবসরের কোনো সুবিধা পায়নি। দেখেছি ওকে প্রাপ্য মর্যাদা দেননি ছোটখাট সাংস্কৃতিক আমলা। বাংলা একাডেমি তাকে বঙ্কিম পুরস্কার দিয়েছিল। আফসার নিজ যোগ্যতায় তা পেয়েছিল। অনিরাপদ জীবন ছিল ওর সঙ্গে। ছিল ভয়ানক উদ্বেগ আর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হীনতা। আমি কত কথা শুনেছি ওর মুখে। খুব মৃদুভাষী ছিল। ও ভুলে যেতে পারে, আমি তো ভুলিনি। আমাদের দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র একজন গুণী কথাশিল্পীকে রক্ষা করতে পারে না। তার পাশে দাঁড়ায় না।

আফসার আমেদ, সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত হাওড়া জেলার বাগনানবাসী এক যুবক বাঙালি মুসলমান সমাজের বিবাহের গান সংগ্রহ করে সুখ্যাত পরিচয় পত্রিকায় নিয়ে এসেছিলেন সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ১৯৭৮ সালে। সেই প্রবন্ধ পড়ে সম্পাদক অবাক। বিশ্বাসই হয় না, এই যুবক এমন গভীর ভাবে অনুধাবন করেছে বিয়ের গানের ভিতরের আনন্দ এবং অশ্রু। সেই লেখা থেকেই তরুণ লেখক আফসার আমেদ চোখে পড়েন লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী এবং দেবেশ রায়ের। নানা সাহিত্যপত্রে আফসারের আত্মপ্রকাশে এই দুই অগ্রজের স্নেহ জড়িয়ে আছে। আফসারের গল্প লেখা শুরু তখন। প্রথম প্রকাশিত গল্প জলস্রোতে জনস্রোতে। তারপর থেকে পরিচয়, কালান্তর, বারোমাস, প্রতিক্ষণ, সারস্বত ইত্যাদি সাহিত্য পত্রে নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখায় এল প্রায় অচেনা বাঙালি মুসলমানের অত্মকথাই যেন। কী অপূর্ব তাঁর দেখা। আফসার আমেদ বিশিষ্ট হয়েছিল তার অন্তর্দৃষ্টির জন্য। কালান্তর শারদীয়তে আফসার তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখে ১৯৮০ সালে, ঘরগেরস্তি। সাহিত্যের ভালো পাঠক ঘুরে তাকিয়েছিলেন এই নবীন লেখকের দিকে। এরপর প্রতিক্ষণ সাহিত্য পত্রে আফসার আমেদ যে উপন্যাস লেখে গত শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি, ‘আত্মপরিচয়’ নামের সেই উপন্যাসেই বিস্মিত করে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে। বাঙালি মুসলমান নারীর জীবন ছিল সেই অসামান্য আখ্যানে। ছিল বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় উন্মোচনের এক নিদর্শন। এক ভয়ানক হত্যাকান্ডে শুরু সেই উপন্যাস। অন্ধকার রাত্রি। ধনী গৃহস্তের পুত্রবধূ হত হয়েছে। তার গোর কাটতে বসে আছে গ্রামের সবচেয়ে গরিব মানুষটি। আমি এখনো ভুলতে পারিনি সেই অংশগুলি। গোর

কাটার মানুষটি হয়ে উঠেছিল প্রধান চরিত্র। আর মুসলমান নারীর অবস্থান ওই সমাজে যেমন তার অন্তর্ভেদী বিবরণ। আফসারের ওই উপন্যাস পড়ে মুসলমান কেন হিন্দু নারীর অসহায় অবস্থাও উপলব্ধ হয়। আফসার ওই ভাবে তার নিজস্ব গণ্ডীর বাইরে চলে যেতে পেরেছিল। তখন থেকে আফসার আমার পাঠ্য তালিকায়। এরপর আফসার ক্রমশ খ্যাতিমান হয়ে উঠতে থাকে। আলাপ হলো লাজুক একটি যুবকের সঙ্গে। সেই আলাপও বছর ৩৫। উদার মানবিকতা তার দর্শন। আর সমস্ত রকম ধর্মীয় কুসংস্কারের বিপক্ষে। আফসার আমাকে তার নিজের কথা বলত। সামান্য ছিল তাঁর জীবিকা। লেখার জন্য ত্যাগ করেছে। সাধনা করেছে। তাঁর লেখার পটভূমি বাগনান এবং তার আশপাশ। হ্যাঁ,আফসার আমেদ বাঙালি মুসলমান জীবনের বিশ্বস্ত চিত্রকর। হ্যাঁ, চিত্রময় তাঁর লেখা। ধানজ্যোৎস্না উপন্যাস পড়লে তা ধরা যায়। মনে হয় এক কবির লেখা উপন্যাস পড়ছি। যা কিছু সুন্দর, তার সঙ্গে কবিতার তুলনা করতে ভালবাসি আমরা। ধানজ্যোৎস্না উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে ছবি করেছিলেন মৃণাল সেন। ছবির নাম, আমার ভুবন। এরপর খণ্ড বিখণ্ড, কলকাতার বই বাঁধাই করেন যাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ে একটি উপন্যাস লেখেন আফসার। 'অন্তঃপুর' নামের উপন্যাসটি ছিল মুসলমান নারীর অন্তঃপুরের কথা। গত শতকের শেষদিকে আফসার আমেদের উপন্যাসে একটি বড় বাঁক আসে 'বিবির মিথ্যা তালাক তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিসসা' রচনার পর। মুসলমান বাঙালির জীবনে অনেক রকম রূপকথা, কিসসা, গুজব, কল্প-কাহিনি যা ছড়িয়ে ছিল পথের ধূলায় আফসার আমেদ যেন তা কুড়িয়ে আনতে থাকে। লেখকের এই অদ্ভুত যাত্রা ছিল বাংলা উপন্যাসের এক নতুন পথে। হ্যাঁ নিভৃতচারী লেখক সকলের অজান্তেই সেই কাজটি করে যেতে থাকে। আফসার আরম্ভ করে কিসসা সিরিজ রচনা। বিবির মিথ্যা তালাক...রচনার পর, কালো বোরখার বিবি কুসুমের গন্ধ ও চল্লিশজন লোক। তারপর আশ্চর্য বশীকরণ কিসসা, মেটিয়াবুরুজে কিসসা, একটি ঘোড়সওয়ার কিসসা, হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিসসা।এই উপন্যাসগুলিতে বাঙালি মুসলমান রমণীর সামাজিক অবস্থানের কথা আছে, আছে ধর্মীয় নিগড়ের কথা। তিন তালাক যে কত নিষ্ঠুর এক জীবন-চর্চা তা আফসারের লেখার ভিতরে নানা ভাবে এসেছে। প্রতিক্ষণ পত্রিকায় প্রকাশিত 'রক্তলজ্জা' নামের একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে, রক্তলজ্জা গল্পের 'হাসান'ও 'ফতিমা'কে ভুলিনি আমি। এই গল্প এক আশ্চর্য প্রেমের, যার সঙ্গে মিশে থাকে ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশ্বাসের পবিত্রতা এবং নিগড়ও। নারী পুরুষের সম্পর্কের। একটি সামাজিক সম্পর্ক রক্তের ভিতরে প্রবেশ করেছে, তাকে নানা ভাবে নানা কোণ থেকে দেখেছেন আফসার আমেদ। এই দেখা মানবিক। ধর্ম যেভাবে মানুষের জীবনে জড়িয়ে থাকে, তা লিখেছেন আফসার। সেখানে তাঁর দেখা সম্পূর্ণ আলাদা। মৌলিক। রক্তলজ্জা গল্পের ফতিমার স্বামী শাকিল। ফতিমা ভালোবাসে চাচাতো দেওর হাসানকে। হাসান দুবছর বিয়ে করেছে। তার বউ সেলিমা ভালো মেয়ে। কিন্তু সন্দেহ না করতে করতে সন্দেহের দিকে ধাবিত হয় তার মন। হাসানকে যখন জেরা করে সেলিমা, হাসান কোরান ছুঁয়ে বলে সে ফতিমার ঘরে যায়নি। এই কথা ফতিমা শুনতে পায়। তাদের তো একই ভিটেতে বসবাস। মিথ্যে বলল হাসান আল্লার কসম খেয়ে। হাসান কোরানের পবিত্রতার বিশ্বাসে আঘাত করেছে। ফতিমা যন্ত্রণায় দুমড়ে যায়। এ এক আশ্চর্য গল্প। ফতিমা মনে মনে হাসানকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। কেন না হাসান তার প্রেমকে স্বীকার করেনি, কোরান ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পেরেছে। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে আঙুল ছেঁচে রক্তাক্ত হয় ফতিমা। রক্তাক্ত হাতে কোরান পাঠে বসে ফতিমা। সে যে রক্তাক্ত তা ভুলেই যায়। রক্তাক্ত তর্জনী কোরানের পৃষ্ঠায় ডানদিক থেকে বাঁদিকে বর্ণমালার নিচে বুলোয় ফতিমা। আহা এমন প্রেম আর প্রত্যাখ্যানের গল্প লেখা হয় কম।

***

উপরের কথাগুলি আফসার শুনলই না। বলল, আমি যাই।

কোথায় যাবে ?

চুপ করে থাকল। দেখি পাশে কেউ নেই। আমার ঘুম ভাঙল। ভোরের মেঘলা করা আবছা আলো ফুটেছে তখন। আফসার আমেদ কিছু বলতে এসে ফিরে গেছে। আসলে মুখ ফুটে কোনোদিনই সে কিছু বলতে পারত না। এই ভোরেও না। সকালে প্রদোষের অন্ধকার নেমেছে। মেঘে ভরেছে আকাশ। এক ফোঁটা দু ফোঁটা জল...।

শতবর্ষের তর্পণ

মুক্তিযুদ্ধের আগে সীমান্তের ওপার ছিল আমার কাছে এক অলীক ভূখণ্ড। আমাদের ফেলে আসা গ্রাম, নদী আর আমাদের নেই, মায়ের কাছে এই কথা শুনে আমি তাঁর দুঃখ আর কান্নাকেই যেন ধারণ করেছিলাম উত্তরাধিকার সূত্রে। পূর্ব পাকিস্তান, আয়ুব খাঁ, ইয়াহিয়া খাঁ, ভারত পাকিস্তানের সেই ১৯৬৫-র যুদ্ধ, ব্ল্যাক আউট, প্যাটন ট্যাঙ্ক, মিগ বিমান, স্যাবার জেট এসব দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। পূর্ব বাংলার কোনো খোঁজ তেমন পেতাম না। ভিনদেশ ভিনদেশই হয়ে ছিল। শত শত যোজন দূর যেন, শুধু আমার মা রেডিও পাকিস্তান শুনতেন, তখন শোনা যেত মনে হয়। মা খবর দিতেন সাতক্ষীরেতে কী হলো, কপোতাক্ষ নদে কোথায় ব্রিজ হলো। এই সব সংবাদই ছিল তাঁর কাছে আশ্রয়। এই সব সংবাদ কবিতার সুষমায় ভরা থাকত তাঁর কাছে। মুক্তিযুদ্ধই আমাকে প্রথম জানাল বাঙালি যুদ্ধে নেমেছে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে। যাদের নিয়ে তারা আলাদা হয়েছিল, কিংবা হাড়ি ভিন্ন হয়েছিল, হাড়ি আলাদা করা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আর তার নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পর এক দেশনেতা, সব অর্থে বাঙালি, যিনি বলতে পেরেছিলেন, আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম। নেতাজির সেই ডাক, আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব তা যেন ভাষার যাদুতে অন্য রকমে আমাদের কাছে নিয়ে এলেন শেখ সায়েব। সেই যে ৭-ই মার্চের ডাক, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল', 'ভাইয়েরা আমার, সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'— মনে হয়েছিল শৌলমারীর সাধু নন, নেতাজি ফিরেছেন শেখ মুজিবর হয়ে। শৌলমারীর সাধুর কথা ওপারের মানুষ জানেন কি না বলতে পারি না। আমাদের বাল্যকালে সংবাদপত্রে শৌলমারীর এক সাধু নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছিল। প্রায়ই সংবাদপত্রের বিশেষ বৈকালিক সংস্করণ (টেলিগ্রাম) বেরত "নেতাজি ফিরে এলেন" এই শিরোনাম নিয়ে। সেই টেলিগ্রাম মুহূর্তে শেষ। গত শতকের ছয়-এর দশকের প্রথম ভাগে মানুষ বিশ্বাস করত নেতাজি ফিরে আসবেন এবং বাঙালির সমস্ত দুর্গতির অবসান ঘটাবেন। নেতাজি ফিরেছেন এবং তিনি কোনো এক শৌলমারীতে সাধুবেশে আছেন, সময়েই আত্মপ্রকাশ করবেন। 'শৌলমারীর সাধু কি নেতাজি' এই নামের একটি গ্রন্থ হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। পরে ধীরে ধীরে এই সংবাদের অবসান ঘটে। কিন্তু শেখ মুজিবরের ডাক শুনে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনে সদ্য যুবা এই অমরের মনে হয়েছিল, সুভাষ ঘরে ফিরেছেন। সময়ে ফিরেছেন। ওপারে বাঙালি দলিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, সুভাষ ঘরে ফিরেছেন। খবর আসছে সীমান্তের ওপার থেকে।

মুক্তিযুদ্ধের আঁচ আমরা পেলাম। সমস্ত পৃথিবী পেল। খবর পেলাম শেখ মুজিবের ডাকে বাঙালি যুদ্ধে নেমেছে। রক্ত দিচ্ছে বাঙালি। বাঙালিকে ১৯৪৭-এর পর থেকে মারছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। বাঙালি এবার রুখে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ। মুক্তিযুদ্ধের সময় চারপাশে অবাঙালি অধ্যুষিত কলকাতা শহরে বড় হয়ে ওঠা আমি নিজে জানলাম বুঝি সকলের আগে আমি বাঙালি। বাংলা ভাষা আমার ভাষা। এই ভাষা রক্ষার দাবীতেই পূর্ব পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। উদ্বাস্তু আসছে হাজারে হাজারে। তাদের জন্য সলটলেক বালির মাঠে শিবির করা হয়েছে। তখন ওই নগর গড়ে ওঠেনি। ভেড়ি বুঁজিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে ধূ ধূ বালির মাঠ। যাই হোক তখন অ্যালেন গিন্সবারগ কবিতা লিখছেন যশোর রোডের ধারে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তু পরিবার নিয়ে, জর্জ হ্যারিসন রবিশঙ্কর কনসার্ট করছেন বাংলাদেশের সমর্থনে। হুমড়ি খেয়ে আনন্দবাজার যুগান্তর বসুমতী, অমৃতবাজার পত্রিকা পড়ছি। বাংলাদেশ বাংলাদেশ...

My friend came to me

With sadness in his eyes
Told me that he wanted help
Before his country dies
Although I couldn't feel the pain
I knew I had to try
Now I'm asking all of you
Help us save some lives
Bangla Desh, Bangla Desh
Where so many people are dying fast
And it sure looks like a mess
I've never seen such distress
Now won't you lend your hand
Try to understand
Relieve the people of Bangladesh
Bangladesh, Bangladesh

আমি কি এই আর্ত বাঙালির কেউ নই? খবরের কাগজ আর রেডিও আমাকে বদলে দিতে লাগল। রেডিও কত মধুর তখন। আমি উনিশ পেরিয়ে কুড়ি, তখন একদিন একটি খবর বেরিয়েছিল, বরুণ সেনগুপ্ত সাতক্ষীরে গিয়ে ফিরে এসেছেন। সাতক্ষীরেতে যে আমাদের বাড়ি। তা অলীক ভূখণ্ড নয়। খুব কাছে। বসিরহাট পেরুলেই, ঘোজাডাঙা বর্ডার দিয়ে একটুখানি। সেখানে তাহলে যাওয়া যায়। সেই ভূখন্ড অলীক নয়। সীমান্ত দূরে ঠেলে দেয় এক এক ভূখণ্ডকে। যোজন যোজন দূর হয়ে যায় পাশের গ্রাম, পাশের গঞ্জ। তাইই ভাবতাম কত দূর সেই সাতক্ষীরে, কপোতাক্ষ আর মায়ের কাছে শোনা ময়মনসিংহ, যমুনা, টাঙ্গাইল, কালিহাতি, নেত্রকোণা, গারো পাহাড়। যোজন যোজন দূর। কোনোদিন তা আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হ্যাঁ, সত্যিই মনে হয়েছিল শেখ মুজিবই নিরুদ্দিষ্ট নেতাজি সুভাষ। তিনিই। না হলে এমন ডাক কে দেবেন? এমন অসাধ্য কে সাধন করবেন? আর আমার মনে হতে লাগল, শেখ মুজিব ডাক দিয়েছেন, আমাকে যেতে হবে যুদ্ধে। শেখ মুজিবকে ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি গ্রেপ্তার করে দূর পশ্চিমে করাচি নিয়ে যায়, কিন্তু তিনি যে ডাক দিয়ে গেছেন, তা সীমান্তের অলীক প্রাচীর ভেদ করে এপারে এসে পৌঁছেছে। মার্চ মাসের শেষ, পূর্ব পাকিস্তানের খাল বিলে আশ্রয় নেওয়া পরিযায়ী বুনো হাঁসের দল ফিরছে নিজ দেশে, সাইবেরিয়ার দিকে, তারা রাতের আকাশে উড়তে উড়তে খবর দিয়ে যাচ্ছিল, জয় বাংলা, বাংলার জয়..., বুনো হাঁসের ডাক শুনেছিলাম এক গভীর রাতে। পূর্ববাংলা থেকে, হাওর-বাওরের দেশ থেকে তারা খবর নিয়ে ফিরছিল, যুদ্ধ লেগেছে যুদ্ধ, মানুষের মুক্তির যুদ্ধ, শেখ মুজিবকে নিয়ে গেছে তারা অনেক দূরে, বন্দী করে রেখেছে এক গুহার ভিতর। তার নামে জেগেছে মানুষ, খালবিল নদীনালা গাছ-গাছালি নিয়ে মানুষজন।

শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি,
বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরকে নিয়ে গান বেঁধেছেন অংশুমান রায়, গেয়েছেনও তিনি। রেডিওতে সেই গান শুনে আমি শিহরিত। আমার ভিতরে মুক্তিযুদ্ধ প্রবেশ করছে। আমি ভারতীয়। কিন্তু বাঙালি। বাঙালির জাতিসত্ত্বা প্রোথিত হয়ে যাচ্ছে আমার ভিতর। শেখ মুজিবর রহমানকে পাকিস্তানিরা নিয়ে গেছে পশ্চিমে। আমি মনে

মনে নিজেই লক্ষ মুজিবরের একজন হয়ে উঠেছি। ঘুমের ঘোরে কী বলছি কে জানে, মা ডাকছেন, কী বলছিস? ...এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মনে পড়ে তখন আমার এই শহর কলকাতা উত্তাল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি, দুপুরে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে মিটিং। মিছিল। কলেজে কী অপূর্ব বক্তৃতা শুনলাম কবি, অধ্যাপক তরুণ সান্যালের। একটি ঘন্টা তিনি বলেছিলেন, নাকি তারও বেশি, শেখ মুজিবের জন্য যেমন ছিল উৎকণ্ঠা, তেমনি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সমর্থন। মুক্তিযুদ্ধ ছিল যেন শেষ যুদ্ধ। শেখ মুজিব ডাক দিয়েছেন, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। বছর কুড়ির আমি করব কী? ফুটছি শুধু ফুটছি। রেডিওতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবাদ পাঠ শুনছি। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে কথিকা শুনছি। তখন রেডিও আর সংবাদপত্রই ছিল জানার একমাত্র উপায়।

আমি কয়েকজনকে জোগাড় করে চাঁদা তুলতে বেরলাম পাড়ায়। অবাঙালিরা মুখ ফেরালেন কিছু কিছু, আবার দিলেন যে কেউ কেউ তাও মিথ্যে নয়। বাঙালিরা সবাই যে দিলেন তা নয়, অনেকে দিলেন, অনেকে দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, কী করব আমরা? আমরা কি মুক্তিযুদ্ধে যাব? অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন আমাদের। নীলু, কালু, লালু, বংশীদের নিয়ে চাঁদা তুলতে আসা নিরীহ ছেলেটিকে। নীলু, কালুদের বাড়ি বেলগাছিয়ার বস্তিতে। কারো বাবা কলমিস্ত্রি, কারো বাবা রাজ মিস্ত্রি। উদ্দীপ্ত নীলু বলল, হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধে যাব।

বাঙালির মহাযুদ্ধ ওপারে যে শুরু হয়েছে এই কথা বলতে লাগলাম পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর অংশুমান রায় তখন এপারের বাঙালিকে উদ্দীপ্ত করছেন। আমি বাঙালি আগে। আমাদের ফেলে আসা মাতৃভূমি আক্রান্ত। মাতৃভূমির কোনো খোঁজই রাখতাম না। কিন্তু এখন চিনলাম। চিনিয়েছেন শেখ মুজিবর। বঙ্গবন্ধু। যুদ্ধ চলছে। আমি চাঁদা তুলতে লাগলাম। হ্যাঁ, এও সত্য, আমার সহপাঠী বন্ধুরা, পাড়ার ভদ্রলোক পরিবারের বন্ধুরা কেউ তেমন এল না, যারা আমার সঙ্গী হলো, সেই সব গরিব বস্তিবাসীর সন্তান, নীলু, কালু, বংশী, লালু, পল্টুরা বলল, বলল, চলো আমরাও যাব যুদ্ধ করতে। কেউ কেউ বলল, পেটো বোমা বানিয়ে নিয়ে যাবে কি না। তারা ভেবেছিল পেটো বোমা দিয়ে খান সেনা মারবে। আমিও কি তা ভাবিনি? আমি নেতা, হ্যাঁ বললেই সোরা, গন্ধক, লোহাচুর ইত্যাদি মাল-মশলা তারা কিনে আনবে, বাড়িতে বসে সুতলি দড়ি দিয়ে বোমা বেঁধে সীমান্তে যাবে, দিয়ে আসবে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। না, তা হয় না। যদিও সেই ৭১-এর কলকাতায় পেটো বোমা প্রায় কুটির শিল্প। তবুও 'না' বললাম, আগের বছর বোমা বাঁধতে গিয়ে এই এলাকার দাপুটে মস্তান লখিয়া মারা গেছে বিস্ফোরণে। আবেগপ্রবণ আমি তো আসলে ভীতু, সেই ভয় থেকে বললাম, না, পেটো বোমা দিয়ে যুদ্ধ হয় না। বরং ফার্স্ট এইড নিয়ে যাই। এই পরামর্শ পাড়ার সঙ্গীত শিল্পী গোপালদা দিলেন। তিনি গুনগুন করছেন অংশুমান রায়ের গান। তিনি গলা ছেড়ে গাইছেন, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি...। তিনি গাইছেন, আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি...। গোপালদা যা বলছেন তাই হলো। সেই টাকায় প্রাথমিক শুশ্রূষার ওষুধ, ডেটল, বেঞ্জিন, তুলো, ব্যান্ডেজ, আর কী কী কেনা হলো। বনগাঁ লোকাল ধরে বনগাঁ চললাম। উদ্দেশ্য হরিদাসপুর সীমান্ত, সীমান্তের ওপার দিয়ে যশোর যেতে হয়, যশোরে আমার কাকিমার বাপের বাড়ি, ছোটবেলা থেকে তাই শুনে আসছি। আর মা বললেন, যশোরের আগে নাভারন বলে একটা জায়গা আছে, সেখান দিয়ে সাতক্ষীরে যাওয়া যায়। মা আরো বললেন, যশোরের কাছেই সাগরদাড়ি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ি..., সেই মহাযাত্রার আগের রাতে মা আমাকে এসব বললেন। আর বললেন, সাবধানে যাবি। মা আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন।

দমদম জংশন ষ্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলাম জনা ছয় যুবক। ট্রেন চলতে লাগল, পার হতে লাগল বারাসত, অশোকনগর, মসলন্দপুর, হাবড়া, গুমো, গাইঘাটা, ঠাকুরনগর... ট্রেন ভর্তি হয়ে যেতে লাগল। জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে উঠতে লাগল যুবক আর মধ্যবয়সীরা। তাঁদের গায়ে যেন ওপারে ফেলে আসা খাল বিল, জন্মভূমির কাদামাটির গন্ধ। সবাই যাচ্ছেন সীমান্তে। পাকিস্তান আর থাকবে না। বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে

এসেছেন একজন। বনগাঁ থেকে সেই পতাকা কাঁধে মিছিল চলল সীমান্ত পর্যন্ত। শেখ মুজিবের ডাকে আমরা চলেছি যেন যুদ্ধে। সীমান্তের চেকপোস্টে আটকেছে সীমান্ত প্রহরীরা। কিন্তু তারাই পথ দেখিয়ে দিল, কোন দিক দিয়ে 'জয় বাংলা'য় ঢুকতে হবে। বাংলাদেশের নাম তখন 'জয় বাংলা'। আমাদের এবার লুকিয়ে যাওয়া। কোন গ্রাম, খাল বিল পেরিয়ে সীমান্তের ওপারে এক মুক্তি শিবিরে পৌছলাম যখন বেলা দুপুর। জয় বাংলা ডাক দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মধ্যবয়সী একজন। তাঁকে আমার স্পষ্ট মনে আছে, লুঙ্গি আর গেঞ্জি, হাতে বন্দুক। শেখ মুজিবের ডাকে এসেছি। জয় বাংলা। যা দেওয়ার দিয়ে ফিরে এসেছিলাম কেন না শুনছিলাম পাক বাহিনী যশোরেরও এপারে ঝিনাইদহে এসে গেছে। এদিকে আসছে তারা। একটু মাটি নিয়ে ফিরেছিলাম। মাটি দেখে মা আর বাবার চোখে জল। কতকাল বাদে মনে পড়ল সেই ফেলে আসা গ্রাম আর নদীর কথা। বাড়ির সকলে জিজ্ঞেস করতে লাগল সীমান্তের ওপারের কথা। আমি যেন দেখে এসেছি বাড়ির পিছনের কাঁটাল গাছটি। আমি যেন দেখে এসেছি চুষির আম গাছটি। আমি যেন কথা কয়ে এসেছি, এজার শানা, মোজার শানার সঙ্গে। তাঁরা ছিলেন বাবার বন্ধু। সেই মাটিকে মা তাঁর বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি ধুরোল গ্রামের মাটি বলে লক্ষ্মীর পটের পাশে রেখে দিল।

কলকাতার যে অঞ্চলে বাস করি, আমাদের প্রতিবেশী পাহাড় প্রমাণ লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে এসে ১লা বৈশাখ এক সভা করলাম পার্কে। লোক ভেঙে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ পাঠ হলো। শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী তোলা হলো। কতবার যে আমরা জয় বাংলা বললাম। পিতৃপুরুষের মতো লেখক, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন মিনিট ৪৫ কিংবা এক ঘন্টা। আমরা বাঙালি। আমাদের ভাই, বন্ধু আত্মজ যুদ্ধে নেমেছে। মুক্তির জন্য এই যুদ্ধ। এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধও। মুজিবর আমাদের প্রাণের মানুষ। মুজিবরের ডাক আমরাও শুনেছি যে, কারণ আমাদের ভাষা বাংলা। আহা সেই পয়লা বৈশাখের কথা এখনো মনে পড়ে। বীরভূমের সন্তান, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বক্তৃতা লিখে রাখিনি, তখন রেকর্ড করার ব্যবস্থাও ছিল না। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বলেছিলান, ঋজু মানুষ, সটান দাঁড়িয়ে আছেন মঞ্চে। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি। মুগ্ধ হয়ে শুনছে সমস্ত পাড়া। না, তিনি দেখে যেতে পারেননি বাঙালির মুক্তি, বঙ্গবন্ধুর ফিরে আসা। ঐ বছরে ১৪-ই সেপ্টেম্বর প্রয়াত হন। তখনো যুদ্ধ চলছে, বাংলাদেশের খালে বিলে মাঠে প্রান্তরে, গাঙে, গাঙ পাড়ে যুদ্ধ চলছিল তখন। মানুষ মরছিল। মানুষ সীমান্ত পার হয়ে যশোর রোডের ধারে ঝুপড়ির বাসিন্দা হয়েছিল। সেই মানুষ নিয়েই তো গিন্সবার্গের কবিতা।

তারপর? যুদ্ধ চলল। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত পেরিয়ে শীতে মুক্ত হলো সে দেশ। নতুন দেশের জন্ম হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর যে ডাক দিয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল বাংলাদেশের মানুষ, মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযুদ্ধই জন্ম দিয়েছিল বাংলা নামের একটা দেশের। ভারত পাশে দাঁড়িয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সব মিলিয়ে বাঙালির নিজস্ব একটা দেশ হলো। অনেক পরাজয়ের পর বাঙালি জিতল সেই প্রথম। তার আগের ইতিহাস তো শুধু পিছু হটার। বঙ্গবন্ধুর ডাকে যে জয় তা এক নতুন দেশের জন্ম দিল। মহৎ মহৎ মহৎ। সেই জয় যা কি না এমন একটা দেশের জন্ম দিল যে দেশের রাষ্ট্র ভাষা বাংলা। সরকার চিঠি দেয় বাংলায়। মানুষ বাংলায় চিঠি লেখে প্রধানমন্ত্রীকে। সরকারি অফিসে গিয়ে বাংলায় কথা বলতে পারে সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক মানুষ। বাংলা জানলে কাজ হয়। সর্বত্র বাংলা বাংলা আর বাংলা। আর এই ভাষা, এই ভাষার গান, এই দেশের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস সব নিয়ে দেশটা বিপুল হয়ে উঠল ক্রমশ। আমাদের এই পারে এই অভ্যাস থেকে আমরা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলাম। এখন তো বাঙালির খাদ্যেই থাবা বসিয়েছে শাসকের খবরদারি। মছলিখোর অপবাদটি আমরা সহ্য করে মাছের ঝোলেই ভাত মাখি। একটা জাতি যা নিয়ে বিশিষ্ট হয়, তাকে সব সময় রক্ষা করা এই ভুবনায়নের দিনে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ভুবনায়নের কথা তো আজকের কথা, ১৯৫৫ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান গণ পরিষদে শেখ মুজিব এই কথা বলেছিলেন,

"স্যার (গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট), আপনি দেখবেন ওরা "পূর্ব বাংলা" নামের পরিবর্তে "পূর্ব পাকিস্তান" নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে; পাকিস্তানের পরিবর্তে আপনাদের বাংলা (বঙ্গ) ব্যবহার করতে হবে। "বাংলা" শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস,ঐতিহ্য আছে। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নেবে কিনা।"

তিনি আরম্ভেই বাংলার কথা বলেন। জাতির আত্মপরিচয়ের কথা বলেন। ৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারির পর এই ভাষণই যেন ১৬ বছর পরের বাংলা নামে দেশটির জন্মের সূচনা হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালি, বাঙলাভাষা, বাঙালির জাতিসত্বা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল তাঁর রক্তের অন্তর্গত। সেই স্বপ্ন নিয়েই বাংলাদেশের জন্ম। স্বপ্ন একদিনে পূরণ হয় না। ক্রমাগত পূরণ করে যেতে হয়। বাংলাদেশে তা হচ্ছে কি হচ্ছে না জানি না, কিন্তু নবান্ন, ঘরে ঘরে পিঠেপুলির উৎসব, এক মাস একুশের বইমেলা, ১লা ফাল্গুন রঙের উৎসব, ১লা বৈশাখ নববর্ষ উদযাপন বাংলা মায়ের ছবির পিছনে যেন আলোক বলয় সৃষ্টি করে যাচ্ছে অবিরত। লৌকিক যে জীবনকে বাঁচিয়ে তোলার কাজটি বাংলাদেশে হচ্ছে নানাভাবে তা নিয়েই বাঙালি আর পাঁচটি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা ছিল। একটা জাতি তার ভাষা আর সংস্কৃতিকে যেভাবে রক্ষা করছে নানা প্রতিকূলতার ভিতরে তা দেখে আমার মনে হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলছে। শেখ মুজিবর রহমান আছেন বাংলাদেশের হৃদয়ে। আলোয় বাতাসে। বাঙালি তার জাতি সত্বা নিয়ে বিকশিত হচ্ছে। একটা ফুল ফুটছে আর ফুটছে। পাখি ডানা মেলছে আর মেলছে। এই ফুটে ওঠা আর মেলে দেওয়ার শেষ নেই। জাতি হিসেবে আমি এই বাঙালির একজন, আমার দেশ অন্য দেশ হলেও আমি আমার আত্মপরিচয় খুঁজে পেয়েছি সেই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি থেকে। বঙ্গবন্ধুর কাছে তাই সব সময় প্রণত। মনে হয় নেতাজি সুভাষের অসমাপ্ত কাজ তিনিই সমাপ্ত করেছেন। আমাদের শহরে ১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এসেছিলেন। দিনটি ৬-ই ফেব্রুয়ারি। সদ্য পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত নিজ দেশে ফিরেছিলেন। দেশ তখন স্বাধীন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সেই সভা হয়েছিল। জমায়েত লক্ষ লক্ষ এদেশের মানুষ। সমস্ত কলকাতা আর শহরতলী মাঠে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কলকাতা সমস্বরে উচ্চারণ করেছিল, 'জয় বাংলা'। আমিও গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখতে পাইনি। কাতারে কাতারে মানুষ গেছে সেই মিটিং'এ। কী করে দেখব আমার স্বপ্নের নায়ককে। আবছা আবছা দেখছি সব। কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে নেতাজি ফিরে এসেছেন শেখ মুজিব হয়ে। লাউড স্পিকারে তাঁর বজ্রগর্ভ কন্ঠস্বর শুনেছিলাম। ১৯৭১-এর ৭-ই মার্চের কথা শুনেছি, তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা, বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয়া শেখ হাসিনার লেখা পড়েছি দেশ পত্রিকায়, এই সেদিন, গেল ১৭-ই মার্চ, পড়ে মনে হয়েছিল, তিনি যেন আমাদের গড়ের মাঠের কথাই লিখেছেন, যে মিটিং'এ গিয়ে আমি শীতের বেলার আবছা কুয়াশার ভিতরে বুঝি দেখেছিলাম মস্ত এক পাহাড় দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছেন, জয় বাংলা। 'আমার ভাইয়েরা' শিরোনামে মাননীয়া শেখ হাসিনার লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে আমিও যেন রেসকোর্স ময়দানে ছিলাম সেদিন...

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, শ্রদ্ধেয়া শেখ হাসিনা লিখছেন,

"রেসকোর্স ময়দান। সকাল থেকেই দলে দলে লোক ছুটছে ময়দানের দিকে। গ্রামবাংলা থেকে মানুষ রওনা দিয়েছে ঢাকার পথে। সকাল দশটা-এগারোটার মধ্যেই আমরা শুনতে পারলাম, ময়দানে লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। একটা মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, খুবই সাদাসিধে মঞ্চ। মাথার উপর কোনও চাঁদোয়া নাই, শুধু একটা খোলা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে মুখ করে মঞ্চটা তৈরি। পূর্ব দিকে রাস্তার পাশ থেকে একটা সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। মাঠ জুড়ে বাঁশ পুঁতে পুঁতে মাইকের হর্ন লাগানো হচ্ছে। যতই মানুষ বাড়ছে, ততই হর্ন লাগানো হচ্ছে। মাইক যারা লাগাচ্ছেন, তাঁরাও যেন হিমশিম খাচ্ছেন, কোনও কূলকিনারা পাচ্ছেন না। কত মানুষ হবে? মানুষ বাড়ছে আর তারা তার টানিয়ে যাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভলান্টিয়াররা

খুবই তৎপর। মানুষের মাঝে প্রচণ্ড এক আকাঙ্ক্ষা, শোনার অপেক্ষা, কি কথা শুনাবেন নেতা। যারা আসছেন, তাঁদের হাতে বাঁশের লাঠি, নৌকার বৈঠা ও লগি। তাঁদের মুখে-চোখে একই আকাঙ্ক্ষা— স্বাধীনতা। দীর্ঘ তেইশ বছরের শোষণ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এ মানুষগুলির মুখে-চোখে। এ ময়দানে শরিক হয়েছে সর্বস্তরের মানুষ— নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-শিক্ষক, কিষান-কিষাণী, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, রিকশা ওয়ালা, নৌকার মাঝি, শ্রমিক— কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ ঘরে নেই। ঢাকা শহরে এত মানুষ কোথা থেকে এলো? এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য, বিস্ময়কর চিত্র।"

এ যে আমাদের ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের কথা। সকাল থেকে ট্রেনে বাসে মানুষ আসছিল, এসেই যাচ্ছিল। গান গাইছিল,

শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে ওঠে রণি,
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।

সংবাদ পাঠক বিভূতি দাস আবেগদীপ্ত গলায় কী অপূর্ব ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন রেডিওতে। পরে তা বাজানো হয়েছিল কয়েকদিন। আমি শুনেছি বাড়িতে বসে।

"আমি বিভূতি দাস ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বলছি। বিরাট এই প্রান্তর, যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ আর মানুষ...।" মিটিং'এ মঞ্চে ভাষণ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

কত মানুষ আর কত মানুষ! সেই মানুষের ভিতর আমিও ছিলাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান তাঁর অসামান্য বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, "স্বাধীনতা পেয়েছি, বড় রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি, এত রক্ত কোনো জাত কোনো দেশে কোনো দিন দেয় নাই, যা আমার বাংলাদেশের মানুষ দিয়েছে। আমার লোকেরা, বৃদ্ধ থেকে বালক পর্যন্ত সকলেই সংগ্রাম করেছে, সেই সংগ্রাম কামিয়াব হতে পারত না যদি ভারতের জনসাধারণ এগিয়ে না আসত... তিনি বলেছিলেন, "আমার দেবার মতো কিছু নাই, শুধু আমি এইটুকু দিতে পারি, নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি দেবার কিছু নাই, আছে শুধু ভালোবাসা দিলাম শুধু তাই।"

তিনি বলেছিলেন, "আমরা ঘোষণা করেছি আমরা স্বাধীন, তুমি কোন জায়গার বাটপার হয়ে বললা, তুমি বলছ বাংলাদেশ তোমাদের অংশ, ভুলে যাও বন্ধু, সুখে থাকো বন্ধু, বাংলাদেশ স্বাধীন, বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবে, তোমার ক্ষমতা নাই, বাংলার স্বাধীনতা হরণ করতে পার না...। আপনারা আমার সঙ্গে শ্লোগান দেন, জয় বাংলা, জয় বাংলা...। আমার মা রেডিওর ধারা বিবরণী শুনতে শুনতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গলা মিলিয়েছিলেন কতবার, যতবার তা বেজেছিল।

মনে পড়ে সেই ১৫-ই আগস্টের কথা আমরা শুনলাম সন্ধ্যায়। তখন আমাদের দেশে জরুরি অবস্থা জারি। বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। তাঁকে হত্যা করেছে স্বাধীনতা বিরোধী একদল সামরিক কর্তা। শোকাহত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আবার দূরে সরে গেল আমাদের কপোতাক্ষ নদ, সাতক্ষীরা, ধূলিহর, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা। আবার যোজন যোজন দূরে চলে গেল সাতক্ষীরে মহকুমার সামান্য এক গ্রাম ধূলিহর।

শেখ মুজিবর রহমান জন্মেছিলেন গোপালগঞ্জ জেলায়। ১৯২০ সালের ১৭-ই মার্চ। বছর সাত-আট আগে আন্তরজাল যখন আমার কাছে পৌঁছল এমন কয়েকজন বাংলাদেশের বন্ধু হলো, যাঁদের আদিবাড়ি ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ মহকুমায়। হ্যাঁ, গোপালগঞ্জ এখন জেলা। অবিভক্ত ফরিদপুর অনেক সুসন্তানের জন্ম দিয়েছে জানি। লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন সকলেই ফরিদপুরের সন্তান। পাহাড়ের মতো মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান জন্মেছিলেন ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ শহর থেকে ১৮ কিলোমিটার দূরে টুঙ্গিপাড়ায়। আমার বন্ধু কুলদা রায়, রুকসানা কাজল, কচি রেজার বাড়ি গোপালগঞ্জে। তাঁরা বললেন তাঁদের কারো বাসা গোপালগঞ্জ শহরের উদয়ণ রোডে, কারো বাড়ি কালিবাড়ি থিয়েটার

রোডে। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শহরের বাসা কোর্ট মসজিদের পাশে। কুলদা রায় গোপাল গঞ্জের মানুষ, লেখেন ১৯৭৫ সালের ১৫-ই আগস্টের কথা এইভাবে...।

"একদিন ঠাকুরদা রওনা হলেন ঢাকায়। অনেক বয়েস হয়েছে। এটাই তার শেষ তীর্থ যাত্রা। ধূতি পাঞ্জাবী ধোপা বাড়ি থেকে ধুইয়ে আনা হল। সঙ্গে গেল বাউল। তার বাউলা ড্রেস। বলে, আমি আউলা মানুষ। নামাজও পড়ি। আবার গানও গাই। আমার তো কোনো জাত ফাত নেই। বিনোদ শাহ যেতে পারলেন না। দিন দুনিয়ায় তাঁর কেউ নেই। যাঁরা ছিল তাঁরা একাত্তুরে শহীদ। এখন কেবল একটি রামছাগল তার সঙ্গী। তিনি ঢাকায় গেলে রামছাগলকে কে দেখবে? চোখের জল ফেলতে ফেলতে বিনোদ শাহ বললেন, 'শেখরে কৈয়েন ছোটোবাবু, তোমার জন্য বুকটান কৈরা হাঁটতে পারছি। তোমার মুখের দিকেই চাইয়া বাঁইচা আছি। তোমারে সালাম।'

আর গেলেন কাশেম কবিরাজ। কবিতা লেখেন। আর তসবী টেপেন। এক সময় নাটকও করতেন। জলিরপাড় থেকে উঠবেন টমাস তিমথি সরকার।

বাবার মন খুব খুশি। এবার আমাদের কপাল ফিরতে পারে। মা দুদিন পায়েস রান্না করে ঠাকুরের ভোগ দিলেন।

ঠাকুরদা ফিরলেন দিন চারেক পরে। খুব সুখি। বাবাকে বললেন, কিছু কি চাইতে গেছি নিকিরে! তিনিতো মানুষ নন। তিনি আমাগো চোখের জল মুছায় দিছেন। নিজের মাটিকে নিজের করে দিয়েছেন। নিজের ঘরকে নিজের করে দিয়েছেন। তার কাছে কি আর কিছু চাওয়ার থাকেরে পাগলা! তিনি বুকে টেনে নিয়েছেন। বলেছেন, কোনো ভয় নেই। আমি আছি। আমার প্রাণ ভরে গেছে।

এর কিছুদিন পরে ঠাকুরদা মারা গেলেন। তাঁর কোনো দুঃখ ছিল না। তিনি গেলেন পূর্ণতার লাবণ্য নিয়ে।

একদির ভোরবেলায় বাবা কাজে গেলেন না। বাবা পুরনো রেডিওটাকে চড় থাপ্পড় দিচ্ছেন। কড় কড় শব্দ করে একদম থেমে গেল।

বাবা ধাই ধাই করে ছুটে গেলেন হারুন চাচার বাড়িতে। হারুনচাচা রেডিও শুনছিলেন। চোখে জল। রেডিও বন্ধ করে দিলেন। বললেন, বাড়ি ফিরে যাও। দ্যাখো বাঁচতে পারো কিনা। বাংলাদেশে আবার দোজখ নেমে আসছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখলাম, আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবু মিয়া আর ছোটকা দাস ধানি মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছেন। কমরেড শওকত চৌধুরী তাদের পথ আগলে দাঁড়ালেন। বললেন, পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? আসেন রুখে দাঁড়াই।

সাবু মিয়া ফ্যাস ফ্যাস করে জবাব দিলেন, সম্ভব নয়। অস্ত্রপাতি নাই। জমা দিয়া ফেলাইছি।

-জনগণকে নিয়ে নেমে পড়ি। অস্ত্রের কি দরকার?

-ওদের হাতে অনেক অস্ত্র, অনেক টাকা পয়সা আর।

এরপর কি বললেন বোঝা গেল না। ঘোড়া জামাল কমরেড শওকত চৌধুরীকে ধাক্কা মেরে ছুটে বেরিয়ে গেলেন অনেক দূরে। তার ঘোড়াটি হা করে তাকিয়ে রইল। তার পিঠে কোনো সওয়ার নেই। যে কেউই উঠে পড়তে পারে এখন।

অনেকদিন পরে এদিন পনু মিয়াকে দেখলাম। সঙ্গে জি রহমান। আগের চেয়ে গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হয়েছে। স্বাস্থ্যে ভরপুর। সম্প্রতি আরেকটি বিয়েও করেছেন। আমাদের বাসায় এলেন। যে ঘরটিতে ঠাকুর্দা থাকতেন তার দরোজা লাথি মেরে খুলে ফেললেন। বাবাকে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এটা খালি করে দাও।

এ ঘরটি সাড়ে তিন বছর আগে তার দখলে ছিল। অফিস ছিল রাজাকার কমিটির। আজ আবার ঘরটি তাদের দখলে চলে গেল।

সুরুদ্দিন মাস্টার অনেকদির পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন। তার চোখে আজ সুরমা টানা। পরনে আচকান। পায়ে মোকাসিন। মাথায় জিন্নাহ টুপি। জি রহমানের সঙ্গে বুক মেলালেন। তার অসুখ সেরে গেছে।

তার বড়ো মেয়েটি শেখা আপা দীর্ঘদিন পরে অন্দরে ঢুকলেন নিরিবিলি ঘুমাতে। আর সে ঘর থেকে শুকনো মুখে কিছু খোঁচা খোঁচা দাড়ি, বাবরি চুলের যুবক বাইরে এসে দাঁড়াল। তারা এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। পনু মিয়াকে দেখে বড়ো করে সালাম ঠুকল। পনু মিয়া তাদের মাথা থেকে লাল ফেট্টি খুলে দিলেন। পিঠ চাপড়ে বললেন, গুড জব। তোমরা অনেক করেছো।

ওরা সবাই ছিল ক্ষুধার্ত। বিনোদ শা'র রাম ছাগলটিকে প্রকাশ্য রাস্তায় জবাই করল। বিনোদ শা নদীর দিকে ছুটে গেলেন। তারপর শুরু হল রান্না। অনেকগুলো লোক সেদিনই অন্ধকার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, মাঝে মাঝে হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। অই গ্রামটির নাম টুঙ্গিপাড়া।

অনেকদিন পরে এইসব লোকজনের চমৎকার একটি ভোজ হল। চারিদিকে পাকিস্তানী মশলা আর বাংলার ঝলসানো গোস্তের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে- একটি রাস্তা থেকে অনেকগুলো রাস্তায়। বাড়িঘরে। অফিস আর স্কুলে। পুলিশ ব্যারাকে। ধর্মশালায়। আদালতে। নদীতে। ধানক্ষেতে। গাছে গাছে। আকাশে। কবরে। মগজে।"

এই সব কথা অনেকটাই আবেগের। কিন্তু আমি তা সত্য জানি। সেই ১৫-ই আগস্ট আর তার পরের অনেকদিন ছিল চোখের জলের। তিনি শুধু বাংলাদেশের মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেননি,আমার মায়ের চোখের জলও মুছিয়ে দিয়েছিলেন, আমার বাবার মনে এনেছিলেন আনন্দ। প্রণাম তাঁকে।

আমার লেখায় ক্রমাগত বাংলাদেশ এসে যায়। এসেই যায়। সাতক্ষীরে, ধুলিহর, কপোতাক্ষকে আমি আমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেব বলেছিলাম। ফিরিয়ে দিতে চাইছি সেই মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি থেকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমার পিতৃপুরুষ। পিতৃপুরুষের তর্পণ হলো তাঁরই ডাকে, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম...। হ্যাঁ, জানি মানুষের সংগ্রাম ফুরোয় না। সংগ্রামের শেষ নেই। শেখ মুজিবরের জীবন থেকে সেই শিক্ষাই পেয়েছি আমরা।